প্রাক্-পলাশী বাংলা

(সামাজিক ও আর্থিক জীবন, ১৭০০-১৭৫৭)

সুবোধ কুমার মুখোপাধ্যায়

কে পি বাগচী এ্যণ্ড কোম্পানী
কলকাতা

প্রথম প্রকাশ ১৩৬৫

সুবোধ কুমার মুখোপাধ্যায়

প্রকাশক : কে পি বাগচী এ্যাণ্ড কোম্পানী
২৮৬ বি বি গাঙ্গুলী স্ট্রীট
কলকাতা—৭০০০১২

মুদ্রক : প্রবর্তক প্রিণ্টিং এ্যাণ্ড হাফটোন লিমিটেড
৫২/৩, বি বি গাঙ্গুলী স্ট্রীট
কলকাতা—৭০০০১২

উৎসর্গ

শিক্ষা গুরুদের উদ্দেশ্যে

পূর্বাভাষ

আজ আর একথা জোর দিয়ে বলার দরকার নেই ইতিহাস শুধু রাজকাহিনী নয়। অর্থাৎ রাজনীতি ইতিহাসের একমাত্র বিষয় নয়। আর পাঁচটি বিষয়ের মধ্যে এটি একটি। ঐতিহাসিক কালে মানুষের সমগ্র জীবন চর্যাই ইতিহাসের বিষয়বস্তু। ইতিহাসের এ আদর্শ ও সংজ্ঞা আজ সর্বজনস্বীকৃত। তবে এ আদর্শ অনুসরণ করে আজো সর্বস্তরে ইতিহাস লেখা হয়নি। আঠারো শতকের প্রথম ভাগের বাংলার আর্থ-সামাজিক জীবনের অনেকখানি আমাদের অজানা। এ যুগের সামাজিক ও আর্থিক জীবনের রূপরেখাটি তুলে ধরার চেষ্টা করা হয়েছে এ গ্রন্থে। প্রাক্-পলাশী যুগের ইতিহাস চর্চা মূলত রাজনীতি, বিদ্রোহ, সমর কাহিনী, কূটনীতি, আইন ও প্রশাসন ঘিরে। এ যুগের সমাজ, দৈনন্দিন ও সামাজিক জীবন, কৃষি ও শিল্প, বাণিজ্য ও যোগাযোগ, মুদ্রা, ব্যাঙ্কিং ও বিনিময়, রাজ্যের আর্থিক কাঠামো, দ্রব্য মূল্য, মূল্যান্তর, বাজার ও মজুরি, শিক্ষা ও শিক্ষাপ্রতিষ্ঠান, ধর্ম, ধর্মীয় জীবন ও নৈতিকমান ধারাবাহিক ইতিহাসে স্থান পায়নি, এ যুগের শ্রমিক, দাস ও নারী জাতির অবস্থা সম্পর্কে ধারণা স্পষ্ট নয়। অথচ এগুলি সামাজিক ইতিহাসের মূল প্রতিপাদ্য বিষয়। এ বিষয়গুলি বাদ দিয়ে বাঙালীর জীবন চর্যার পরিচয় পাওয়া যায় না।

বাংলার সামাজিক ও আর্থিক ইতিহাস রচনায় কোনো বিশেষ মতাদর্শ বা মডেল অনুসরণ করিনি। আগে থেকে সিদ্ধান্ত নিয়ে তথ্যানুসন্ধানের প্রয়াস নেই। যদি কোনো মডেল বা কাঠামো দেখা দিয়ে থাকে তবে সেটা স্বাভাবিক ভাবেই এসেছে। সযত্নে গড়ে তোলা হয়নি। এমন কোনো সিদ্ধান্ত বা বক্তব্য এ গ্রন্থে নেই যার পেছনে তথ্যের সমর্থন নেই। 'নো ডকুমেণ্ট, নো হিস্ট্রি' আদর্শে আমার আস্থা আছে। তথ্যের বিশ্লেষণে চিত্র যেমন দাঁড়ায় তেমন রাখার চেষ্টা করেছি। নিজের চিন্তা বা মন্তব্য জোর করে পাঠকের ওপর চাপানোর চেষ্টা করিনি। দু একটি সাধারণভাবে অজানা তথ্যের দিকে পাঠকের দৃষ্টি আকর্ষণ করেছি। যথাসম্ভব নিরপেক্ষ দৃষ্টিভঙ্গি তুলে ধরার জন্য সচেষ্ট থেকেছি। বাঙালী পাঠকের কাছে প্রাক্-পলাশী বাংলার সামাজিক ও আর্থিক জীবনের পরিচয় তুলে ধরা আমার মূল লক্ষ্য। এ উদ্দেশ্য সাধিত হলে আমার পরিশ্রম সার্থক মনে করব।

স্বেচ্ছায় এ গ্রন্থ প্রকাশনার দায়িত্ব নিয়ে কে. পি. বাগচী এ্যণ্ড কোম্পানীর পরিচালকরা আমাকে ঋণী করেছেন। এঁদের আমার আন্তরিক কৃতজ্ঞতা জানাই।

সুবোধ কুমার মুখোপাধ্যায়

বিষয়সূচী

প্রথম অধ্যায়

ভূমিকা

১

জর্জ মেকলে ট্রেভেলিয়ান তাঁর অতি পরিচিত 'সোশ্যাল হিস্ট্রি অব ইংল্যাণ্ডের' ভূমিকায় সাধারণভাবে, সামাজিক ইতিহাসের একটি সংজ্ঞা দিয়েছেন। সংক্ষেপে সংজ্ঞাটি হল 'জনজীবনের ইতিহাসই সামাজিক ইতিহাস, এখানে রাজনৈতিক ইতিহাস অপ্রয়োজনীয়'। তবে সঙ্গে সঙ্গে তিনি মন্তব্য করেছেন 'রাজনৈতিক ইতিহাসের কাঠামোর মধ্যে সামাজিক ইতিহাসের চর্চা হওয়া উচিত'। প্রাক্-পলাশী যুগের রাজনৈতিক কাঠামোর মধ্যে বাংলার সামাজিক ও আর্থিক জীবনের রূপরেখাটি তুলে ধরার চেষ্টা করা হয়েছে এ গ্রন্থে। এ সময়কার বাংলার রাজনৈতিক, সামরিক, কূটনৈতিক এমনকি প্রশাসনিক ইতিহাসের চেহারা আজ আমাদের কাছে স্পষ্ট। পর পর পাঁচজন নবাব এযুগে বাংলার ভাগ্য নিয়ন্ত্রণ করেছেন। এঁরা হলেন মুর্শিদকুলী খাঁ (১৭০০—১৭১৭, দেওয়ান ও ডেপুটি সুবাদার; ১৭১৭—১৭২৭, সুবাদার বা নবাব), সুজাউদ্দিন খাঁ (১৭২৭—১৭৩৯), সরফরাজ খাঁ (১৭৩৯—১৭৪০), আলিবর্দ্দী খাঁ (১৭৪০—১৭৫৬) এবং সিরাজুদ্দৌলা (১৭৫৬—১৭৫৭)। এঁদের সময়কার ইতিহাস পাওয়া যায় যদুনাথ সরকার সম্পাদিত 'হিস্ট্রি অব বেঙ্গল' (দ্বিতীয় খণ্ড), আবদুল করিমের 'মুর্শিদকুলী এণ্ড হিজ টাইমস্', কালীকিংকর দত্তের 'আলিবর্দ্দী এণ্ড হিজ টাইমস্' এবং কালীকিংকর ও ব্রিজেন গুপ্তের যথাক্রমে 'সিরাজুদ্দৌলা' এবং 'সিরাজুদ্দৌলা এণ্ড ইংলিশ ইস্ট ইণ্ডিয়া কোম্পানী' গ্রন্থে। আধুনিক কালে উল্লেখযোগ্য সংযোজন হল রমেশচন্দ্র মজুমদার সম্পাদিত 'বাংলাদেশের ইতিহাস' (মধ্যযুগ)। এই গ্রন্থগুলিতে এসময়কার বাংলার সামাজিক ও আর্থিক জীবনের ধারাবাহিক পরিচয় পাওয়া যায় না।

উনিশ শতকের শেষ দিক থেকে বাংলা তথা ভারতের আর্থিক ও সামাজিক জীবনের বিভিন্ন দিক নিয়ে আলোচনা, গবেষণা এবং গ্রন্থ রচনা শুরু হয়। রমেশচন্দ্র দত্ত এ বিষয়ে পথিকৃৎদের অন্যতম। তাঁর পদাঙ্ক অনুসরণ করে একাধিক বাঙালী বুদ্ধিজীবী অষ্টাদশ শতাব্দীর বাংলার আর্থ-সামাজিক ইতিহাস

রচনায় এগিয়ে গেছেন। এঁরা হলেন জে. সি. সিংহ, এইচ. আর. ঘোষাল, এন কে. সিংহ, এ. ত্রিপাঠী, কে. এন. চৌধুরী, এস. ভট্টাচার্য্য এবং এস. চৌধুরী। এঁরা প্রধানত ১৭৫৭ অথবা ১৭৯৩ খ্রীষ্টাব্দ থেকে তাঁদের আর্থ-সামাজিক সমীক্ষা চালিয়েছেন। এঁদের মধ্যে তিনজন—এস. ভট্টাচার্য্য, এস. চৌধুরী এবং কে. এন. চৌধুরী—অষ্টাদশ শতাব্দীর প্রথমার্ধের আর্থ-সামাজিক জীবনের ওপর আংশিক আলোকপাত করেছেন। এখানেও সমাজ ও অর্থনৈতিক জীবনের পূর্ণ পরিচয় নেই। জোর ইংরাজ ইস্ট ইণ্ডিয়া কোম্পানীর কর্মকাণ্ডের ওপর। এদেশের আর্থিক জীবনের সামগ্রিক পরিচয় তুলে ধরার চেষ্টা দেখা যায় না। এঁদের উদ্দেশ্যও তা নয়। এক কথায় এ সময়কার সামাজিক ও আর্থিক জীবনের পরিচয় পাওয়া প্রায় দুঃসাধ্য। প্রবোধচন্দ্র সেন যদুনাথ সরকার সম্পাদিত 'হিস্ট্রি অব বেঙ্গল', দ্বিতীয় খণ্ডের আলোচনা প্রসঙ্গে মন্তব্য করেছেন ঃ 'দ্বিতীয় খণ্ডে আছে শুধু রাষ্ট্রীয় ইতিবৃত্ত; যোগ্য ঐতিহাসিকের অভাবে সামাজিক ও সাংস্কৃতিক ইতিবৃত্ত দেওয়া সম্ভব হয়নি। বাঙালির ইতিহাসের এই গুরুতর অভাব পূরণের দায়িত্ব ভাবী ঐতিহাসিকের অপেক্ষায় রইল'। শুধু সামাজিক বা সাংস্কৃতিক নয়, প্রাক্-পলাশী যুগের আর্থিক ইতিবৃত্তও লেখা হয়নি।

যে বাংলার পরিচয় এ গ্রন্থে দেওয়া হয়েছে তার সমসাময়িক পরিচয় হল 'জিন্নাতুল বিলাদ' (Paradise of provinces)। প্রায়-সমসাময়িক ইতিহাসবিদ্ গোলাম হোসেন সলিম তাঁর 'রিয়াজ-উস্-সালাতীন' গ্রন্থে বাংলার প্রাকৃতিক সীমারেখা পরিষ্কারভাবে নির্দেশ করেছেন। বাংলার দক্ষিণে সমুদ্র, উত্তরে নেপাল, সিকিম ও ভূটানের পর্বতমালা। পূর্বে চট্টগ্রাম ও আরাকান অঞ্চলের পর্বতপুঞ্জ। উত্তর-পশ্চিমে বিহার সুবা। দক্ষিণ-পশ্চিমে উড়িষ্যা। সম্রাট আরঙ্গজেবের জীবনকালের শেষ দিকে খুব অল্প সময়ের জন্য বিহার সুবার দেওয়ানি মুর্শিদকুলী খাঁর ওপর চাপানো হয়েছিল। ১৭৩৩ খ্রীষ্টাব্দে সুজাউদ্দিনের সময় বিহার সুবা পুরোপুরি বাংলা সুবার সঙ্গে যুক্ত হল। শতকের গোড়া থেকে উড়িষ্যা বাংলা প্রশাসনের অঙ্গ। ১৭৫১ খ্রীষ্টাব্দে মারাঠা আক্রমণের রাজনৈতিক ফলশ্রুতি হিসাবে উড়িষ্যা বাংলার বাইরে চলে গেল। এ দুই প্রদেশের আর্থ-সামাজিক জীবন আমাদের আলোচনার বিষয় নয়। বাংলার সমকালীন ইতিহাসের পরিচয় দিতে গিয়ে মাঝে মাঝে অনিবার্যভাবে এদের প্রসঙ্গ এসেছে। এ যুগে কুচবিহার ও ত্রিপুরা রাজ্যের স্বাধীন অস্তিত্ব নেই। এরা বাংলা সরকারের করদ রাজ্য।

উইলিয়ম উইলসন হাণ্টার তাঁর 'দি এ্যানালস্ অব রুরাল বেঙ্গল'-এ বাংলার

সামাজিক ও আর্থিক ইতিহাসের বিষয়বস্তু সম্পর্কে ইঙ্গিত রেখেছেন। সামাজিক ইতিহাসের বিষয়বস্তু কি হওয়া উচিত তারও একটা ধারণা এতে পাওয়া যায়। 'বাংলার অতীত দিনের হাসি-কান্না, তার উল্লেখযোগ্য উত্থান-পতন, তার স্মরণীয় মানুষগুলি, প্রাচীন শিল্পের অবক্ষয় এবং নতুন নতুন শিল্পের প্রতিষ্ঠা, প্রতিবেশী ও বিদেশীদের সঙ্গে তার বিস্তৃত বাণিজ্য, বাংলার ব্যাঙ্ক, বিনিময় ও মুদ্রা ব্যবস্থা, কৃষি ও কৃষক এবং সর্বোপরি জনগণের সামাজিক জীবন' সামাজিক ইতিহাসের বিষয়। দুঃখের বিষয় হল পৃথিবীর অনেক দেশে সাধারণ কাউণ্টি ও প্যারিশের স্বতন্ত্র ইতিহাস আছে। বাংলার পূর্ণাঙ্গ সামাজিক ও আর্থিক ইতিহাস নেই। এ সময়কার বাংলা (বিহার ও উড়িষ্যা বাদে) আয়তনে ইংল্যাণ্ডের কিছু বেশি। লোক সংখ্যা এক থেকে দেড় কোটি।[১] আলেকজাণ্ডার ডাওয়ের মতে বাংলা 'পৃথিবীর অন্যতম উর্বর এবং বিশাল সমতলভূমি। বহু নাব্যনদীর জলপ্রবাহে বিধৌত এ বাংলার দেড় কোটি মানুষ অতিশয় পরিশ্রমী। আরো দেড় কোটি মানুষের খাদ্য তারা সহজেই উৎপাদন করার ক্ষমতা রাখে'। বস্তুত বাংলা ভারতের বিভিন্ন ঘাটতি অঞ্চলে খাদ্য শস্য সরবরাহ করত।

গবেষকরা এ বিষয়টিকে নানা কারণে এড়িয়ে গেছেন। মৌলিক উপাদানের অভাব এক দুর্লঙ্ঘ্য বাধা। এ সময়কার মৌলিক উপাদানের বেশির ভাগ হয় ফারসি না হয় ইংরাজী ভাষায়। ইংরাজী উপাদানের বেশির ভাগ লণ্ডনের ইণ্ডিয়া অফিস (কমনওয়েলথ রিলেশনস্ অফিস) এবং ব্রিটীশ মিউজিয়াম লাইব্রেরিতে সংরক্ষিত। পশ্চিমবঙ্গের লেখ্যাগারে বা জাতীয় লেখ্যাগারে এ উপাদানের বিশেষ কিছু নেই। ফারসি ভাষায় রচিত সমসাময়িক ইতিহাসবিদদের গ্রন্থগুলির মধ্যে সৈয়দ গোলাম হোসেনের 'সিয়ার-উল-মুতাক্ষরীণ', গোলাম হোসেন সলিমের 'রিয়াজ-উস্-সালাতীন', সলিমুল্লাহ্‌র 'তারিখ-ই-বাঙ্গালা', ইউসুফ আলির 'আহবাল-ই-মহবতজঙ্গ' এবং করম আলির 'মুজাফ্‌ফর নামা' বিশেষ উল্লেখযোগ্য। এই প্রধান গ্রন্থগুলি ছাড়াও সুজন রায় ভাণ্ডারীর 'খুলাসাৎ-উৎ-তাওয়ারিখ' এবং রায় ছত্রমনের 'চাহার গুলশানে' এ যুগের বাংলার আর্থ-সামাজিক জীবন সম্পর্কে কিছু কিছু তথ্য পাওয়া যায়। এ গ্রন্থগুলির সবই প্রায় সমসাময়িক বা সমসাময়িক

১। মেজর জেমস্ রেনেল মধ্য শতাব্দীতে বাংলার লোক সংখ্যা দেখেছিলেন এক কোটি। আর পলাশীর দশ বছর পরে স্কটল্যান্ডবাসী আলেকজান্ডার ডাও দেখেছিলেন দেড় কোটি। রেনেল 'মেমোয়ার অব এ ম্যাপ অব হিন্দুস্থান' পৃঃ ২৪৫। আলেকজান্ডার ডাও, 'হিন্দুস্থান', প্রথমখন্ড, পৃঃ ১১৯। এ সময় ইংল্যান্ড ও ওয়েলসের লোকসংখ্যা হল পঞ্চাশ থেকে পঁয়ষট্টি লক্ষ। টি. এস. এ্যাসটন, 'দি ইন্ডাস্ট্রিয়াল রেভলিউশান্', পৃঃ ২।

কালের রচনা। চরিত্রে এগুলির বেশিরভাগ 'দরবারি ইতিহাস'। এগুলি থেকে ইতিহাসের উপাদান সংগ্রহ করা চলে—নিজেরা মোটেই বিজ্ঞানসম্মত পদ্ধতিতে লেখা নির্ভরযোগ্য ইতিহাস নয়। এই গ্রন্থগুলির আর একটা বড় ত্রুটি হল এগুলিতে রাজনৈতিক, সামরিক, কূটনৈতিক, বিচার বিভাগীয় এবং প্রশাসনিক ইতিহাসের উপাদান পাওয়া যায়; সামাজিক ও আর্থিক ইতিহাসের বিশেষ কিছু নেই।

ইতিহাসবিদ্ সত্যসন্ধানী। তাকে হতাশ হলে চলে না। এখন ইতিহাস গবেষণায় বহুমাত্রিক (multi-dimensional) পদ্ধতির চলন। সেই সূত্র ধরে অনেক ক্ষেত্রে ইংরাজ, ফরাসি, ওলন্দাজ ও অন্যান্য ইউরোপীয় কোম্পানীর কাগজ-পত্রের ওপর নির্ভর করতে হয়। স্বদেশের কর্তৃপক্ষের সঙ্গে পত্রালাপ, এদেশে বিভিন্ন বাণিজ্য কুঠীর মধ্যে যোগাযোগ, ব্যবসায়ী নির্দেশ, হিসাব প্রভৃতি এযুগের সামাজিক ও আর্থিক ইতিহাসের প্রাথমিক উপাদান। এ সমস্ত কাগজপত্রের বেশির ভাগ এখন নথিবদ্ধ এবং গবেষকদের ব্যবহারের উপযোগী। তৃতীয় প্রধান উৎস হল বিদেশী পর্যটক, ব্যবসায়ী, সেনাবাহিনীর অফিসার, কোম্পানীর কর্মচারী, যাজক ও মিশনারীদের রেখে যাওয়া স্মৃতিচারণ, ডায়েরি ও জার্নাল জাতীয় লেখাগুলি। এঁদের অনেকেই দীর্ঘকাল বাংলায় বাস করেছেন এবং সমকালীন বাংলার সমাজ ও অর্থনীতিকে দেখেছেন। এঁদের অভিজ্ঞতা, উপলব্ধি এবং মন্তব্য মূল্যবান সন্দেহ নেই, তবে এঁদের ব্যক্তিত্ব, ভাললাগা-মন্দলাগা, ভিন্নদেশ ও বিদেশীদের জীবনযাত্রা সম্পর্কে স্পষ্ট ধারণার অভাব অনেক সময় এঁদের পর্যবেক্ষণের অঙ্গহানি ঘটিয়েছে। ইতিহাসবিদ্‌কে এঁদের প্রতিবেদন সম্পর্কে তাই সাবধান হতে হয়। এছাড়া, প্রাক্-প্রলাশী যুগে বাংলা সাহিত্যের কয়েকজন প্রতিভাবান কবির লেখায় সামাজিক ও আর্থিক ইতিহাসের উপদান পাওয়া যায়। এঁরা হলেন কবি ভারতচন্দ্র (অন্নদামঙ্গল), রামপ্রসাদ (কালীকীর্তন ও বিদ্যাসুন্দর), গঙ্গারাম (মহারাষ্ট্র পুরাণ), রামেশ্বর (শিবায়ণ) প্রভৃতি। কৃষ্ণচন্দ্রের সভাকবি গুপ্তিপাড়ার বাণেশ্বর বিদ্যালঙ্কার বর্ধমানে মারাঠা অধিকারের পটভূমিকায় সংস্কৃত ভাষায় 'চিত্রচম্পূ' লিখেছেন। এটিও একটি প্রাথমিক উপাদান।

দক্ষিণ ভারতে মারাঠাদের বিরুদ্ধে যুদ্ধরত মুঘল সম্রাট আরঙ্গজেব ১৭০০ খ্রীষ্টাব্দের ১৭ই নভেম্বর মুর্শিদকুলী খাঁকে বাংলার দেওয়ান নিযুক্ত করলেন। ঐ বছর ডিসেম্বর মাসে কার্যভার গ্রহণ করার জন্য মুর্শিদকুলী বাংলায় এলেন।

তিনি দক্ষ, সৎ, পরিশ্রমী, সম্রাটের প্রিয়পাত্র। ঠিক ঐ বছর (১৭০০) কলকাতা বাংলা তথা উপসাগরীয় বাণিজ্যের স্বতন্ত্র প্রেসিডেন্সির সদর কার্যালয়ে পরিণত হল। এতদিন পূর্বাঞ্চলের বাণিজ্য মাদ্রাজ প্রেসিডেন্সির অধীন ছিল। কলকাতা হল তৃতীয় এবং সর্বকনিষ্ঠ প্রেসিডেন্সির প্রধান কার্যালয়। ১৭৫৭ খ্রীষ্টাব্দের ২৩ শে জুন পলাশীর যুদ্ধে সিরাজুদ্দৌলা পরাজিত ও নিহত হলেন। শুরু হল ইংরাজ শক্তির জয়যাত্রা। অন্তর্বর্তী কালে (১৭০০—১৭৫৭) কলকাতায় ভবিষ্যত বৃটিশ রাষ্ট্রশক্তির রূপরেখা স্পষ্ট হচ্ছিল। পুরাতন ফোর্ট উইলিয়াম সম্পূর্ণ (১৬৯৬—১৭১৬), একটি ছোট্ট সেনাবাহিনী সুগঠিত, বাণিজ্য জাহাজ প্রয়োজনে যুদ্ধ জাহাজ, একটি সুশৃঙ্খল আমলাতন্ত্র, কলেক্টরের অধীনে পুলিশ বাহিনীর অস্পষ্ট রূপরেখাটি দেখাযাচ্ছে, 'মেয়রস্ কোর্ট' এবং কোর্ট অব রিকোয়েস্টে'র প্রতিষ্ঠার মাধ্যমে ভবিষ্যত বিচার বিভাগের নিঃসন্দেহে শিলান্যাস ঘটেছে।

এ যুগের ইতিহাসের সবচেয়ে উজ্জ্বল দিক হল বাংলায় আপেক্ষিক শান্তি ও নিরাপত্তা। আরঙ্গজেবের দেহাবসানের পর উত্তর ও দক্ষিণ ভারতে রাজনৈতিক স্থিতি ও শান্তি নষ্ট হয়েছে। সিংহাসন নিয়ে বিরোধ মুঘল সাম্রাজ্যে ধ্বস নামিয়েছে। অপরদিকে মুর্শিদকুলী, সুজাউদ্দিন এবং আলিবর্দীরা বাংলায় শান্তি ও নিরাপত্তা রক্ষা করেছেন। চোর ডাকাতের উপদ্রব বন্ধ হয়েছে। মারাঠারা দশ বছর ধরে (১৭৪২—১৭৫১) পশ্চিম বাংলার বুকে তাণ্ডব চালিয়েছে ঠিকই, তবে এটা কোনো সীমাহীন, বিরামহীন ঘটনা নয়। বর্ষাশেষে লুটপাট করার জন্য মারাঠারা বাংলায় আসত। তাদের যাতায়াতের পথের দুপাশের শহর ও গ্রাম লুণ্ঠিত ও অত্যাচারিত হত। বর্ষার শুরুতে ওরা দেশে ফিরত। মগ ও পর্তুগীজ জলদস্যুরা পূর্ববঙ্গ ও সমুদ্রোপকূলে লুণ্ঠন চালাত। গ্রামবাসীদের ধরে নিয়ে গিয়ে ক্রীতদাস রূপে বিক্রি করত। এসব সত্ত্বেও প্রায় অর্ধশতকাল বাংলায় শান্তি ছিল। 'মুজাফ্ফর নামার' স্রষ্টা করম আলি জানিয়েছেন 'আলিবর্দীর সময়ে চোর ডাকাতের নামই শোনা যেত না। যদি কারো সম্পত্তি রাস্তায় পড়ে যেত, মালিক না আসা পর্যন্ত সেদিকে কেউ তাকাত না।' আলেকজাণ্ডার ডাও লিখেছেন 'সিরাজের মৃত্যুর পর যারা বাংলার এক প্রান্ত থেকে অপর প্রান্তে পাড়ি দিয়েছেন তাদের সাক্ষ্যে জানা যায় বাংলা তৎকালীন পৃথিবীর অন্যতম জনবহুল, ঐশ্বর্যশালী এবং চাষ আবাদে সমৃদ্ধ দেশ। অভিজাত ও ধনী বণিককুল ঐশ্বর্য ও বিলাসে গা ভাসিয়ে থাকেন। ছোটখাট চাষী ও উৎপাদকদের রোজগারও বেশ ভাল। তারা সুখে ও স্বাচ্ছন্দ্যে বাস করেন'।

এ সময়কার বাংলা সম্পর্কে একটি প্রচলিত মত হল ঠিক এ সময়ে বাংলার আর্থিক অবক্ষয়ের সূচনা। এ মতের অন্যতম ব্যাখ্যাকার হলেন কালীকিংকর দত্ত মহাশয়। এ ধারণার বেশির ভাগ ভ্রান্ত বলে মনে হয়। প্রকৃতপক্ষে বাংলার আর্থিক এবং সেই সঙ্গে সামাজিক অবক্ষয়ের যুগ শুরু হয়েছে ১৭৫৭ খ্রীষ্টাব্দ থেকে। এ ধারা পরিণতি লাভ করেছে ১৭৭২ খ্রীষ্টাব্দ নাগাদ। এ যুগে (১৭৫৭—১৭৭২) বাংলা থেকে ব্যাপকভাবে আর্থিক নিষ্কাশনের (economic drain) শুরু। ১৭৫৭ থেকে ১৭৮০ খ্রীষ্টাব্দ পর্যন্ত বাংলা থেকে আর্থিক নিষ্কাশনের পরিমাণ দাঁড়ায় ৩৮,৪০০,০০০ পাউণ্ড। বাংলার অভ্যন্তরীণ ও বহির্বাণিজ্য ইংরাজ ইস্ট ইণ্ডিয়া কোম্পানী ও তার কর্মচারীদের কুক্ষিগত। দ্বিতীয়ত, বাংলার সামাজিক ও আর্থিক জীবনের ওপর বর্গী হাঙ্গামার প্রভাবের গভীরতা ও ব্যাপকতা নিয়ে ইতিহাসবিদ্ মহলে বেশ মতভেদ আছে। কালীকিংকর দত্ত মহাশয়ের মতে এ প্রভাব গভীর ও ব্যাপক। দত্ত মহাশয় মধ্য অষ্টাদশ শতাব্দীর বাংলার সামাজিক ও আর্থিক অবক্ষরের জন্য মারাঠা আক্রমণকে দায়ী করেছেন। যদুনাথ সরকার মহাশয় মারাঠা আক্রমণকে 'বিলীয়মাণ প্রবল ঝড়' বলেছেন। বাংলার সমাজ ও অর্থনীতির ওপর এ ঘটনা তেমন স্থায়ী প্রভাব রাখেনি। সরকার মহাশয়ের মতে বাংলায় মারাঠা আক্রমণের স্থায়ী ফল দুরকমের। উড়িষ্যা বাংলা থেকে বেরিয়ে গেল আর বর্গী আক্রমণ উত্তর ভারতের সন্ন্যাসী ও ফকির দস্যুদের বাংলা লুঠের রাস্তা দেখিয়ে দিল। আমাদের বিশ্লেষণে দেখানো হয়েছে মারাঠা আক্রমণের প্রভাব আর্থ-সামাজিক ক্ষেত্রে গভীর, ব্যাপক বা স্থায়ী হয়নি। ইংরাজ ইস্ট ইণ্ডিয়া কোম্পানীর বাণিজ্যের কোনো উল্লেখযোগ্য ঘাটতি দেখা যায় না (ইংরাজ ইস্ট ইণ্ডিয়া কোম্পানীর বাংলা থেকে রপ্তানি বাণিজ্যের তালিকা দেখুন, পৃঃ ৬২)

প্রাক্-পলাশী বাংলার আর্থিক ধারাটি অবশ্যই প্রাক্-ঔপনিবেশিক। এযুগে ইংরাজ, ফরাসি ও ওলন্দাজদের ব্যবসা বাণিজ্য বেড়েছিল। বিশেষ করে ইংরাজ বাণিজ্যের শ্রীবৃদ্ধির যুগ এটি। ইংল্যাণ্ডে শিল্প বিপ্লব তখনো শুরু হয়নি। সবে পদধ্বনি শোনা যাচ্ছে। তবে ব্রিটিশ আর্থিক ঔপনিবেশিকতার লক্ষণগুলি ধীরে ধীরে স্পষ্ট হচ্ছিল। ঔপনিবেশিক কাঠামোটি রূপ পরিগ্রহ করেছিল। সমুদ্র বন্দর, ঔপনিবেশ, দুর্গ, প্রশাসন, আর্থিক লেনদেনের ব্যবস্থা, পর্যাপ্ত পুঁজির যোগান, একচেটিয়া ব্যবসার ঝোঁক, স্বদেশে ও এদেশে ব্যবসায় কাঠামো

(mechanism of trade)—সবই স্পষ্ট হয়েছিল। শুধু অভাব ছিল রাষ্ট্র ক্ষমতার। ১৭৫৭ খ্রীষ্টাব্দে পলাশী সেটা এনে দিল।

২

আর্থ-সামাজিক ইতিহাসের প্রেক্ষাপট হিসাবে এ যুগে বাংলার রাষ্ট্র কাঠামো এবং রাজনৈতিক ইতিহাসের রূপরেখাটি সংক্ষেপে আলোচনা করা যেতে পারে। মুঘল প্রাদেশিক শাসন ব্যবস্থায় দুটি স্তম্ভ—নাজিম বা সুবেদার (পরবর্তীকালে নবাব) এবং দেওয়ান। সম্রাট আকবর সমমর্যাদাসম্পন্ন দুজন উচ্চ কর্মচারীর ওপর প্রদেশ শাসনের ভার দিয়েছিলেন। এরা দুজনেই নিজ নিজ ক্ষেত্রে স্বাধীনভাবে কাজ করতেন। প্রত্যেকে নিজের কাজের জন্য সরাসরি সম্রাটের কাছে দায়ী। সম্রাট নিয়মিতভাবে বিভিন্ন প্রদেশে এদের স্থানান্তরিত করতেন। দুই স্তম্ভবিশিষ্ট এই শাসন ব্যবস্থায় নাজিম ও দেওয়ানের মধ্যে ক্ষমতা ভাগ করে দিয়ে এবং উভয়কে সমমর্যাদাসম্পন্ন ও স্বাধীন রেখে প্রদেশগুলিতে বিদ্রোহ সম্ভাবনা বন্ধ করার চেষ্টা হয়েছিল। নাজিম প্রাদেশিক সেনাবাহিনীর প্রধান, শান্তি-শৃঙ্খলা রক্ষক এবং ফৌজদারি বিচার বিভাগের অধিপতি। এর অধীনে ফৌজদাররা জেলায় জেলায় বিদ্রোহ দমন, শান্তি রক্ষা এবং কর সংগ্রহে দেওয়ানি বিভাগকে সাহায্য করত। নাজিমের অধীনে কাজীরা জেলা, প্রধান শহর এবং রাজধানীতে ফৌজদারি বিচারকার্য পরিচালনা করত। দেওয়ান রাজস্ব বিভাগের প্রধান। তার অধীনে ছিল প্রধান কানুনগো, কানুনগো, আমিল, ফতেদার, ফাসিলদার, মুৎসুদ্দি, আমিন, মকদ্দম শ্রেণীর অসংখ্য রাজস্ব বিভাগীয় কর্মচারী, হিসাব ও দলিল রক্ষক। এদের নিয়ে দেওয়ান স্বাধীনভাবে তার বিভাগীয় কাজকর্ম দেখাশোনা করতেন। কর সংগ্রহ করে দিল্লীতে ইম্পিরিয়াল দেওয়ানের নিকট বার্ষিক কর ও হিসাব পেশ করা তার প্রধান কাজ। এছাড়া তিনি দেওয়ানি মামলা সংক্রান্ত বিচার ব্যবস্থার প্রধান। নিজামত ও দেওয়ানি বিভাগের জন্য পৃথক পৃথক জাগীর নির্দিষ্ট ছিল। জাগীরের আয় থেকে বিভাগীয় সমস্ত রকম ব্যয় নির্বাহ হত। আরঙ্গজেবের রাজত্বকালে প্রাদেশিক শাসন ব্যবস্থার বাইরের কাঠামো ঠিক থাকলেও এর অভ্যন্তরীণ চারিত্রিক পরিবর্তন ঘটে যায়। প্রাদেশিক নাজিম বা সুবাদার প্রাদেশিক শাসন ব্যবস্থায় সর্বেসর্বা হয়ে বসেন। দেওয়ান তার অধীনে রাজ্যের দ্বিতীয় প্রধান কর্মচারীরূপে পরিগণিত হন।

ঠিক এরকম প্রাদেশিক প্রশাসনিক কাঠামোয় ১৭০০ খ্রীষ্টাব্দের শেষে

মুর্শিদকুলী বাংলার দেওয়ান হয়ে এলেন। ঢাকা তখন বাংলার রাজধানী। আরঙ্গজেবের পৌত্র আজিমুশ্‌শান বাংলার সুবাদার (১৬৯৭—১৭১২)। মুর্শিদকুলী আরঙ্গজেবের অতি প্রিয় এবং বিশ্বাসভাজন। তিনি মুর্শিদকুলীকে বাংলার দেওয়ানি ছাড়াও উড়িষ্যার দেওয়ান ও নাজিমের পদ এবং বিহারের দেওয়ানের পদ দিলেন। এটা তাঁর অসাধারণ যোগ্যতার পরিচায়ক। বাংলা প্রশাসনের কায়েমী স্বার্থবাদীরা প্রমাদ গুণলেন। এরা সুবাদার আজিমুশ্‌শানের সহযোগিতায় নতুন দেওয়ানের বিরুদ্ধে ষড়যন্ত্র শুরু করলেন। আজিমুশ্‌শান অলস ও লোভী। টাকার ওপর তাঁর ভীষণ লোভ। যেমন করে হোক টাকা যোগাড় করবেন এই তাঁর পণ। তিনি এদেশের অনেক নিত্য প্রয়োজনীয় জিনিসের একচেটিয়া ব্যবসায় করতেন। এজন্য সম্রাট আরঙ্গজেব তাঁকে একবার তিরস্কার করেছিলেন। সুদক্ষ, সৎ দেওয়ান ও অর্থগৃধ্নু সুবাদারের মধ্যে বিবাদ বাধতে দেরি হল না। সুবাদার বাংলার সরকারি অর্থের অনেকখানি আত্মসাৎ করেছিলেন। মুর্শিদকুলী এ সব বন্ধ করতে প্রয়াসী হলেন। সম্রাটের টাকার প্রয়োজন। এছাড়া তার গত্যন্তর নেই। সুবাদার ঢাকার নগদী[২] সেনাবাহিনীকে দেওয়ানের প্রাণনাশের জন্য উত্তেজিত করলেন (১৭০২)। এ ষড়যন্ত্র বার্থ হল। মুর্শিদকুলী ঢাকায় থাকা নিরাপদ মনে করলেন না। তিন প্রদেশের মধ্যস্থল মুকসুদাবাদে (বর্তমান মুর্শিদাবাদ) তিনি দেওয়ানি বিভাগ স্থানান্তরিত করে নিয়ে এলেন (১৭০৪)। এ সময় আজিমুশ্‌শানও ঢাকা ছেড়ে পাটনায় এলেন। ১৭০৬ খ্রীষ্টাব্দে নিজপুত্র ফারুখসিয়ারকে বাংলায় তাঁর প্রতিনিধি রেখে আট কোটি টাকা নিয়ে তিনি দিল্লী চলে গেলেন। ১৭০৭ খ্রীষ্টাব্দে মুর্শিদকুলী বাংলার ডেপুটি সুবাদার হলেন। তার পরেই তাঁর ভাগ্যবিপর্যয়ের শুরু। ১৭০৮ সনের প্রথম দিকে তিনি দাক্ষিণাত্যের দেওয়ান নিযুক্ত হলেন। ১৭১০ খ্রীষ্টাব্দে বাংলার দেওয়ান জিয়াউল্লাহ নিহত হলে মুর্শিদকুলী বাংলায় ফিরে এলেন। ১৭১৩ সনে ডেপুটি সুবাদারের পদটি তাঁকে দেওয়া হল। এ সময় থেকে মুর্শিদকুলী কার্যত বাংলা প্রশাসনের প্রধান। নামমাত্র সুবাদার মীরজুমলা (১৭১৩—১৭১৬) কখনো বাংলায় আসেননি। তাঁর হয়ে মুর্শিদকুলীই সমস্ত প্রশাসনিক কাজকর্ম চালাতেন। ১৭১৭

২। রাজধানীর সেনাবাহিনীর একটি দল সরকারি কোষাগার থেকে নগদ বেতন পেত। এদের নগদী সেনাবাহিনী বলা হয়। এ বাহিনীর বকেয়া বেতনের দাবীতে দলের অধ্যক্ষ আবদুল ওয়াহিদ সুবাদারের টিপ্পনিতে মুর্শিদকুলীর ওপর চড়াও হয়ে প্রাণনাশের চেষ্টা করেছিল।

খ্রীষ্টাব্দে তিনি বাংলার সুবাদারি পেলেন। ১৭২৭ খ্রীষ্টাব্দের ৩০শে জুন তাঁর মৃত্যুদিন পর্যন্ত এ পদে আসীন ছিলেন। তাঁর সময় থেকে বাংলার রাজনীতিতে দিল্লীর প্রাধান্য ও হস্তক্ষেপ বন্ধ হয়ে যায়।

মুর্শিদকুলী সারাজীবন তৈমুর বংশের প্রতি তাঁর আনুগত্য অটুট রেখেছিলেন। বাংলার রাজস্ব নিয়মিত দিল্লীতে পাঠিয়েছেন। গৃহযুদ্ধের সময় তাঁর নীতি হল 'যিনি দিল্লীর সিংহাসন দখল করবেন তিনি তাঁর আনুগত্য ও বাংলার রাজস্ব পাবেন।' এ কারণে উত্তরাধিকার যুদ্ধ চলাকালীন তিনি ফারুখসিয়ারের প্রতিনিধি রশিদখাঁর বিরুদ্ধে লড়াই করে তাঁকে নিহত করেন। ফারুখসিয়ারের আদেশমত বাংলার রাজস্ব তাঁকে দেননি। কিন্তু যে মুহূর্তে ফারুখসিয়ার দিল্লী দখল করলেন (ফেব্রুয়ারী, ১৭১৩) মুর্শিদকুলী সঙ্গে সঙ্গে তাঁকে আনুগত্য জানালেন এবং সম্রাটের প্রাপ্য রাজস্ব পাঠালেন। ফারুখসিয়ারও মুর্শিদকুলীকে বাংলার ডেপুটি সুবাদার ও পরে সুবাদারের পদ দিলেন।

মুর্শিদকুলীর কোনো পুত্র সন্তান ছিল না। তাঁর জামাতা সুজাউদ্দিনের সঙ্গে তাঁর কন্যা জিনাত-উন-নিসার সম্পর্ক তেমন ভাল ছিল না। তাঁর ইচ্ছা ছিল তাঁর পর দৌহিত্র সরফরাজ (সুজাউদ্দিনের পুত্র) বাংলার নবাব হোন। সুজাউদ্দিন তাঁর মৃত্যুসময়ে উড়িষ্যার ডেপুটি গভর্ণর। তাঁর পরামর্শদাতাদের মধ্যে ছিলেন পরবর্তীকালের সুবিখ্যাত হাজি আহমদ, আলিবর্দী ও আলমচাঁদ। সুজাউদ্দিন সৈন্যবাহিনী নিয়ে মেদিনীপুরের মধ্য দিয়ে মুর্শিদাবাদের সিংহাসন দখল করার জন্য এগিয়ে এলেন। পিতা পুত্রের সিংহাসন নিয়ে লড়াই আসন্ন। এ পরিস্থিতিতে মুর্শি'দকুলীর বেগম সরফরাজ খাঁকে পিতার পক্ষে সিংহাসন ত্যাগ করার পরামর্শ দিলেন। সরফরাজ মাতামহীর পরামর্শ মেনে নিয়ে পিতার সঙ্গে দেখা করলেন। সুজাউদ্দিন মেদিনীপুরেই বাদশাহের কাছ থেকে নবাবি সনদ পেয়েছিলেন।

সুজাউদ্দিন তাঁর পূর্ববর্তী শাসক মুর্শিদকুলীর ন্যায় সম্রাটের প্রাপ্য রাজস্ব নিয়মিত পাঠাতেন। মুর্শিদকুলীর সময়কার প্রশাসনিক কঠোরতা অনেকখানি হ্রাস করা হল। জমিদারদের সঙ্গে ব্যবহারে তিনি নতুন রাষ্ট্রনীতি অনুসরণ করলেন। বন্দী জমিদারদের মুক্তি দেওয়া হল। এরা নিয়মিত রাজস্ব দেওয়ার প্রতিশ্রুতি দিল। মুর্শিদকুলীর দুজন অত্যাচারী প্রশাসক নাজির আহমদ ও মুরাদ ফরাসকে মৃত্যুদণ্ড দিয়ে সুজাউদ্দিন তাঁর নতুন উদার রাষ্ট্রনীতি ঘোষণা করলেন। তাঁর সময়ে বিহার স্থায়ীভাবে বাংলার সঙ্গে যুক্ত হল (১৭৩৩)।

প্রশাসনিক সুবিধার্থে তিনি বাংলা, বিহার, উড়িষ্যাকে চার ভাগে ভাগ করলেন। বিহার ও উড়িষ্যা দুটি পৃথক প্রশাসনিক বিভাগ বা উপপ্রদেশ হল। বাংলা বিভক্ত হল দুভাগে। মধ্য উপপ্রদেশে রইল বাংলার পশ্চিম, মধ্য এবং উত্তরবঙ্গের কিছু অংশ। ঢাকা উপপ্রদেশে গেল বাংলার পূর্ব ও দক্ষিণাঞ্চল, উত্তরবঙ্গের এক ক্ষুদ্রাংশ, শ্রীহট্ট ও চট্টগ্রাম। নবাব স্বয়ং তাঁর উপদেষ্টাদের নিয়ে মধ্যাঞ্চল শাসন করতেন। বিহারে আলিবর্দী, ঢাকায় সুজাউদ্দিনের জামাতা দ্বিতীয় মুর্শিদকুলী এবং উড়িষ্যায় নবাবের দ্বিতীয় পুত্র মহম্মদ তকি খাঁ গভর্ণর হলেন। তকি খাঁর মৃত্যুর পর দ্বিতীয় মুর্শিদকুলী উড়িষ্যায় গেলেন এবং সরফরাজ খাঁ ঢাকার ডেপুটি গভর্ণর হলেন। তাঁর দেওয়ান যশোবন্ত রায় ঢাকা উপপ্রদেশে সুশাসন চালু করেছিলেন। সরকারের রাজস্ব বৃদ্ধি পেল, জনগণ শান্তি ও সমৃদ্ধির মুখ দেখল। চালের দাম শায়েস্তা খাঁর সময়ের রেকর্ড স্পর্শ করল—অর্থাৎ টাকায় আট মণ। শায়েস্তা খাঁর নির্দেশমত বন্ধ শহরের পশ্চিম দুয়ার এতদিন পর প্রথম খোলা হল। বিহারে আলিবর্দী সুশাসন ও যোগ্যতার পরিচয় রাখলেন। বিদ্রোহী জমিদারদের দমন করে রাজস্ব বাড়ালেন। শৃঙ্খলা ফিরে এল। উড়িষ্যা প্রশাসনেও উন্নতি দেখা গেল। ইউরোপীয়রা সুজাউদ্দিনের শাসনকালকে সুশাসন ও শান্তির যুগ বলে উল্লেখ করেছেন।

সুজাউদ্দিন নিজে শান্তিপ্রিয়, বিলাসী মানুষ। প্রশাসনের সব ভার দিলেন বিখ্যাত ত্রয়ী হাজি আহমদ, আলমচাঁদ ও জগৎশেঠ ফতেচাঁদের ওপর। তাঁর সময় রাষ্ট্রের ব্যয় অনেক বেড়ে যায়। সেনাবাহিনী বাড়িয়ে পঁচিশ হাজার করা হল। মুর্শিদাবাদে অনেকগুলি প্রাসাদ, অফিস, কাছারি, অস্ত্রাগার, দরবারকক্ষ ও তোরণ উঠল। ভাগীরথীর পশ্চিমতীরে দহপাড়াতে তিনি বানিয়েছিলেন একটি সুন্দর মস্‌জিদ ও বাগান (ফারাবাগ)। সুজাউদ্দিনের চারিত্রিক স্খলন তাঁকে তাঁর প্রধান উপদেষ্টাদের ক্রীড়নকে পরিণত করল। এমনকি স্বার্থান্বেষী এই ত্রয়ী সুজাউদ্দিনের পরিবারে নানারকম ভুল বোঝাবুঝি ও কলহের সৃষ্টি করত। 'রিয়াজ-উস্-সালাতীন' ও 'তারিখ-ই-বাঙ্গালা' থেকে এসব তথ্য পাওয়া যায়।

১৭৩৯ খ্রীষ্টাব্দের ১৩ই মার্চ সুজাউদ্দিন মারা গেলে তাঁর পুত্র সরফরাজ খাঁ বাংলার নবাব হলেন। মাত্র এক বছর তিনি শাসন ক্ষমতায় টিঁকে ছিলেন। পিতার মত ভোগপ্রিয়, বিলাসী, ইন্দ্রিয়পরায়ণ সরফরাজ ধর্মে গোঁড়া। তিনি তাঁর পিতার আমলের অমিত শক্তিশালী অমাত্যত্রয়কে নিয়ন্ত্রণে রাখতে পারলেন না। সরল, বিশ্বাসপ্রবণ সরফরাজের প্রশাসন পরিচালনার মত প্রতিভা বা চারিত্রিক

দৃঢ়তা ছিলনা। অল্পদিনেই প্রশাসনিক বিশৃঙ্খলা ও অশান্তি দেখা দিল। হাজি আহমদের নেতৃত্বে ষড়যন্ত্র শুরু হল। আলমচাঁদ ও জগৎশেঠ ফতেচাঁদ এ ষড়যন্ত্রে যোগ দিলেন। ইতিমধ্যে বিহারে আলিবর্দীও রাষ্ট্র ক্ষমতা দখলের জন্য প্রস্তুত হচ্ছিলেন। ১৭৪০ খ্রীষ্টাব্দের ১০ই এপ্রিল গিরিয়ার যুদ্ধে সরফরাজ খাঁকে পরাজিত ও নিহত করে আলিবর্দী বাংলার মস্‌নদ দখল করলেন। ১৭৪০ থেকে ১৭৫৬ খ্রীষ্টাব্দ পর্যন্ত আলিবর্দী বাংলার নবাব।

তাঁর শাসনকালের সবচেয়ে বড় ঘটনা হল বাংলায় বর্গী আক্রমণ (১৭৪২-১৭৫১)। দ্বিতীয় প্রধান ঘটনা আফগান বিদ্রোহ (১৭৪৫, ১৭৪৮)। পুরো দশ বছর ধরে আলিবর্দী অবিশ্রাম মারাঠা ও আফগানদের বিরুদ্ধে লড়াই করেছিলেন। ১৭৪১ খ্রীষ্টাব্দে উড়িষ্যার ডেপুটি গভর্ণর দ্বিতীয় মুর্শিদকুলী (রুস্তমজঙ্গ) কে পরাস্ত করে তিনি উড়িষ্যা দখল করলেন। ঐ বছরের শেষে বন্দী ভ্রাতুষ্পুত্র উড়িষ্যার সদ্যনিযুক্ত ডেপুটি গভর্ণর সৈয়দ আহমদ খাঁকে উদ্ধার করার জন্য তাঁকে দ্বিতীয়বার অভিযান নিয়ে উড়িষ্যায় যেতে হয়েছিল। উড়িষ্যা থেকে ফেরার পথে ১৭৪২ খ্রীষ্টাব্দের এপ্রিল মাসে তিনি মারাঠাদের সম্মুখীন হলেন। ১৭৫১ খ্রীষ্টাব্দের মে বা জুন মাসে নাগপুরের অধিপতি রঘুজী ভোঁসলের সঙ্গে চুক্তিতে মারাঠা অভিযানের পরিসমাপ্তি ঘটল। মাঝখানে ১৭৪৫ এবং ১৭৪৮ সনে আলিবর্দীর এককালের বিশ্বস্ত আফগান সেনানায়করা বিদ্রোহ করে বসল। মারাঠাদের সঙ্গে আফগানদের ঘনিষ্ট যোগাযোগ প্রতিষ্ঠিত হল দ্বিতীয় মুর্শিদকুলীর কর্মচারী মীর হাবিবের মাধ্যমে। ১৭৪৩ খ্রীষ্টাব্দে পেশোয়া বালাজি বাজীরাও এবং নাগপুরের রাজা রঘুজী দুজনেই বাংলায় এসেছিলেন। সম্রাটের অনুরোধে পেশোয়া এসেছিলেন রঘুজীর বিরুদ্ধে আলিবর্দীকে সাহায্য করার জন্য। আলিবর্দীর কাছ থেকে বাইশ লক্ষ টাকা ও চৌথের প্রতিশ্রুতি পেয়ে তিনি রঘুজীকে বাংলা থেকে তাড়িয়ে দিলেন। পেশোয়ার শত্রু রঘুজীর সেনাপতি ভাস্কর পণ্ডিত আবার পরের বছর বাংলায় দেখা দিলেন। সর্বস্বান্ত, শ্রান্ত আলিবর্দী বিশ্বাসঘাতকতার আশ্রয় নিলেন। বহরমপুরের কাছে মানকরাতে (৩১ শে মার্চ, ১৭৪৪) মারাঠা সেনানায়কদের আলোচনার জন্য ডেকে এনে হত্যা করলেন।

আলিবর্দী রেহাই পেলেন না। ভাস্করের রাজা রঘুজী প্রতিশোধ নেবার জন্য বাংলায় ছুটে এলেন। আলিবর্দীর আফগান সেনানায়ক মুস্তাফা খাঁ বিহারে বিদ্রোহ করলেন। বিহারের ডেপুটি গভর্ণর জয়নুদ্দিনের হাতে তিনি নিহত

হলেন। মীর হাবিব মারাঠাদের সঙ্গে যোগ দিয়ে বাংলায় লুঠতরাজ চালালেন। এ সময় উড়িষ্যা এবং পশ্চিমবঙ্গের কয়েকটি জেলায় মারাঠাদের আধিপত্য প্রতিষ্ঠিত হয়। ১৭৪৮ সনে আফগান দলপতি শমসের খাঁ ও সরদার খাঁ বিদ্রোহ করে পাটনা দখল করলেন। এঁদের হাতে বিহারের ডেপুটি গভর্ণর আলিবর্দ্দীর জামাতা জয়নুদ্দিন প্রাণ হারালেন। আলিবর্দ্দী এ বিদ্রোহ দমন করতে সক্ষম হয়েছিলেন। মারাঠারা পশ্চিমবঙ্গের জেলাগুলিতে অগ্নিসংযোগ, হত্যা, লুণ্ঠন চালালো আরো কিছুকাল। শেষে ১৭৫১ খ্রীষ্টাব্দের মে মাসে উভয়পক্ষ এক চুক্তিতে আবদ্ধ হল। আলিবর্দ্দী রঘুজীকে বাংলা থেকে বার্ষিক বারো লক্ষ টাকা চৌথ দিতে রাজী হলেন। উড়িষ্যা কার্যত মারাঠাদের হাতে ছেড়ে দিলেন। মেদিনীপুর ও উড়িষ্যার মধ্যবর্তী সুবর্ণরেখা নদী বাংলা ও উড়িষ্যার মধ্যে সীমারেখা হিসাবে চিহ্নিত হল। মারাঠা রাজা ভবিষ্যতে এ সীমারেখা অতিক্রম করে বাংলা আক্রমণ করবেন না বলে প্রতিশ্রুতি দিলেন। এরপর আরো পাঁচ বছর আলিবর্দ্দী বেঁচে ছিলেন। এ সময় বিধ্বস্ত বাংলার পুনর্গঠনে তিনি আত্মনিয়োগ করেন। তাঁর সময় দিল্লীতে নিয়মিত রাজস্ব পাঠানো বন্ধ হয়ে যায়। ইউরোপীয়দের চোখে আলিবর্দ্দী ছিলেন দক্ষ ও কার্যকরী শাসক।

আলিবর্দ্দীর মৃত্যুর পর তাঁর প্রিয় দৌহিত্র সিরাজুদ্দৌলা বাংলার মসনদে বসলেন। তাঁর নবাবি মাত্র চৌদ্দ মাসের (১০ই এপ্রিল, ১৭৫৬—২৩শে জুন ১৭৫৭)। বাংলার অভিজাত শাসক শ্রেণী, অতি ধনী জগৎ শেঠ পরিবার এবং সৈন্যবাহিনীর উচ্চপদস্থ অফিসাররা অনেকেই নানা কারণে তাঁর ওপর বিরূপ হলেন। ইংরাজ ঈস্ট ইণ্ডিয়া কোম্পানীর বিপুল বাংলা বাণিজ্য, কোম্পানীর কর্মচারীদের অবৈধ ব্যক্তিগত ব্যবসা, ইউরোপে ইংরাজ ও ফরাসিদের মধ্যে সংঘাত এবং বাংলায় তার প্রতিক্রিয়া, ১৭৫৭ খ্রীষ্টাব্দের মার্চে আফগান দলপতি আহমদশাহ আবদালির দিল্লী অভিযান অলক্ষ্যে এই বিড়ম্বিত নায়কের পতনের প্রেক্ষাপট তৈরি করেছিল। নিজের চারিত্রিক অস্থিরতা, অনভিজ্ঞতা, কূটনৈতিক জ্ঞানের অভাব ও শৌর্যহীনতা তাঁর পতনকে নিশ্চিত করে তোলে।

দ্বিতীয় অধ্যায়

বাংলার সমাজ : হিন্দু ও মুসলমান—দাস ও শ্রমিক

মার্ক্সীয় দৃষ্টিকোণ থেকে লেনিন সামাজিক শ্রেণীর উৎপত্তি ও চরিত্র ব্যাখ্যা করেছেন। 'শ্রেণী হল কতকগুলি বৃহৎ সামাজিক গোষ্ঠী, ইতিহাস-নির্দিষ্ট সামাজিক উৎপাদনে যারা বিভিন্ন ভূমিকা নেয়, উৎপাদনের উপাদানের সঙ্গে যাদের সম্পর্ক ভিন্ন, সামাজিক শ্রম সংগঠনে যারা আলাদা, সম্পদ আহরণে এবং অংশ গ্রহণে যারা স্বতন্ত্র। সামাজিক আর্থিক চিত্রে ভিন্ন অবস্থানের জন্য যারা একে অন্যের শ্রমার্জিত ফল ভোগ করতে পারে।'[১] অর্থাৎ সামাজিক উৎপাদন ব্যবস্থার সঙ্গে সম্পর্কিত বিভিন্ন গোষ্ঠীই শ্রেণী। মার্ক্সীয় দর্শনে শ্রেণী প্রধানত দুটি— উৎপাদনে যারা শ্রম যোগায় আর উৎপাদনের উপাদানের যারা পুঁজিপতি মালিক। মার্ক্সের সমাজ ব্যাখ্যায় একটি জিনিস পরিষ্কার লক্ষ্য করা যায়, সেটা হল সমাজে শ্রেণী পার্থক্য সম্পর্কে সচেতনতা সৃষ্টি করে সামাজিক পরিবর্তনের পথ তৈরি করা। উৎপাদনের সঙ্গে গভীরভাবে যুক্ত হওয়ার ফলে এক শ্রেণী অপর শ্রেণীকে শোষণ করে। শুরু হয় ধন বৈষম্য। এক শ্রেণী হয় ধনহীন, অপর শ্রেণী ধনী। শুরু হয় ধনী ও নির্ধনের মধ্যে দ্বন্দ্ব। দ্বন্দ্বের মধ্য দিয়ে সমাজ গতিশীল হয়। সমাজ বিজ্ঞানীদের অপর একটি গোষ্ঠী বর্ণ ও শ্রেণীর অন্যভাবে ব্যাখ্যা করেছেন। বর্ণ হল অনুভূমিক কতকগুলি সামাজিক গোষ্ঠী যারা কখনো একে অন্যের স্থান গ্রহণ করে না। একের দুয়ার অন্যের কাছে বরাবরই রুদ্ধ থাকে; অন্তত ঐতিহ্যবাহী বর্ণসমাজে গতিশীলতা নেই। জন্ম ও বৃত্তির ওপর প্রতিষ্ঠিত বর্ণের দুর্গ প্রায় দুর্ভেদ্য (closcd society)। ধন বৈষম্যের দিকে লক্ষ্য রেখে এঁরা সমাজকে উল্লম্ব রেখায় ভাগ করেছেন। উল্লম্ব রেখায় বিভক্ত শ্রেণীগুলি একে অন্যের ওপর দাঁড়িয়ে থাকে। এরকম সামাজিক কাঠামোয় গতিশীলতা বেশি। শ্রেণীগত গণ্ডী অতিক্রম করা সহজ।

১। ভি. আই. লেনিন, 'কলেক্টেড ওয়ার্কস্', খণ্ড ২৯ (মস্কো, ১৯৬৯) পৃঃ ৪২১ (অনুবাদ গ্রন্থকারের)। মার্ক্সের চিন্তায় ও সামাজিক ব্যাখ্যার দর্শনের কার্যকরী ভূমিকা লক্ষ্য করা যায়। সামাজিক পরিবর্তন ও পুনর্গঠনের এটি একটি শক্তিশালী হাতিয়ার। এটা বিমূর্ত দর্শন নয়।

অন্য একদল সমাজবিজ্ঞানী অষ্টাদশ শতাব্দীর প্রথমার্ধের বাংলার সমাজ কাঠামোর আলোচনা প্রসঙ্গে পিরামিডাকৃতি সমাজের কথা বলেছেন।[২] এরকম সামাজিক কাঠামোর একেবারে শীর্ষদেশে নবাব, একেবারে নীচুতলায় সাধারণ মানুষ। মাঝখানে নবাবের নীচে বাংলার প্রভাবশালী অভিজাততন্ত্র। এ'রা হলেন উচ্চপদস্থ রাজকর্মচারী, সৈন্য বাহিনীর অধ্যক্ষ, মন্ত্রী ও পারিষদবর্গ এবং বাংলার প্রভাবশালী জমিদার গোষ্ঠী। অভিজাত তন্ত্রের নীচে গ্রামীণ সম্পন্ন ভূস্বামী, বণিক, মহাজন, ব্যবসায়ী, রাজকর্মচারী, বেনিয়ান, সরকার, গোমস্তা, মুৎসুদ্দি প্রভৃতি শ্রেণীর কর্মচারী। শেষ স্তরে বাংলার বিশাল জনগোষ্ঠী। এরা কৃষক, কারিগর, হস্তশিল্পী, সাধারণ সৈনিক এবং অন্যান্য সমস্ত শ্রেণীর কর্মজীবী ও শ্রমজীবী মানুষ। এ'দের বিশ্লেষণে সমাজ চারভাগে বিভক্ত—মোট চারটি সামাজিক শ্রেণী। সমসাময়িক ইতিহাসবিদ্ গোলাম হোসেন মধ্য অষ্টাদশ শতাব্দীর বাংলার ধন-বৈষম্য ও সামাজিক মর্যাদার দিকে লক্ষ্য রেখে সমাজকে তিনভাগে ভাগ করেছেন।[৩] অভিজাতরা প্রথম, গ্রামীন সম্পন্ন ভূস্বামীরা দ্বিতীয় এবং আপামর জনসাধারণ তৃতীয় শ্রেণীর অন্তর্ভুক্ত। তৎকালীন বাংলার সমাজ ও শ্রেণীবিন্যাসের এটা একটি অতি সরলীকরণ। এ সময়কার বাংলার সমাজ নিঃসন্দেহে বহু গোষ্ঠী ও জাতি নিয়ে গঠিত (Plural Society)। প্রধান দুই সম্প্রদায় হিন্দু ও মুসলমান ছাড়াও খ্রীষ্টান ধর্মাবলম্বী ইউরোপীয় বণিক এবং আর্মেনীয় ব্যবসায়ীরা অনেকেই এসময়ে বাংলায় স্থায়ীভাবে প্রতিষ্ঠিত। এদের সংখ্যা অবশ্য খুবই কম এবং সামাজিক প্রভাব নগণ্য। এরা ছাড়া এ যুগের বাংলায় বহু অবাঙালী স্থায়ীভাবে বাস করত। এরা হলেন রাজপুত, মাড়োয়ারি, কাশ্মীরী, গুজরাটি পাঞ্জাবী প্রভৃতি ভারতের অন্যান্য প্রদেশের লোক। বাংলার মুসলিম সমাজে অবাঙালী আরব, ইরাণী, তুর্কী, ও পাঠানদের স্থায়ীভাবে বাস করতে দেখা যায়।

অনেক ইতিহাসবিদ্ ও সমাজবিজ্ঞানী মার্ক্সীয় দর্শনের শ্রেণী ও ভারতের বর্ণ-প্রথাকে সমার্থক বলে ধরে নিয়েছেন।[৪] এ'দের মতে ভারতীয় বর্ণ সামাজিক শ্রেণী ছাড়া আর কিছু নয়। বর্ণ শ্রেণীরই প্রকার ভেদ মাত্র। ব্রাহ্মণ ও ক্ষত্রিয় পুঁজিপতি সুবিধাভোগী শ্রেণী আর বৈশ্য ও শূদ্র সুবিধাহীন শ্রমিক শ্রেণী। ভারতীয়

২। নিমাই সাধন বসু, 'মুঘল আমলে বাংলার জমিদার', বেতার বক্তৃতা, ২১শে জুলাই, ১৯৮১।

৩। সৈয়দ গোলাম হোসেন, 'সিয়ার-উল-মুতাক্ষরীণ', তৃতীয় খণ্ড, পৃঃ ১৯৯।

৪। নির্মল কুমার বোস, 'কালচার এণ্ড সোসাইটি ইন ইণ্ডিয়া', পৃঃ ২০৯। এ মতের

ইতিহাসে এদের মধ্যে শ্রেণীদ্বন্দ্ব বা সংঘাত না থাকার কারণ হল সুবিধাভোগী শ্রেণী সুপরিকল্পিতভাবে নিজেদের পবিত্রতা ও অমোঘতার 'মিথ' তৈরি করেছেন। কর্মফল, ভাগ্যনির্ভরতা এবং জন্মান্তরবাদ প্রচার করে এই শ্রেণী সংঘর্ষের সম্ভাবনা দূর করতে সক্ষম হয়েছেন। আর একদল সমাজ বিজ্ঞানী মনে করেন বর্ণ ও জাতিভেদ প্রথার অন্তর্নিহিত শক্তি বা সুবিধা সামাজিক প্রতিষ্ঠান হিসাবে এ ব্যবস্থাকে টিকিয়ে রেখেছে।[৫] সামাজিক পুনর্গঠনের হাতিয়ার হিসাবে আদিতে যার জন্ম সামাজিক অবিচার, অসাম্য ও অত্যাচারের মাধ্যম হিসাবে তার পরিণত রূপ দেখা দিল। এ'দের মতে বর্ণ ও জাতিভেদ প্রথার সুবিধাগুলি হল ঃ (১) গ্রামীন বা আঞ্চলিক অর্থনীতিতে বিভিন্ন পেশাধারী গোষ্ঠীর মধ্যে পরস্পর নির্ভরশীল পূর্ণ উৎপাদন ব্যবস্থা, (২) এব্যবস্থায় কর্মের নিশ্চয়তা, প্রতিযোগিতা নেই, (৩) পণ্যের পূর্ণাংশ উৎপাদনে উৎপাদকের সন্তোষ, (৪) নিজের পেশা বা বৃত্তির মধ্যে কাজ করার এবং জীবন ও সংস্কৃতি চর্চার পূর্ণ স্বাধীনতা, (৫) ধনের অসম বণ্টনে সামাজিক অসন্তোষ দূর করার জন্য অন্নপ্রাশন, বিবাহ, অন্ত্যেষ্টি, পূজাপার্বন প্রভৃতি উপলক্ষ্যে সামাজিক ভোজন, দান-ধ্যানের মাধ্যমে প্রচুর অর্থব্যয় করার ব্যবস্থা। বর্ণ ব্যবস্থার মধ্যে ধনের শ্রেণী বৈষম্য এভাবে কিছুটা দূর করা সম্ভব হত বলে এ'রা মনে করেন। ফলে তথাকথিত উচ্চ ও নীচ বর্ণের মধ্যে সংঘর্ষ ছিল না।

এ সময়কার বাংলার হিন্দু সমাজে দুই বর্ণ—ব্রাহ্মণ ও শূদ্র। দুই বর্ণের মধ্যে সব মিলিয়ে মোট ছত্রিশ জাতি। গঙ্গারাম 'মহারাষ্ট্র পুরাণে' ছত্রিশ জাতির কথা বলেছেন। চতুর্বর্ণের মাঝের দুটি স্তর—ক্ষত্রিয় ও বৈশ্য—বাংলার হিন্দু সমাজে পাওয়া যায় না।[৬] দ্বাদশ ও ত্রয়োদশ শতাব্দী থেকেই বাংলার হিন্দু সমাজে বর্ণ বিন্যাস এরকম। ছোট খাট দু একটি গোষ্ঠী ইতস্ততঃ বিক্ষিপ্ত অবস্থায় থাকলেও সামাজিক গোষ্ঠী হিসাবে এরা গণ্য হয়নি। বর্ণ ও জাতির কোনো বড় রকমের হেরফের হয়নি। ঐ সময়ে লিখিত 'বৃহদ্ধর্ম পুরাণ', এবং 'ব্রহ্মবৈবর্তপুরাণ', বাংলার হিন্দু সমাজে

আধুনিক সমর্থক হলেন বি. এন. দত্ত, এম. এন. শ্রীনিবাস এবং নর্মদেশ্বর প্রসাদ।

৫। নির্মল কুমার বোস ঐ, পৃঃ ২৪০।

৬। উইলিয়ম উইলসন হান্টার, 'দি এ্যানালস্ অব রুরাল বেঙ্গল', প্রথম খণ্ড, পৃঃ ১১১—১১২। অমিতাভ মুখোপাধ্যায়, 'দি ট্রানসফরমেশন অব কাস্ট', মডার্ণ বেঙ্গল', সম্পাঃ এস্ পি. সেন, পৃঃ ৬৮। ভারতচন্দ্র, 'গ্রন্থাবলী', পৃঃ ১০।

দুই বর্ণের কথাই বলেছে। বৈদ্য বা অম্বষ্ঠ এবং করণ বা কায়স্থরা বাংলার সমাজে ব্রাহ্মণের নীচে স্থান লাভ করেছিল। উল্লিখিত পুরাণ দুখানির মতে এরা হল 'সৎ শূদ্র' এবং 'উত্তম সঙ্কর'। ষোড়শ শতাব্দীর নবদ্বীপের বিখ্যাত স্মার্ত পণ্ডিত রঘুনন্দন বাংলার হিন্দুদের ক্রিয়াকর্ম, পূজা পার্বন, বিবাহ ও অন্যান্য অনেক বিষয়ে রীতি নীতি নির্ধারণ করে যান। এসময়ে বাংলার হিন্দুদের জাগতিক ও পারলৌকিক ক্রিয়াকর্মাদি তাঁর নির্ধারিত রীতি অনুযায়ী অনুষ্ঠিত হত। রঘুনন্দনও বৈদ্য ও কায়স্থদের শূদ্র বর্ণের অন্তর্ভুক্ত করেছেন।

ষোড়শ থেকে অষ্টাদশ শতাব্দীর মধ্যভাগ পর্যন্ত বাংলা সাহিত্য বিশ্লেষণ করলে দেখা যায় বৈদ্য ও কায়স্থরা বাংলার হিন্দু সমাজে একটি স্বতন্ত্র স্তর তৈরি করতে সক্ষম হয়েছে। এরা তখনো শূদ্র বলে পরিগণিত হত ঠিকই ; তবে এদের স্ববর্ণ—বণিক ও কারিগর—থেকে কিছুটা দূরে সরে এসেছিল। এরা কিছুটা স্বতন্ত্র হয়ে পড়েছিল। বাংলার হিন্দু সমাজে শূদ্ররাই সংখ্যা গরিষ্ঠ। এদের তিনভাগে ভাগ করা যায় —উত্তম সঙ্কর বা জলচল শূদ্র, মধ্যম সঙ্কর বা জলঅচল শূদ্র এবং অধম সঙ্কর বা অন্ত্যজ-অস্পৃশ্য শূদ্র। উত্তম সঙ্কর শূদ্রদের মধ্যে পড়ে বৈদ্য, কায়স্থ ও নব শাখরা। এই নবশাখরা হল নটি ব্যবসায়ী এবং কারিগরবর্ণ - গোপ, মালী, তাম্বুলী, তাঁতী, শাঁখারী, কাঁসারী, কুম্ভকার, কর্মকার ও নাপিত। গঙ্গারাম ও ভারতচন্দ্র উভয়েই নবশাখদের কথা উল্লেখ করেছেন। একজন ব্রাহ্মণ এদের বাড়িতে পূজাপার্বনে, পারিবারিক ক্রিয়াকর্মে যোগ দিলে বা পুরোহিতের কাজ করলে তার জাত যেত না। এমনকি এদের জলও ব্রাহ্মণদের গ্রহণীয়। সেইজন্য এরা জলচল বা জল আচরণীয় জাতি নামে পরিচিত। এদের নীচে ছিল মধ্যম সঙ্কর বা জল অচল শূদ্ররা। এরা হল কৈবর্ত, মাহিষ্য, আগুরি সুবর্ণ বণিক, সাহা-শুঁড়ি, গন্ধবণিক, বারুই বা বারুজীবী, ময়রা বা মোদক, তেলি, কলু, জেলে ধোপা প্রভৃতি। নীচু শ্রেণীর ব্রাহ্মণরা বা বর্ণ ব্রাহ্মণরা শুধু এদের বাড়িতে পৌরহিত্য করতে পারত। উচ্চশ্রেণীর হিন্দুরা এদের হাতে জল খেত না। সমাজ কাঠামোর একেবারে নীচে ছিল যুগী, চণ্ডাল, নমঃশূদ্র, পোদ, চামার, মুচি, হাড়ি, ডোম, বাউরি, বাগদি প্রভৃতি জাতির লোকেরা। এরা অধম সঙ্কর জাতি বা অন্ত্যজ—অস্পৃশ্য। মধ্যম সঙ্কর জাতির লোকেদের সঙ্গে এদের বৈবাহিক সম্পর্ক, খাওয়াদাওয়া, মেলামেশা ছিল না।

ওপরে যে জাতিগুলির পরিচয় দেওয়া হল তারা কখনো ঘনসন্নিবিষ্ট, স্তরহীন সামাজিক গোষ্ঠী ছিল না। এদের এক একটি গোষ্ঠীর মধ্যে বহু জাতি বা উপ-

জাতির সাক্ষাৎ মেলে। এই ছত্রিশ জাতির তিনটি সাধারণ বৈশিষ্ট্য লক্ষ্য করা যায়। 'সামাজিক কাঠামোয় একটি বিশেষ স্তরে অবস্থান, একটি পারিবারিক বৃত্তি বা পেশা অবলম্বন এবং বিবাহ ও খাদ্যাখাদ্যসহ, কতকগুলি সামাজিক নিয়ম-কানুন মেনে চলা। এই সাধারণ জাতি বৈশিষ্ট্যগুলি মেনে চলা সত্ত্বেও এই জাতি-গুলির মধ্যে পার্থক্য ও বিভেদ লক্ষ্য করা যায়। ব্রাহ্মণ বর্ণ পাঁচ শ্রেণীতে বিভক্ত —রাঢ়ী, বারেন্দ্র, বৈদিক, সপ্তশতী এবং কান্যকুব্জ। এদের মধ্যে খাওয়া-দাওয়া এবং বিবাহ ব্যাপারে বিধি-নিষেধ চালু ছিল। বাংলার বৈদ্যরাও পাঁচগোষ্ঠী—পঞ্চকোটী, রাঢ়, বারেন্দ্র, বঙ্গ ও পূর্বকূল। কায়স্থদের মধ্যে আবার ছয়ভাগ—উত্তর রাঢ়ী, দক্ষিণ রাঢ়ী, বঙ্গজ, বারেন্দ্র, শ্রীহট্টবাসী ও দাসকায়স্থ। এদের মধ্যে বৈবাহিক সম্পর্ক স্থাপনের ক্ষেত্রে বিধি নিষেধ ছিল। ব্রাহ্মণরা আবার কৌলিন্যে পাঁচ ভাগে বিভক্ত—কুলীন, শ্রোত্রীয়, গৌণকুলীন, বংশজ ও সপ্তশতী গোষ্ঠী। পঞ্চদশ শতাব্দীতে দেবীবর ঘটক কুলীন ব্রাহ্মণদের মধ্যে দোষানুসারে ছত্রিশটি মেল বন্ধনের সৃষ্টি করে যান।[৭] এদের মধ্যে বিবাহ সম্পর্ক স্থাপন করা বাঞ্ছনীয় বলে বিবেচিত হত। ব্রাহ্মণদের মত বৈদ্য ও কায়স্থরাও কুলীন ও অকুলীন শ্রেণীতে বিভক্ত ছিল। ঘোষ, বসু, মিত্র কুলীন।[৮] পূর্ববঙ্গে গুহরাও কুলীন। দক্ষিণবঙ্গে অন্যরা সকলে মৌলিক ও বাহাওরঘর অর্থাৎ অকুলীন। এ যুগে কৌলিন্য নিয়ে উচ্চ জাতিগুলির মধ্যে বাদ-বিসম্বাদ বেশ ভাল রকমের ছিল। কৌলিন্যপ্রথা থেকে পারিবারিক ও বৈবাহিক সম্পর্কের ক্ষেত্রে নানারকম বিকৃতি ও জটিলতা সৃষ্টি হয়েছিল বলে প্রমাণ পাওয়া যায়।[৯] বাংলার হিন্দুদের বিশেষ করে ব্রাহ্মণদের মধ্যে কুলীন প্রথা বিদেশীদেরও দৃষ্টি আকর্ষণ করেছিল। উচ্চবর্ণের মধ্যে কুলীন প্রথার কয়েকটি সাধারণ বৈশিষ্ট্য লক্ষ্য করা যায়। (১) ব্রাহ্মণদের মধ্যে এ প্রথার চলন বেশি। স্ট্যাভোরিনাস লিখেছেন অন্য ব' অপেক্ষা ব্রাহ্মণদের মধ্যে কুলীন প্রথার কঠোরতা ও কুফল বেশি দেখা গিয়েছিল। (২) কুলীন ব্রাহ্মণদের বহু বিবাহ, (৩) কুলীন কন্যাদের দীর্ঘকাল বা সারাজীবন অনূঢ়া থাকা, (৪) যৌতুক প্রথা, (৫) সামাজিক বিরোধ, বিকৃতি ও অনাচার (শিশুর সঙ্গে

৭। 'দোষান মেলয়ীতি মেল', অমিতাভ মুখোপাধ্যায়, জাতিভেদ প্রথা ও উনিশ শতকের বাঙ্গালী সমাজ, পৃঃ ৩৩-৩৪।

৮। ভারতচন্দ্র, 'অন্নদামঙ্গল', ভারতচন্দ্রের গ্রন্থাবলী, বসুমতী সং, পৃঃ ৬০।

৯। ছদ্মবেশী অন্নদার কাছে ঈশ্বরী পাটনীর উক্তি—'যেখানে কুলীন জাতি সেখানে কোন্দল', সমকালীন সমাজের প্রতিচিত্র বলে মনে হয়। স্ট্যাভোরিনাস, 'ভয়েজ', প্রথম খণ্ড, পৃঃ ৪৪০।

বৃদ্ধার এবং বৃদ্ধের সঙ্গে নাবালিকার বিবাহ ইত্যাদি)। বাংলার হিন্দুসমাজের অন্য সকল জাতিও 'শ্রেণী' ও 'সমাজে' বিভক্ত ছিল। নিঃসন্দেহে 'সমাজ বহুস্তর বিশিষ্ট একের ক্রিয়াকর্ম, আচার পদ্ধতি অন্যদের থেকে পৃথক।'

হিন্দু সমাজের স্তর নির্দিষ্ট হয় তার বর্ণ বা জাতির বৃত্তি বা পেশা দিয়ে। কতকগুলি পেশা ঐতিহ্যগত ভাবে বিশেষ সম্মানের এবং সামাজিক মর্যাদার অধিকারী। জন্মসূত্রে যারা এই বৃত্তির অধিকারী তারা সমাজে বিশেষ সম্মান ও শ্রদ্ধার পাত্র। আবার কতকগুলি পেশা অপেক্ষাকৃত কম সম্মানের এবং এই বৃত্তিধারীরা স্বভাবতই নীচুস্তরের অধিবাসী। বর্ণ ও জাতির এই বৃত্তিগত চরিত্র এসময়ে পরিষ্কার। সমাজতত্ত্ববিদ্ নির্মলকুমার বোসের মতে 'এরকম বৃত্তিমূলক বর্ণ সৃষ্টির উদ্দেশ্য হল সমাজে প্রতিযোগিতাহীন উৎপাদন ব্যবস্থা গড়ে তোলা।' বর্ণ বা জাতি সেই গোষ্ঠীর লোকের জন্য জীবিকা নিরাপদ ও নিশ্চিত রাখত। একমাত্র এই কারণেই বর্ণ ও জাতিভিত্তিক সমাজ যুগ যুগ ধরে চললো এবং এমনকি মুসলমানরাও এদিকে কিছুটা পরিমাণে আকৃষ্ট হল।[১০]

রায়গুণাকর ভারতচন্দ্র ও গঙ্গারাম হিন্দু বাঙালীর বর্ণ ও জাতিভিত্তিক সমাজের অনেক খুঁটিনাটি তথ্য আমাদের সরবরাহ করেছেন।[১১] এঁদের বিস্তৃত বর্ণনা থেকে তৎকালীন বাংলার প্রধান প্রধান বর্ণ ও জাতিগুলির বৃত্তি বা পেশার পরিচয় পাওয়া যায়। ব্রাহ্মণ বর্ণ প্রধানত অধ্যয়ন, বেদ, ব্যাকরণ, স্মৃতি, ন্যায়, দর্শনচর্চা এবং পূজার্চনা নিয়ে থাকত। সমসাময়িক বিবরণ থেকে জানা যায় একজন ব্রাহ্মণ প্রয়োজন হলে সামান্য করণিকের কাজ নিতেন তবু সেনাবাহিনীতে নাজির বা জমাদারের পদ বা কোনো উচ্চ কূটনৈতিক পদ গ্রহণ করতেন না। বৈদ্যরা জাতিগত পেশা চিকিৎসাতে নিযুক্ত ছিল। চিকিৎসা ছাড়াও তারা কাব্য, ব্যাকরণ ও আয়ুর্বেদ চর্চা করত। কায়স্থরা একচেটিয়া করণিক। রাজস্ব বিভাগের চাকরি তাদের জন্য নির্দিষ্ট থাকত। মুর্শিদকুলী থেকে সিরাজুদ্দৌলা পর্যন্ত বাংলার নবাবরা হিন্দুদের ব্যাপকহারে রাজস্ববিভাগে ও প্রশাসনে নিযুক্ত করেছিলেন। কায়স্থরা এই সরকারী চাকরির বেশির ভাগটাই পেত। নবশাখেরা তাদের স্ব স্ব জাতিগত পেশা বা বৃত্তিতে নিযুক্ত ছিল। এরা ব্যবসায়ী ও

১০। নির্মল কুমার বোস, উদ্বোধনী ভাষণ, এম. কে. চৌধুরী সম্পাঃ 'সোসিও-ইকনমিক চেঞ্জ ইন ইণ্ডিয়া : ১৮৭১-১৯৬১' (সিমলা, ১৯৬৯) পৃঃ ৮।

১১। গঙ্গারাম, 'মহারাষ্ট্র পুরাণ' পৃঃ ২১-২২; ভারতচন্দ্র, 'বিদ্যাসুন্দর' ভারতচন্দ্রের গ্রন্থাবলী, পৃঃ ৬৯।

কারিগর। তাম্বুলী বা তিলি ও গোপ ব্যবসায়ী, অন্য সাতটি জাতি কারিগর (কাঁসারী, শাঁখারী, তাঁতি, মালাকার, কুম্ভকার, কর্মকার ও নাপিত)। দ্বিতীয় শ্রেণীর শূদ্ররা প্রধানত চাষ-আবাদ ও ব্যবসায়ে নিযুক্ত। অন্যরা তৈল নিষ্কাশন, মাছ ধরা, কাপড় কাচা প্রভৃতি জাতিগত বৃত্তিধারী। অন্ত্যজ শ্রেণীর লোকেরা চাষী, শ্রমিক, পশুপালক, শিকারী, লাঠিয়াল, পাইক ও বরকন্দাজ।

এ সময়ে হিন্দু সমাজের বর্ণ ও জাতিভেদ ব্যবস্থায় বেশ খানিকটা কঠোরতা দেখা যায়। ওপরের শ্রেণী সম্পর্কে ভয় এবং নীচের শ্রেণী সম্বন্ধে অবজ্ঞা। জাত যাবার ভয় 'ডেমোক্লিসের তরবারির' মত সব সময় মাথার ওপর লম্বমান।[১২] নিম্ন এক বর্ণ ও জাতি থেকে উচ্চ আর এক বর্ণ ও জাতিতে উত্তরণ সম্ভব হত না। তবে বৃত্তি পরিবর্তনে বর্ণ বা জাতি খুব একটা বড় বাধা হয়ে দেখা দেয়নি। হিন্দুদের সমস্ত বর্ণ ও জাতির মধ্যে বৃত্তি পরিবর্তনের ঝোঁক দেখা যায়। ব্রাহ্মণ, বৈদ্য ও কায়স্থদের মধ্যে বৃত্তি পরিবর্তনের ঘটনা হামেশাই ঘটত। ঠিক এ সময়ে বাংলাদেশে একাধিক ব্রাহ্মণ জমিদার পরিবারের সৃষ্টি হয়। নাটোরের সুবিখ্যাত ব্রাহ্মণ জমিদার পরিবার (রামজীবন, রামকান্ত ও রাণী ভবাণী), ময়মনসিংহের শ্রীকৃষ্ণ হালদার এবং ময়মনসিংহের মুক্তাগাছার বারেন্দ্র ব্রাহ্মণ শ্রীকৃষ্ণ আচার্য চৌধুরীর জমিদার পরিবারের এ সময় উৎপত্তি। এছাড়া এ যুগের বাংলাদেশে অনেক ব্রাহ্মণ পরিবার ভূম্যধিকারী বা ছোট জমিদার ছিল (রাজশাহীর তাহিরপুর, পুঁথিয়া ইত্যাদি)। কবি ভারতচন্দ্রের পিতা নরেন্দ্রনাথ রায় বর্ধমানের অন্তর্বর্তী ভুরসুট পরগণার পাণ্ডুয়াতে জমিদার ছিলেন। এ যুগে অনেক ব্রাহ্মণ কায়স্থ জমিদারের ম্যানেজার হিসাবেও কাজ করতেন। বাংলার মুসলমান নবাবরা ব্রাহ্মণদের সহজ শর্তে জমিদারি বন্দোবস্ত দিতেন এবং রাজস্ব আদায়ের ব্যাপারে এদের সঙ্গে খুব বেশি দুর্ব্যবহার করতেন না। আবওয়াব ও অন্যান্য কর থেকে এরা অনেক সময় রেহাই পেতেন। এজন্য জমিদারি পরিচালনায় এ সময় ব্রাহ্মণদের বেশি সংখ্যায় দেখা যায়। বৈদ্যরা জাতিগত ব্যবসা চিকিৎসা ও আয়ুর্বেদ চর্চা ছাড়াও কাব্য, সাহিত্য, ব্যাকরণ, ন্যায় ও স্মৃতি চর্চা করত। কায়স্থদের মধ্যে অনেকেই এ সময় উচ্চ রাজকর্মচারী। বাংলার বড়, মাঝারি ও ছোট জমিদারদের অনেকেই কায়স্থ জাতিভুক্ত। আবুল ফজল আইন-ই-আকবরীতে বাংলার জমিদারদের অধিকাংশ কায়স্থ বলে উল্লেখ করেছেন।[১৩] মধ্য অষ্টাদশ শতাব্দীর

১২। হাণ্টার, ঐ, প্রথম খণ্ড, পৃঃ ১৩৯।
১৩। আবুল ফজল, 'আইন-ই-আকবরী' দ্বিতীয়খণ্ড, পৃঃ ১৪৭।

বাংলার রাজনীতিতে এরা খুবই প্রভাবশালী গোষ্ঠী। বর্ণস্তরে তারা ব্রাহ্মণদের নীচে ছিল ঠিকই কিন্তু সম্পদ, সামাজিক প্রতিপত্তি ও মর্যাদায় তারা ব্রাহ্মণদের থেকে কোনো অংশে কম ছিল না।

এটা সত্য যে বৃত্তি পরিবর্তনের ধারাটি উচ্চবর্ণের মধ্যে বেশি ছিল। তবে অন্যান্য বর্ণ ও জাতির মধ্যেও বৃত্তি পরিবর্তনের ঘটনা বিরল নয়। গৌড়ীয় বৈষ্ণবদের মধ্যে অব্রাহ্মণও গুরু হয়ে ব্রাহ্মণকে দীক্ষা দিত। সহজিয়াদের মধ্যেও এটা চালু ছিল। তারা বর্ণভেদ মানত না। নবশাখদের মধ্যে তাম্বুলিরা তাদের জাতিগত বৃত্তি পান সুপারির ব্যবসা ছেড়ে নানা রকম ব্যবসা-বাণিজ্য শুরু করে দেয়। অনেকে ধনী হয়ে জমিদারিও কিনেছিল। রানাঘাটের বিখ্যাত পাল চৌধুরী পরিবারের প্রতিষ্ঠাতা কৃষ্ণ পান্তি জাতিতে ছিলেন তাম্বুলি। পেশায় পান-সুপারির ব্যবসায়ী। ব্যবসায়ে ধনী হয়ে তিনি জমিদারি কিনেছিলেন। কবিরঞ্জন রামপ্রসাদের পদ 'ঐ যে পান বেচে খায় কৃষ্ণ পান্তি তারে দিলে জমিদারী'—এর সাক্ষ্য দিচ্ছে। রাজশাহীর অন্তর্গত দীঘাপাতিয়া জমিদারির প্রতিষ্ঠাতা দয়ারাম রায় জাতিতে তিলি। এযুগেই ধোবাদের একাংশ জাতিগত পেশা ছেড়ে চাষ-বাস শুরু করেছিল। ভারতচন্দ্র 'বিদ্যাসুন্দর' কাব্যে বর্ধমানের বর্ণ ও জাতিগুলির বর্ণনায় চাষা-ধোবাদের কথা উল্লেখ করেছেন।[১৪] বাংলার হিন্দু সমাজে ক্ষত্রিয় বর্ণ নেই। তাদের কাজ করত গোয়ালা, বাগদি, হাড়ি, ডোম প্রভৃতি উপবর্ণের লোকেরা, সুবর্ণ বণিকদের অনেকে বেনিয়ান, মুৎসুদ্দি, সরকার, গোমস্তা হিসাবে কাজ করত। ইউরোপীয় কোম্পানীগুলির বাংলা বাণিজ্যে এরা ছিল অপরিহার্য। সুতরাং দেখা যাচ্ছে প্রাক্‌ পলাশীযুগে বাংলার হিন্দু সমাজের বর্ণ, জাতি ও উপজাতিগুলির মধ্যে বৃত্তি পরিবর্তনের ঘটনা নিয়মিতভাবে ঘটত। তবে বর্ণ, জাতি বা উপজাতির কোনো পরিবর্তন দেখা যায় না।

ভারতের অন্যান্য অঞ্চলের সঙ্গে তুলনায় বাংলার হিন্দু সমাজের বর্ণ ও জাতি প্রথা খুব কঠোর ছিল বলা যায় না। বিশেষ করে উত্তর ও দক্ষিণ ভারতের সঙ্গে তুলনায় এটা অনেকখানি শিথিল ব্যবস্থা ছিল বলা চলে। 'ব্রাহ্মণরা যদিও সমাজে সর্বাগ্রে ছিল তবুও বৈদ্য ও কায়স্থদের সঙ্গে সামাজিক সম্মান ও প্রতিপত্তি ভাগ করে নিতে হত। সামাজিক গৌরব তারা একচেটিয়া ভোগ করতে পারত না।' এ সময়ে বাংলার হিন্দু সমাজে নেতা দুজন। পশ্চিমবঙ্গে নদীয়ার ব্রাহ্মণ

১৪। ভারতচন্দ্র, 'গ্রন্থাবলী' পৃঃ ১০।

জমিদার রাজা কৃষ্ণচন্দ্র এবং পূর্ববঙ্গে ঢাকার রাজনগরে উচ্চপদস্থ রাজ কর্মচারী বৈদ্যবংশীয় মহারাজ রাজবল্লভ সেন। রাজবল্লভ রাজনগরে বিশাল সমারোহে অনুষ্ঠান করে বাংলার বৈদ্যদের উপবীত ধারণের অধিকার ঘোষণা করেছিলেন। এই অনুষ্ঠানে তাঁর দল লক্ষ টাকা খরচ হয়েছিল। এ যুগে নিজজাতি থেকে উচ্চতর জাতিতে উত্তরণের এটি একটি উল্লেখযোগ্য প্রচেষ্টা। কৃষ্ণচন্দ্রের নেতৃত্বে নদীয়া সমাজ বৈদ্যদের ব্রাহ্মণ বলে স্বীকার করল না। ফলে রাজবল্লভের এ প্রচেষ্টা সাফল্যমণ্ডিত হল না। রাজবল্লভ বাংলায় বিধবা বিবাহ প্রচলনের চেষ্টা করেছিলেন। তাঁর নিজকন্যা অভয়া মাত্র নবছর বয়সে বিধবা হয়। তিনি বাংলার তৎকালীন খ্যাতনামা পণ্ডিতদের মতামত সংগ্রহ করতে শুরু করেন। বাংলার পণ্ডিতদের একাংশ অক্ষত যোণী কন্যার পুনর্বিবাহে সম্মতি দিয়েছিলেন। তবে বাংলার হিন্দু সমাজের অপর নেতা রাজা কৃষ্ণচন্দ্র তাঁর এ প্রচেষ্টায় বাধাস্বরূপ হয়ে দাঁড়ান। তাঁর নেতৃত্বে নবদ্বীপের পণ্ডিতরা বিধবা বিবাহে আপত্তি জানালেন। সমাজ সংস্কারে রাজবল্লভের দ্বিতীয় প্রচেষ্টাও ব্যর্থ হল। এযুগে সমাজ সংস্কারে তৃতীয় প্রচেষ্টা হল নাটোরের রাণীভবানীর। তিনি বাংলার হিন্দু বিধবাদের বৈধব্যজীবনের কঠোরতা হ্রাস করার চেষ্টা করেছিলেন। বাংলার পণ্ডিত সমাজের বাধাদানের ফলে তাঁর সংস্কার প্রচেষ্টা ব্যর্থ হয়েছিল। কৃষ্ণচন্দ্রের বিরুদ্ধে দেওয়ান কার্তিকেয়চন্দ্র রায়ের এ বিষয় সম্পর্কিত মন্তব্যটি অত্যন্ত তাৎপর্যপূর্ণ। এযুগের বাংলার হিন্দু সমাজের প্রভাবশালী নেতৃবর্গের ধ্যান-ধারণা, রক্ষণশীলতা ও গোঁড়ামি এর মধ্যে প্রতিফলিত। কার্তিকেয়চন্দ্র রায় লিখছেন ঃ 'কৃষ্ণচন্দ্র স্বদেশের কোন কলুষিত ব্যবহার পরিশুদ্ধ করণে কখন হস্তক্ষেপ করেন নাই। তাঁহার সময়ে এ প্রদেশে যেরূপ সর্বশাস্ত্র-বিশারদ পণ্ডিতগণ আবির্ভূত হইয়াছিলেন, এবং তিনি যেমন শাস্ত্রজ্ঞ এবং সুবিজ্ঞ বলিয়া বিখ্যাত ছিলেন, আর তৎকালীন হিন্দু সমাজের উপর তাঁহার যে প্রকার প্রভুত্ব ছিল, তাহাতে বোধ হয়, তিনি যত্নশীল হইলে, শাস্ত্র বিরুদ্ধ ব্যবহারমূলক অনেক বিগর্হিত রীতিনিরসন ও হিতজনক রীতি সংস্থাপনে কৃতকার্য্য হইতে পারিতেন। তিনি তাহা না করিয়া বরং যাহাতে ঐ পূর্ব কুরীতি বলবতী থাকে, তৎপ্রতিই সর্বদা যত্ন করিয়াছেন, এবং অন্য কোন ক্ষমতাশালী ব্যক্তি স্বদেশের কোন দূষিত ও অহিত ব্যবহার নিরাকরণে যত্নবান হইলে, তাঁহার চেষ্টা বিফল করিয়া দিয়াছেন (রাজবল্লভ কর্তৃক বিধবা বিবাহ প্রচলন চেষ্টায় বাধাদান)। একাদশী তিথিতে দুঃখিনী বিধবাদিগের পক্ষে উপবাসের অনুকল্প-বিধান, তাহাদের অশেষ ক্লেশকর 'বৈধব্য যন্ত্রণা বিমোচন' অথবা 'সহমরণ' এবং

'বহুবিবাহ' ও 'বাল্য পরিণয়' প্রথা অপনয়ন প্রভৃতি অত্যাবশ্যক বিষয়ে প্রবৃত্ত না হইয়া কেবল এই তিথিতে, এই মাসে, এই বারে এই দ্রব্য ভক্ষণে নিষেধ ইত্যাদি যৎসামান্য বিষয়েই ব্যাপৃত থাকিতেন'।[১৫] একজন বিদেশী সমাজবিজ্ঞানী বাংলার হিন্দুদের মধ্যে দুটি জিনিষের অভাব লক্ষ্য করেছিলেন।[১৬] একটি হল প্রয়োজনাতিরিক্ত উৎপাদনে অনীহা এবং অপরটি হল বর্ণ ও জাতিগুলির মধ্যে সহযোগিতার অভাব। তাঁর মতে জাগতিক উন্নতির একটি প্রধান শর্ত হল প্রয়োজনাতিরিক্ত উৎপাদন। সেটা না থাকাতে এ সময়কার হিন্দুদের তেমন জাগতিক উন্নতি ঘটেনি। দ্বিতীয়ত, বর্ণ ও জাতিভিত্তিক সমাজে বর্ণে বর্ণে জাতিতে জাতিতে বিদ্বেষ ও অবজ্ঞা, জাত হারানোর ভয় সমস্ত সমাজের মধ্যে প্রীতি ও সহযোগিতার দুয়ার রুদ্ধ করে রেখেছিল।

সমাজ গঠনে ধর্ম ও ধর্মীয় জীবনের প্রভাব অস্বীকার করা যায় না। ধর্ম ও ধর্মীয় জীবন, ধর্মীয় দর্শন ও অনুশাসন একটি সমাজের কাঠামো গঠনে অনেকখানি ভূমিকা নেয়। অষ্টাদশ শতাব্দীর প্রথমার্ধের বাংলার মুসলমান সমাজের গড়ন হিন্দুদের থেকে বেশ খানিকটা ভিন্ন ধরণের। একথা ঠিক ইসলাম ধর্ম বাংলাদেশে ন্যায় ও সাম্যের ভিত্তিতে সমাজ গঠনে অনেকখানি সাহায্য করেছে, এবং একারণে বাংলার মুসলমান সমাজ কাঠামোগতভাবে হিন্দু সমাজ থেকে আলাদা। মুসলমান সমাজে স্তর অনেক কম। একস্তর থেকে অন্যস্তরে যাওয়া অনেক সহজ। খাওয়া-দাওয়া, মেলামেশা ও বিবাহ ইত্যাদি ব্যাপারে বিধি নিষেধ অনেক শিথিল। বাংলার মুসলমান সমাজে স্তর বা বর্ণ কম থাকার কারণ আতরাফ বা সাধারণের সংখ্যাধিক্য। কৃষক, শ্রমিক ও বৃত্তিজীবী মানুষের সংখ্যা হল প্রায় শতকরা পঁচাত্তর ভাগ।[১৭] এজন্য মুসলমান সমাজে বর্ণভেদ বা স্তর ভেদ চোখে পড়ে না।

বাংলার মুসলমান সমাজকে তিন ভাগে ভাগ করা যায়—আশরাফ, আজলফ বা আতরাফ এবং আরজল।[১৮] আশরাফ উচ্চ শ্রেণী, আতরাফ সাধারণ কৃষক, শ্রমিক, বৃত্তিধারী মানুষ এবং আরজল পতিত শ্রেণী (degraded)। আশরাফ হল বাংলার উচ্চ শ্রেণীর মুসলমান—শেখ, সৈয়দ, পাঠান, মুঘল। সমসাময়িক

১৫। কার্ত্তিকেয় চন্দ্র রায়, 'ক্ষিতীশ বংশাবলী চরিত' রাণী ভবানী নিজ বিধবা 'কন্যার দুঃখ দূর করার উদ্দেশ্যে বিধবাদের জন্য নির্দিষ্ট একাদশী ব্রতের কঠোরতা হ্রাস করার চেষ্টা করেছিলেন। বাংলার পণ্ডিতদের বাধাদানের ফলে তাঁর প্রচেষ্টা ব্যর্থ হয়। পৃঃ ৫৩-৫৪।

১৬। হান্টার, ঐ, প্রথম খণ্ড, পৃঃ ১৩৮।

১৭। ১৮৭২ সালের সেন্সাস রিপোর্ট অনুযায়ী বাংলার মুসলমান জনগোষ্ঠীর ৬২% শতাংশ কৃষক ও শ্রমিক।

ব্যক্তিদের লেখায় এই চার শ্রেণীর মুসলমানের উল্লেখ আছে। এমনকি হিন্দু গঙ্গারাম এদের কথা উল্লেখ করতে ভোলেননি। কৃষক, শ্রমিক, অন্যান্য বৃত্তিজীবী, কারিগর, শিল্পী, দোকানদার, জোলা ও তাঁতি, সকলেই আতরাফ। মুস্‌লিম সমাজে চামার, বেদে, বাজীকর প্রভৃতি শ্রেণীর লোক পতিত (degraded)।[১৮] সমাজে এদের সংখ্যা খুবই কম। সমাজে শতকরা কুড়িভাগ আশরাফ, পঁচাত্তর ভাগ আতরাফ এবং পাঁচভাগ আরজল। ১৮৭২ সালের সেন্সাসের ভিত্তিতে এরকম অনুমান করা বোধহয় অন্যায় হবে না।

মুসলমান সমাজে আভিজাত্যে ও সামাজিক মর্যাদায় সৈয়দরা প্রধান। এরা আবার দুই গোষ্ঠীতে বিভক্ত—বেণী ফাতেমীয় এবং উলবি বেণী। বেণী ফাতেমীয়রা হজরত আলি ও পয়গম্বর হজরত মোহাম্মদের কন্যা বিবি ফাতিমার বংশধর। উলবি সৈয়দরা হজরত আলি ও তাঁর অন্যান্য স্ত্রীর গর্ভজাত সন্তানদের বংশধর। এই সৈয়দরা আবার বিভিন্ন উপগোষ্ঠীতে বিভক্ত—হুসেনী, হাসানী মুসাবী, রাজভী, কাজেমী, তাকাবী, নাকাবী প্রভৃতি। এছাড়া জায়দি, ইসমাইলী, তাবাতাবাই, কাদরী নামের সৈয়দদের পরিচয় পাওয়া যায়। উৎপত্তি বা জন্মস্থানের নামানুসারে আবার কয়েকটি সৈয়দ পরিবার পরিচিত। এরা হল বোখারি, কারমানী, তাব্রেজী, শাবজাওয়ারি প্রভৃতি। শেখদের মধ্যে কোরেশী শেখরাই সমাজে সর্বাগ্রগণ্য। এর কারণ হল পয়গম্বর হজরত মোহাম্মদ এ বংশেই জন্ম গ্রহণ করেছিলেন। এরও অনেকগুলি শাখা—সিদ্দিকী, ফারুকী আশমানী, আববাসী, খালেদি প্রভৃতি। ওপরের আলোচনা থেকে দেখা যাচ্ছে সৈয়দ এবং শেখরা মূলত আরবদেশ থেকে উদ্ভূত। ইরাণ, আফগানিস্তান এবং খোরাসানে সাধুসন্তদের বংশধর, খ্যাতিমান বিদ্বান ব্যক্তি এবং প্রখ্যাত ধার্মিক ব্যক্তিরা শেখ উপাধি পান। মধ্য এশিয়ার চুঘতাই তুর্কীরা ভারতে মুঘল নামে পরিচিতি লাভ করে। এদের উপাধিগুলি হল মির্জা বা বেগ। এই মুঘলদেরও ভারতে অনেকগুলি শাখা বা প্রশাখা দেখা যায়। আফগানরা বাংলাদেশে পাঠান নামে পরিচিত। বাংলায় মুঘল শাসন প্রতিষ্ঠার আগে পাঠানরা তিনশো বছরের বেশি এদেশে শাসন ক্ষমতায় ছিল। সেজন্য এযুগে বাঙালী মুসলমানদের মধ্যে পাঠানদের সংখ্যা বেশি। এদের উপাধি খাঁ। এদেরও অনেকগুলি শাখা-প্রশাখা ছিল। উত্তর ভারতের তুলনায় এযুগের বাংলা অপেক্ষাকৃত শান্ত ও নিরাপদ স্থান বলে বহু অবাঙালী মুসলমান পরিবার স্থায়ীভাবে বাংলায় বসবাস শুরু করেছিল। উচ্চশ্রেণীর

১৮। গেট (Gait), সেন্সাস রিপোর্ট, বেঙ্গল, ১৯০১।

মুসলমানরা দীর্ঘকাল বাংলার শাসন ক্ষমতায় ছিল। বাংলায় প্রায় স্থায়ীভাবে দীর্ঘকাল থাকাকালীন তাদেরও সংখ্যাবৃদ্ধি হয়েছিল।[১৯] সবমিলিয়ে বাংলার মুসলমান সমাজে উচ্চশ্রেণী বা আশরাফদের ভূমিকা উল্লেখযোগ্য। বাংলার মুসলমান সমাজের দ্বিতীয় শ্রেণী আতরাফদের একটি অংশ ধর্মান্তরিত হিন্দু। বাংলাদেশের হিন্দু সমাজের একটি অংশ ইসলাম ধর্ম গ্রহণ করেছিল। সমাজতত্ত্ববিদ্‌রা সাধারণভাবে এর তিনটি কারণ দেখিয়ে থাকেন—(১) ইসলাম রাজশক্তি, (২) ইসলামের ন্যায় ও সাম্য নিচু তলার বাঙালী হিন্দুদের অনেককে আকৃষ্ট করেছিল, এবং (৩) হিন্দুদের বর্ণ ও জাতিভেদের কাঠিন্য ও জাতিচ্যুতি অনেককে ইসলামের দিকে ঠেলেছিল। বাংলার হিন্দুরা ইসলামধর্ম গ্রহণ করার পরেও কিন্তু সামাজিক মেলামেশায়, মর্যাদায় বা বিবাহ ব্যাপারে আশরাফদের সমান বলে গণ্য হত না। ধর্মান্তরিত হওয়ার আগে তারা যে সামাজিক অবস্থায় ছিল পরেও সে অবস্থায় থাকত। তারা শুধু তাদের সমপর্যায়ের মুসলমানদের সঙ্গে মিশতে বা সামাজিক সম্পর্ক স্থাপন করতে পারত। অর্থাৎ হিন্দুরা সাধারণভাবে ধর্মান্তর গ্রহণের পর মুসলমান সমাজে আতরাফদের অন্তর্ভুক্ত হত। আতরাফদের মধ্যেও দুটি স্তর লক্ষ্য করা যায়, বিদেশাগত মুসলমান ও এদেশীয়দের মধ্যে বৈবাহিক সম্পর্কের মধ্য দিয়ে উদ্ভূত মিশ্র শ্রেণী আতরাফদের মধ্যে অভিজাত। এরা কাজী বা চৌধুরী, শেখ, খাঁ, মালিক নামে অভিহিত হত। অন্যরা সকলে দ্বিতীয় স্তরের আতরাফ।

সৈয়দ, শেখ, মুঘল, পাঠানরা—যারা আরব, মধ্য এশিয়া, ইরাণ ও আফগানিস্তান থেকে বাংলাদেশে এসেছিল—অসি ও মসীকে উপজীবিকার প্রধান উপায় বলে মনে করত। এ যুগে এরা সকলেই হয় অস্ত্র ব্যবসায়ী না হয় উচ্চ রাজকর্মচারী[২০]। এদের অনেকে এদেশে থাকাকালীন ভূসম্পত্তির মালিক হয়ে বসেছিল। একটি উল্লেখযোগ্য উদাহরণ হল বীরভুমের আসাদুল্লাহ খানের জমিদার পরিবার। উচ্চ শ্রেণীর মুসলমানরা সামরিক ও রাজকাজ ছাড়া অন্য সকল কাজকেই তাদের পদ ও মর্যাদার হানিকর বলে মনে করত। এরা কখনো নিজের হাতে জমি চাষ করত না, যারা ভূসম্পত্তির মালিক ছিল তারা শ্রমিকদের মজুরি দিয়ে জমি চাষ করিয়ে নিত। যদি কেউ এ নিয়ম ভঙ্গ

১৯। ফাজলি রাব্বি—'বাংলার মুসলমানদের উৎপত্তি' ('হকিকৎ-ই-মুসলমানী বাঙ্গালা'র অনুবাদ) পৃঃ ১১-৫৩, ৫৯, ১০০-১০১।

২০। ফাজলি রাব্বি, ঐ, পৃঃ ১০৬।

করত তাহলে সামাজিকভাবে সে পতিত হত। সমস্ত আশরাফরা তাঁর দিকে ঘৃণার চোখে তাকাত। মুসলমান সমাজের পক্ষে এর ফল ভাল হয়নি একথা বলাই বাহুল্য। উচ্চশ্রেণীর মুসলমানদের বাণিজ্য, শিল্প প্রভৃতিকে অবজ্ঞা করার ফলে এ শ্রেণীর মধ্যে এগুলির চর্চা হল না। ধন সঞ্চয় বন্ধ হয়ে রইল। এ যুগে উচ্চবংশীয় ধনী মুসলমান বণিকের সংখ্যা খুবই কম। সাধারণ ব্যবসা বাণিজ্য ও শিল্পেও এদের সাক্ষাৎ মেলে না। বাংলার আতরাফরা বা বাইরে থেকে আসা মুসলমানরা ব্যবসা-বাণিজ্য ও শিল্পে অংশ নিত। ধর্মান্তরিতরা তাদের পিতৃপুরুষের বৃত্তি বা পেশা ছাড়েনি। অনেকে ধর্মান্তর গ্রহণের আগে ব্যবসায়ে নিযুক্ত ছিল। তারা তাদের সন্তানসন্ততিদের ঐ মানসিকতা দিয়ে গেল। ফলে আতরাফদের মধ্যে একটা অংশ ব্যবসা, বাণিজ্য, শিল্প ও নানারকম বৃত্তিতে নিযুক্ত রইল। আতরাফদের দ্বিতীয় স্তরের একটা অংশ কারিগর, হস্তশিল্পী, তাঁতি জোলা প্রভৃতি বৃত্তিজীবী মানুষ। ইসলাম ধর্ম ব্যবসা বাণিজ্যকে কখনো খারাপ চোখে দেখেনি। বণিক বা সওদাগরদের সামাজিক মর্যাদাও কম থাকার কথা নয়। কিন্তু বাংলার মুসলমান সমাজে এক অদ্ভুত পরিস্থিতির সৃষ্টি হল। হিন্দু সমাজের মত মুসলমান সমাজের বৃত্তিধারীরা যুগ যুগ ধরে তাদের পিতৃপুরুষের ব্যবসা, শিল্প বা পেশায় নিযুক্ত রইল। প্রায় সমসাময়িক ওলন্দাজ নাবিক স্ট্যাভোরিনাস লিখেছেন 'একজন কুলি বা শ্রমিক জমি চাষ করে যেমন তার পূর্ব পুরুষরা করত। একজন বেহারা বা পাল্কি বাহকের সন্তান তার সারা জীবন পালকিই বহন করে'।[২১] এ মন্তব্য অবশ্য সর্বাংশে সত্য নয়। এ যুগের মুসলমান সমাজে বৃত্তির পরিবর্তন বা পেশাগত গতিশীলতা একেবারে অজানা নয়। কৃষক অবসর সময়ে তাঁত চালাত, ধুনিয়া বয়নে অংশ নিত। কিছুটা আর্থিক সঙ্গতি আসার পর জোলা বা তাঁতি দোকান দিত। মুসলমান সমাজে একেবারে নীচের তলায় চামার, বেদে, বাজীকর প্রভৃতি সামাজিক গোষ্ঠী। এরা নামমাত্র মুসলমান সমাজের অন্তর্ভুক্ত ছিল। ধর্মের বা সমাজের সঙ্গে এদের যোগাযোগ ছিল খুবই ক্ষীণ।

মুসলমান সমাজে বর্ণ বা শ্রেণী স্বীকৃত হত না ঠিকই কিন্তু বাস্তবে আশরাফ, আতরাফ ও আরজলদের মধ্যে ব্যবধান ছিল। সামাজিক মেলা-মেশা, খাওয়া দাওয়া ও বিবাহ ব্যাপারে এ পার্থক্য ধরা পড়ত। এককথায় আশরাফ, আতরাফ এবং আরজলরা তিনটি স্বতন্ত্র শ্রেণী হিসাবে বাস করত। এই তিন শ্রেণীর

২১। স্ট্যাভোরিনাস, 'ভয়েজেস', প্রথম খণ্ড, পৃঃ ৪১১।

মধ্যে পারস্পরিক সম্পর্ক ছিল প্রভু-ভৃত্যের বা দেনা-পাওনার। তাই প্রকৃত মানবিক বা সহজ সামাজিক সম্পর্ক এদের মধ্যে গড়ে উঠতে পারেনি। হিন্দুদের মত মুসলমান সমাজেও একটি পুরোহিত বা যাজক শ্রেণী গড়ে উঠেছিল। মোল্লা ও মৌলভিরা ছিলেন পারিবারিক ও সামাজিক জীবনে অপরিহার্য। এঁরা হাজাম, পশুপাখি জবাই এবং বিবাহ অনুষ্ঠান সম্পন্ন করতেন। এঁরা গ্রাম বাংলার মুসলমান সমাজে ডাক্তারি করতেন। ঝাঁড় ফুঁক করা, মাদুলি দিয়ে শয়তান তাড়ানো প্রভৃতি কাজগুলি এদের একচেটিয়া ছিল। সুফী, দরবেশ ও ফকিররা বাংলার মুসলমান সমাজের নৈতিক ও মানসিক উন্নতিতে সাহায্য.করতেন। এঁরা ইসলাম ধর্মের মূল আদর্শ ও অনুশাসনগুলি সাধারণ মুসলমানদের মধ্যে প্রচার করতেন। এজন্য এঁদের ভ্রাম্যমান শিক্ষক বললেও অত্যুক্তি হয় না। এঁদের মাধ্যমে রাস্ট্র ও ধনী মুসলমানরা তাদের দান খয়রাত গরীব ও দুঃখীদের কাছে পৌঁছে দিত। দুর্যোগে, দুর্দিনে ও রাষ্ট্রবিপ্লবে এঁরা গরীবদের মধ্যে খাদ্য বিতরণ করতেন, আর্ত ও অসুস্থদের চিকিৎসা ও সেবা এঁদের হাতে থাকত। বাংলার হিন্দুরাও এই সুফী, দরবেশ ও ফকিরদেব শ্রদ্ধা করত। এঁরা হলেন এ সময়কার হিন্দু ও মুসলমান সম্প্রদারের মধ্যে মিলনের সেতু।

সমকালীন ব্যক্তিদের লেখা থেকে জানা যায় বাংলার মুসলমানরা ধর্মীয় মতে দুভাগে বিভক্ত—শিয়া ও সুন্নী। গোলাম হোসেন লিখেছেন ভারতের মুসলমানদের ছয় ভাগের পাঁচ ভাগ সুন্নী ও এক ভাগ শিয়া।[২২] মুর্শিদকুলী ছাড়া বাংলার এ যুগের নবাবদের সকলেই শিয়া মতাবলম্বী। শিয়ারা পয়গম্বর হজরত মোহাম্মদের বংশধরদের আয়ের পঞ্চমাংশ 'খোম' (qhoms) হিসাবে দান করা অবশ্য পালনীয় ধর্মীয় কর্তব্য বলে মনে করেন। সুন্নীরা মনে করেন ধর্মীয় অনুশাসনে তাঁদের আয়ের এক দশমাংশ গরীবদের 'যাকাত' হিসাবে দিতে তারা বাধ্য। সুন্নীদের কাছে বড় উৎসব দুটি ঈদ্। শিয়াদের কাছে বড় উৎসব মহরম। এগুলি ছাড়াও সামাজিক উৎসব, প্রার্থনা ও অন্যান্য ব্যাপারে এদের মধ্যে পার্থক্য দেখা যায়। সংখ্যালঘু শিয়ারা শাসনক্ষমতায় অধিষ্ঠিত থাকাতে এ যুগে শিয়া সুন্নী বিরোধ দেখা যায় না।

বাংলাদেশে প্রাচীনকাল থেকেই দাসপ্রথা ছিল। অবশ্য এর প্রকৃতি তেমন নিষ্ঠুর বা উগ্র ছিল না।[২৩] হাণ্টার সাহেবের মতে বাংলার দাসপ্রথা হল নথি-বদ্ধ দাসপ্রথা (bonded labour)। গ্রীস বা রোমের ক্রীতদাস ব্যবস্থার সঙ্গে

২২। গোলাম হোসেন, 'সিয়ার,' দ্বিতীয় খন্ড, পৃঃ ৪৩৩।

২৩। হাণ্টার, ঐ, প্রথম খন্ড, পৃঃ ২৩২-২৩৩।

বাংলার দাস প্রথার তুলনা করলে ভুল হবে। উৎপাদন ব্যবস্থার সঙ্গে যুক্ত ঐ ব্যবস্থায় দাসদের মানুষ বলে গণ্য করা হত না। খোঁয়াড়ে দলবদ্ধভাবে পশুর মত (chatel slavery) ওদের রাখা হত। ওরা প্রভুর অস্থাবর সম্পত্তি হিসাবে বিবেচিত হত। আমেরিকার ক্রীতদাসদের অবস্থাও অনেকটা এরকম। বাংলার দাসরা বেশিরভাগই গৃহভৃত্য, দারোয়ান, মালী, বেহারা প্রভৃতি কাজে নিযুক্ত হত। দাসীদের বেশির ভাগ গৃহকর্মে যোগ দিত। এদের একাংশ অবশ্যই উৎপাদনের সঙ্গে যুক্ত হত। কলকাতা, চন্দননগর ও চুঁচুড়াতে—ইংরাজ, ফরাসি ও ওলন্দাজরা—প্রচুর পরিমাণে ক্রীতদাস রাখত। বাংলার প্রভাবশালী বড় জমিদাররা অনেক দাসদাসী রাখত। গ্রীস, রোম ও আমেরিকার ক্রীতদাসদের সঙ্গে বাংলার দাসদের একটি মৌলিক পার্থক্য আছে। ওরা দলবদ্ধভাবে পশুর মত বাস করত। ওদের বিয়ে করা, সন্তান পালন করা ও স্বাধীনভাবে ঘোরাফেরার অধিকার ছিল না। বাংলার দাসরা এ অধিকারগুলি ভোগ করত বলে জানা যায়। আর একটি প্রধান পার্থক্য হল বাংলার দাসরা বংশপরম্পরায় দাসত্বে আবদ্ধ থাকত না। চুক্তিমত টাকা মিটিয়ে তারা অনেক সময় স্বাধীনতা ফিরে পেত। ইউরোপ আমেরিকার ক্রীতদাসদের বেলায় এরকম কোনো ব্যবস্থা ছিল না। ওরা বংশপরম্পরায় ক্রীতদাসের জীবন যাপন করত। এ যুগে খ্রীষ্টান বণিকগণ অতি বিস্তৃতরূপে দাস ব্যবসায় চালাতেন। আমাদের দেশের গরীব হিন্দু ও মুসলমান পিতামাতা গরুবাছুর তৈজসপত্র বেচার মত শিশু ও কিশোর বয়স্ক পুত্রকন্যা বিক্রি করত। দুঃসময়ে অনেকে নিজেকে বিক্রি করত। আর্থিক দারিদ্রের কশাঘাতে অনেকে স্ত্রী ও সন্তান-সন্ততি বিক্রি করত বলে জানা যায়। চন্দননগর, হুগলী, চুঁচুড়া, শ্রীরামপুর ও কলকাতার ক্রীতদাসদের বড় আড়ত ছিল। এদের ক্রয় বিক্রয়ের জন্য বড় হাট বা বাজার বসত। কলকাতায় ক্রীতদাসদের বাজার থেকে ঈস্ট ইণ্ডিয়া কোম্পানীর বেশ কিছু টাকা আয় হত।[২৪] পর্তুগীজ ও মগদস্যুরা কলকাতার বাজারে অনেক ক্রীতদাস সরবরাহ করত। রামপ্রসাদের সাক্ষ্যে জানা যায় এ দেশীয় দাস ছাড়াও বাংলার ধনী ব্যক্তিরা আবিসিনীয় ভৃত্য নিয়োগ করত।[২৫] ভৃত্য ও দাস রাখা তৎকালীন বাংলার ধনী ও অভিজাতদের সামাজিক মর্যাদার অঙ্গ হয়ে দাঁড়িয়েছিল। অনেকে প্রয়োজনাতিরিক্ত দাস রাখত। এটা ইউরোপীয়দের মধ্যে আরো ব্যাপক ছিল। ইউরোপীয় ও এ্যাংলোইণ্ডিয়ানরা

২৪। বেঙ্গল পাবলিক কনসালটেশন, ৯ই অক্টোবর, ১৭৫২।
২৫। রাম প্রসাদ সেন 'গ্রন্থাবলী', পৃঃ ৬।

এদেশীয় ক্রীতদাসদের সঙ্গে ভাল ব্যবহার করত না বলে সমকালীন ব্যক্তিদের সাক্ষ্য আছে। বরং বাঙালীরা ক্রীতদাসদের সঙ্গে অপেক্ষাকৃত ভাল ব্যবহার করত। এ যুগে পশ্চিম ও দক্ষিণ পূর্ব এশিয়া ও আফ্রিকার পূর্ব উপকূলে বিভিন্ন ইউরোপীর উপনিবেশে বাংলার ক্রীতদাস চালান যেত। বাংলার দাসদের বেশ কদর ও চাহিদা ছিল বলে জানা যায়। এরা শান্ত, পরিশ্রমী ও বিশ্বাসী বলে কদর পেত।[২৬]

এ যুগের বাংলার শ্রমজীবী মানুষের সংখ্যা বিশাল। বাংলার শ্রমিকদের চারভাগে ভাগ করা যায়—কৃষি শ্রমিক, শিল্প শ্রমিক, বাণিজ্যের সঙ্গে যুক্ত শ্রমিক ও গৃহভৃত্য। বাংলার কৃষকদের একাংশের জমি ছিল না। এরা ভূমিহীন কৃষক। এরা অপরের জমিতে শ্রমিক হিসাবে কাজ করত। দৈনিক মজুরি বা পারিশ্রমিক এদের জীবিকা অর্জনের উপায় হত। এই ভূমিহীন কৃষি শ্রমিকরা আবার অবসর সময়ে শিল্প শ্রমিক হিসাবে কাজ করত। বাংলার লবণ শিল্পের সঙ্গে যুক্ত মালঙ্গিরা বর্ষাকালে চাযের কাজে যোগ দিত। এরা ছাড়াও বাংলার শ্রমিকদের একটি বিশাল গোষ্ঠী শিল্পের সঙ্গে ঘনিষ্ঠভাবে যুক্ত ছিল। বাংলার বিশাল সুতো ও বস্ত্র বয়ন শিল্প, সিল্ক (সুতো ও কাপড়), লবণ, চিনি, চট ও কাগজ শিল্পে বাংলার শ্রমিকদের একটা বড় অংশ কাজ পেত। এ যুগে বাংলার অভ্যন্তরীণ, আন্তঃ-প্রাদেশিক ও আন্তর্জাতিক বাণিজ্যের অবস্থা বেশ ভাল। বাণিজ্যিক পণ্য আদান-প্রদান, গুদামজাত করা, নৌকা, জাহাজ বা গাড়িতে ওঠানো প্রভৃতি কাজে প্রচুর কুলী বা মজুর দরকার হত। বহু মাঝি মাল্লারও দরকার পড়ত বাণিজ্যিক কাজকর্মে। অভ্যন্তরীণ ও আন্তঃপ্রাদেশিক নৌ পরিবহনে বহু শ্রমিকের প্রয়োজন হত। এদের সংখ্যা দুই থেকে তিন লক্ষ। সব মিলিয়ে ব্যবসায়-বাণিজ্যে শ্রমিকের চাহিদা বেড়েই চলেছিল এযুগে। এছাড়া বহুসংখ্যক লোক গৃহভৃত্য হিসাবে কাজ পেত। বিদেশীদের আবার বেশি চাকর-বাকর দরকার হত। দোভাষী, সহকারী, ভৃত্য, ছাতাধারী, পাল্কি বাহক, দারোয়ান, খানসামা, চোপদার, বাবুর্চি, কোচম্যান, ঘাসুড়ে, নার্স প্রভৃতি বিভিন্ন শ্রেণীর ভৃত্য ও পরিচারকের উল্লেখ আছে কোম্পানীর কাগজ পত্রে। বাঙালী অভিজাত পরিবারে, জমিদার বাড়িতে নানান ধরণের লোকের এবং দাসদাসীর প্রয়োজন হত। পঞ্চাশের দশকের শেষদিকে বাংলাদেশে শ্রমিকের চাহিদা বেশ বেড়ে যায়।

২৬। এইচ. এম. এস. হারউইচের সাক্ষ্য। সুধীর কুমার মিত্র, 'হুগলী জেলার ইতিহাস ও বঙ্গ সমাজ', প্রথম খণ্ড, পৃঃ ২৮৩। বেঙ্গল পাস্ট এণ্ড প্রেজেন্ট, এপ্রিল-জুন, ১৯৩৩।

কলকাতায় নতুন ফোর্ট উইলিয়ম দুর্গ নির্মাণ শুরু হয় (১৭৫৭—১৭৬০), পলাশীতে ক্ষমতালাভের পর ইংরাজ সেনাবাহিনীতে বহু এদেশী লোক নেওয়া হতে থাকে এবং ব্যবসা বাণিজ্য অনেকখানি বেড়ে যাওয়াতে প্রচুর শ্রমিকের চাহিদা সৃষ্টি হয়।

এ যুগে বাংলার দুই প্রধান সম্প্রদায়ের মধ্যে পারস্পরিক সম্পর্ক কেমন ছিল নিশ্চিত করে বলা কঠিন। সাক্ষ্য প্রমাণের অভাবে সঠিক সিদ্ধান্তে আসা সহজ নয়। তবে সমসাময়িক গোলাম হোসেন হিন্দু ও মুসলমানের মধ্যে পারস্পরিক সম্পর্ক সম্বন্ধে একটি গুরুত্বপূর্ণ মন্তব্য করেছেন। প্রয়োজনবোধে সবটাই তুলে দিলাম। 'হিন্দুরা সমস্ত মানবজাতি থেকে স্বতন্ত্র ; তারা এমন ধর্ম, শাস্ত্র ও রীতি-নীতি পালন করে যে তাদের চোখে মুসলমানরা বিদেশী ও অপবিত্র। যদিও তারা অদ্ভুত সব ধারণা পোষণ করে ও আচরণ করে যাতে রীতিনীতি ও কাজকর্মে পার্থক্য সূচিত হয় তবুও কালের যাত্রাপথে একে অপরকে কাছে টানলো ; যে মুহূর্তে ভয় ও পরিহার করার মনোভাব কেটে গেল আমরা দেখলাম বৈসাদৃশ্য ও বিচ্ছিন্নতা শেষ হল বন্ধুত্বে ও ঐক্যে। দুটি জাতি এক জাতিতে পরিণত হল। প্রবল ঝাঁকানিতে দুধ ও চিনির মত মিশে গেল। এককথায়, আমরা দেখেছি একে আন্তরিকভাবে অন্যের মঙ্গল সাধন করছে, একই ধরণের চিন্তা পোষণ করছে, একই পরিবারের সন্তান হিসাবে একে অন্যের কথা ভাবছে—একই মায়ের সন্তান হিসাবে ভায়ের মত বাস করছে।'[২৭] এর মধ্যে হয়তো অতিরঞ্জন আছে। তবে একথা ঠিক হিন্দু ও মুসলমান সমাজ এ যুগে শান্তিতে বাস করেছে। বিরোধ ও অশান্তির নজির অতি বিরল। বিদেশী বণিকদের সাক্ষ্য, কোম্পানীর নথিপত্র বা সমকালীন বাংলা সাহিত্যে গোলাম হোসেনের মন্তব্য বিরোধী মত খুঁজে পাওয়া দুষ্কর।

২৭। গোলাম হোসেন 'সিয়ার', তৃতীয় খন্ড, পৃঃ ১৮৮-১৮৯ (অনুবাদ গ্রন্থকারের)।

তৃতীয় অধ্যায়

কৃষি ও শিল্প

সুজন রায় ভাণ্ডারী তাঁর খুলাসাৎ-উৎ-তাওয়ারিখ গ্রন্থে বাংলার বিশাল সমতল-ভূমির কথা বলেছেন।[১] এ সমতলভূমি চট্টগ্রাম থেকে রাজমহলের তেলিয়াগাড়ি পর্যন্ত চার'শ ক্রোশ লম্বা ; উত্তরের পর্বতপুঞ্জ থেকে হুগলী জেলার মান্দারণ পর্যন্ত দু'শ ক্রোশ চওড়া। সমসাময়িক রায় ছত্রমন তাঁর 'চাহার গুলশানে' বাংলার জরীপ করা জমির পরিমাণ দিয়েছেন ৩,৩৪,৭৭৫ বিঘা।[২] লণ্ডন থেকে প্রকাশিত ১৭৫৮ খ্রীষ্টাব্দের 'এ্যানুয়াল রেজিস্টারে' বাংলাকে উর্বর ও শস্যশালী বলে বর্ণনা করা হয়েছে। প্রায় সমসাময়িক রবার্ট ওরমে এবং আলেকজাণ্ডার ডাও বাংলার কৃষি, কৃষিজমি এবং উৎপন্ন ফসলের কিছু কিছু বর্ণনা রেখে গেছেন।[৩] ওরমে বলেছেন 'পলিমাটি দিয়ে গড়া বাংলার সমতলভূমি উর্বর ও ঐশ্বর্যশালী। এই সমতলভূমি গঙ্গা ও তার শাখা-প্রশাখা এবং পাহাড় থেকে নেমে আসা অসংখ্য নদীর জলধারাপুষ্ট। মে থেকে আগস্ট এই তিনমাসের প্রবল বর্ষণে বাংলার মাটি উর্বর হয় এবং এদেশের মানুষ অল্প আয়াসে শস্য পায়। এত অল্প আয়াসে পৃথিবীর আর কোনো অঞ্চলে শস্য ফলে না। বাংলার সবচেয়ে বড় ফসল ধান। নিম্নবঙ্গে ধান এত প্রচুর পরিমাণে জন্মে যে ফসল ওঠানোর সময় ক্ষেতে মাত্র এক ফারদিঙে দু পাউণ্ড ধান পাওয়া যায়। আরো অনেক প্রকারের শস্য, অনেক ফল ও সব্জি, খাদ্যের প্রয়োজনীয় অনেক মশলা বাঙালীরা অল্পায়াসে উৎপন্ন করে। আখ চাষের জন্য কিঞ্চিৎ বেশি পরিশ্রম ও যত্নের প্রয়োজন। বাংলার সর্বত্র আখের চাষ হয়। তাদের গরু মোষ একটু নিম্ন মানের এবং কম দুধ দেয়। কিন্তু তাদের সংখ্যা এত বেশি যে গুণগত মানের ঘাটতি পুষিয়ে দেয়। বাংলার নদী ও পুকুরগুলিতে প্রচুর মাছ পাওয়া যায়। যারা মাছ খায় তাঁরা সহজেই তা যোগাড় করতে পারে। সমুদ্রোপকূলে

১। সুজন রায় ভাণ্ডারী, 'খুলাসাৎ-উৎ-তাওয়ারিখ' (যদুনাথ সরকারের অনুবাদ), দি ইণ্ডিয়া অব আরঙ্গজেব, পৃঃ ৫৪।

২। রায় ছত্রমন, 'চাহার গুলশান,' ঐ, পৃঃ ৫৪।

৩। রবার্ট ওরমে, 'এ হিস্ট্রি অব দি মিলিটারি ট্রানসাকসন অব দি বিট্রিশ নেশন ইন হিন্দুস্তান', দ্বিতীয় খণ্ড, পৃঃ ৩·৪। আলেকজাণ্ডার ডাও, 'হিন্দুস্তান,' প্রথম খণ্ড, পৃঃ ১৩৬।

দ্বীপগুলিতে প্রচুর লবণ তৈরি হয়। সুতরাং স্বৈরাচারী সরকার থাকা সত্ত্বেও এ অঞ্চল জনবহুল। চাষাবাদ থেকে অবসর সময়ে কৃষকরা তাঁত বোনে এবং সিল্ক ও সূতীবস্ত্র উৎপাদন করে। বাংলায় বিভিন্ন ধরণের এত বস্ত্র উৎপন্ন হয় যে এর চেয়ে আয়তনে তিনগুণ বড় অন্য কোনো ভারতীয় অঞ্চলে তা হয় না। এই বস্ত্র ও কাঁচা রেশমের একটা বড় অংশ ইউরোপে চালান যায়। এছাড়া ভারতের অন্যান্য অঞ্চলে এবং ভারতের বাইরে অন্যান্য দেশে এগুলি রপ্তানি করা হয়। বস্ত্র ও কাঁচা রেশমের সঙ্গে থাকে চাল, চিনি, সুপারি, আদা, লম্বা লংকা, হলুদ, অন্যান্য ভেষজ সামগ্রী এবং কৃষিজাত পণ্য।'

কৃষি যে কোন দেশের একটি জাতীয় সম্পদ। বাংলার ক্ষেত্রে একথা আরো বেশিকরে সত্য। গঙ্গা ও পদ্মার পলিমাটি দিয়ে গড়া বাংলার বিশাল সমতল ভূমি কৃষি কাজের অতি উপযোগী প্রাকৃতিক পরিবেশ। তার সঙ্গে ছিল মে থেকে আগস্ট মাস পর্যন্ত নিয়মিত বর্ষা। আলেকজাণ্ডার ডাও লিখেছেন ঃ 'প্রকৃতি যেন বাংলাকে নিজহাতে কৃষি ও কৃষিকাজের জন্য প্রস্তুত করেছেন। কৃষির উপযোগী সবকিছু বাংলায় আছে।'[৪] বাংলার কৃষিজাত পণ্যের মধ্যে ধান প্রধান। 'খুলাসাৎ' রচয়িতা বাংলার ধান চাষ সম্পর্কে যে মন্তব্য করেছেন তা বিশেষ প্রাণিধানযোগ্য। তিনি লিখেছেন বাংলায় বহু জাতের ধান উৎপন্ন হয়। প্রতিটি জাতের একটি করে শস্যকণা যদি একটি ভাণ্ডে রাখা হয় তাহলে ভাণ্ডটি পূর্ণ হয়ে যায়।[৫] অর্থাৎ এযুগে বাংলাদেশে বহুপ্রকার ধানের চাষ হত। ধান চাষে এরকম বৈচিত্র্য অন্য কোথাও দেখা যেত না বলে গ্রন্থকার এ তথ্যটি লিপিবদ্ধ করেছেন। বাংলার এ যুগের কৃষি সম্বন্ধে তিনি আমাদের আরো একটি অজ্ঞানা তথ্য সরবরাহ করেছেন। অষ্টাদশ শতাব্দীর প্রারম্ভে বাংলার কোন কোন অঞ্চলে চাষ জমিতে বছরে তিনটি ফসল হত। এ সময়কার বাংলায় ভালরকমের গমের চাষ হত বলে জানা যায়। ওলন্দাজ নাবিক স্ট্যাভোরিনাস জানিয়েছেন 'ধান ছাড়া বাংলায় ভাল গমের চাষ হত। আগে [তাঁর সময়ের আগে, আমাদের আলোচ্য সময়ে (১৭০০-১৭৫৭)] এই গম ওলন্দাজদের উপনিবেশ বাটাভিয়াতে[৬] চালান যেত।'

এ সময়ে বাংলার কৃষি ও কৃষিজাত পণ্য সম্পর্কে বিস্তৃত তথ্য পাওয়া যায়

৪। আলেকজাণ্ডার ডাও, ঐ, প্রথম খণ্ড, পৃঃ ১৩৬।
৫। সুজন রায় ভাণ্ডারী, 'খুলাসাৎ' ; পৃঃ ৪০-৪১।
৬। বাটাভিয়া বর্তমান ইন্দোনেশিয়া।

ঈস্ট ইণ্ডিয়া কোম্পানীর প্রথম সার্ভেয়ার জেম্স্ রেনেলের 'জার্নালে'। এ'জার্নালে' বাংলাদেশের বিভিন্ন জেলার চাষবাসের খবর আছে। রেনেল জানিয়েছেন রঙ্গপুর জেলায় ভাল চাষ হত। এখানে উৎপন্ন কৃষিপণ্যের মধ্যে গম, আখ ও তামাক প্রধান।[৭] রেনেল সাহেব ময়মনসিংহের বাগানবাড়ি ও চিলমারির মধ্যবর্তী ব্রহ্মপুত্রের পশ্চিম তীরের সমতলভূমিতে সর্বত্র ধানের ক্ষেত দেখেছিলেন। বাগান-বাড়ি থেকে মোবাগঞ্জ পর্যন্ত ব্রহ্মপুত্রের দুই তীরে দেখা যেত সারি সারি ধান ক্ষেত; মাঝে মাঝে পান ও সুপারি গাছের ঝোপ। উত্তর বঙ্গের বাহারবন্দ সরকারের সর্বত্র ভাল চাষ হত। কৃষি জমির মাঝে মাঝে সুপারি গাছের বাগান। অনাবাদী জমি একেবারেই দেখা যেত না। ব্রহ্মপুত্রের তীরে আলিয়াপুর থেকে কালিগঞ্জ পর্যন্ত ঐ একই দৃশ্য—সর্বত্র ধান ক্ষেত ও সুপারি বাগান। 'রিয়াজ-উস্-সালাতীন' থেকে আমরা জানতে পারি এ যুগে মাহমুদাবাদ সরকারে[৮] প্রচুর পরিমাণে লংকার চাষ হত। রেনেল সাহেব রঙ্গপুর ও বিহারের পূর্ণিয়া জেলার মধ্যবর্তী অঞ্চলে গম ও আফিমের চাষ দেখেছিলেন। বারাসাত থেকে যশোহর পর্যন্ত উন্মুক্ত প্রান্তরে ভাল চাষ হত। উৎপন্ন ফসলের মধ্যে ধান, কলাই, মুগ, মুসুর, মটর প্রভৃতি প্রধান। কলকাতা থেকে যশোহরের হাজিগঞ্জ পর্যন্ত রাস্তাটি গিয়েছিল ধান ক্ষেতের মধ্য দিয়ে, এ রাস্তার দুপাশে দেখা যেত ধান ক্ষেতের সারি। জলঙ্গীর পাঁচ মাইল দক্ষিণ পূর্বে মহেশপুন্দা নালার আশেপাশে অনেক ধান ও তুলার চাষ ছিল। নদীয়া জেলার গ্রামগুলিতে নানা কৃষিকাজ ও ধানচাষ হত।

গঙ্গা ও পদ্মার উভয় তীরে ভাল কৃষি কাজ হত বলে জানা যায়। পদ্মার ধারে পাবনা জেলাতে প্রচুর পান ও সুপারির ফলন হত। এই জেলার সোনাপাড়া, বাণদোর্শী ও গোপালপুর অঞ্চলে প্রচুর সুপারির চাষ হত। এ সময়ে আত্রেয়ী নদীর উভয় তীরে যে চাষ ছিল তাতে প্রচুর পরিমাণে ধান ও তুলা পাওয়া যেত। ভাল তূলা চাষের জন্য কালো উর্বর মাটি প্রয়োজন হয়। এ রকম কালোমাটি ছিল ঢাকা, রাজশাহী ও উত্তর বঙ্গের অন্যান্য অঞ্চলে। টেলর সাহেবের সাক্ষ্য অনুযায়ী বলা যেতে পারে এ অঞ্চলে ভাল জাতের তূলা জন্মাত। তাঁর মতে বাংলাদেশে ঢাকার তূলা গুণগত মানের দিক দিয়ে সেরা। ঢাকা ও জাফরগঞ্জের

৭। জেম্স্ রেনেল, 'জার্নালস্', পৃঃ ১৩, ১৫, ১৯, ৪৮, ৫৪, ৬৩, ৬৮, ৭৩।

৮। মাহমুদাবাদ সরকার—উত্তর-পূর্ব নদীয়া, উত্তর পূর্ব যশোহর, ও পশ্চিম ফরিদপুর। গোলাম হোসেন সলিম, 'রিয়াজ-উস্-সালাতীন' পৃঃ ৪৩।

মধ্যবর্তী স্থানগুলিতেও তুলার চাষ ছিল। এ চাষে যে তুলা পাওয়া যেত তাতে স্থানীয় প্রয়োজন মিটে যেত।[৯] সমগ্র ঢাকা জেলায় প্রচুর পরিমাণে ধান ও তুলা উৎপন্ন হত। রেনেল সাহেব ফরিদপুর জেলার চাষের যে বিবরণ রেখে গেছেন তাতে দেখা যায় এ জেলায় আখ, তামাক, সুপারি ও পানের চাষই প্রধান। পার্শ্ববর্তী অঞ্চলে ভাল পানের চাষ দেখা যায়। ঢাকার আশপাশের জেলাগুলিতেও ভাল পানের চাষ ছিল। বীরভূমের কতক অঞ্চলে তুলা হত। সিউড়ীর চারপাশে ছিল ধান চাষ। বাঁকুড়া ও বর্ধমানে যে তুলা জন্মাত তাতে স্থানীয় লোকের প্রয়োজন মিটত।[১০] 'রিয়াজের' লেখক জানিয়েছেন যে মালদা জেলার কোন কোন অঞ্চলে এযুগে নীলের চাষ হত।[১১] ফারমিংগারের 'ফিফ্‌থ রিপোর্ট' থেকে বর্ধমানের চাষের খবর পাওয়া যায়।[১২] এখানে নানাপ্রকার রবিশস্য (মুগ, কলাই, ছোলা মটর ইত্যাদি), তুলা, রেশম ও আখের চাষ হত। এক রাজশাহীজেলাতে সারা বাংলার উৎপন্ন রেশমের পাঁচ ভাগের চার ভাগ পাওয়া যেত। কাশিম বাজারের বিপরীত দিকে (গঙ্গার পূর্ব তীরে) লস্কর পুরে কাঁচা রেশম সংগ্রহের একটি বড় কেন্দ্র ছিল।

সমসাময়িক বাংলা সাহিত্যে রবিশস্যের মধ্যে মাসকলাই, মুগ, ছোলা, অড়হর মুসুরি, বরবটী, মটর, মাড়ুয়া, ভুরা, যব ও খেসারির উল্লেখ পাওয়া যায়। গঙ্গারামের 'মহারাষ্ট্রপুরাণে' এবং ভারতচন্দ্রের 'অন্নদামঙ্গলে' এযুগের খাদ্যশস্য ও রবিশস্যের পূর্ণাংগ বিবরণ আছে। ভারতচন্দ্র 'অন্নদামঙ্গলে' 'দিল্লীতে উৎপাত' বর্ণনাকালে এ যুগের বাংলার সমস্তরকম উৎপন্ন শস্যের পরিচয় দিয়ে গেছেন ঃ

ধান চাল মাষ মুগ ছোলা অরহর।
মসুরাদি বরবটী বাটুলা মটর ॥
দে ধান মাড়য়া কোদা চিনা ভুরা খর।
জনার প্রভৃতি গম আদি আর সব ॥[১৩]

গঙ্গারাম 'চাউল কলাই মটর মষুরি খেসারি'র কথা জানিয়েছেন। সমকালীন সাহিত্যে চাষের প্রয়োজনীয় যন্ত্রপাতির বর্ণনা আছে। রামেশ্বরের 'শিবায়ণ' কাব্যে

৯। জে. রেনেল, 'জার্নাল্‌স্'. পৃঃ ২৭-২৮, ৮২।
১০। জে. জেড. হলওয়েল. 'ইণ্টারেস্টিং হিস্টোরিকাল ইভেণ্টস্', প্রথম খণ্ড, পৃঃ ১৯৬-২০০
১১। 'রিয়াজ', পৃঃ ৪৬।
১২। ফারমিংগার. 'ফিফ্‌থ্ রিপোর্ট',' দ্বিতীয় খণ্ড, পৃঃ ১৭৭ এবং ১৯৪-২০৪।
১৩। গঙ্গারাম, 'মহারাষ্ট্র পুরাণ' পৃঃ ১৮। ভারতচন্দ্র 'অন্নদামঙ্গল', মানসিংহ, পৃঃ ১১।

মাঠের চাষ, শস্য লালন ও ঝাড়াইয়ের নিখুঁত বর্ণনা পাওয়া যায়।[১৪] রামেশ্বর ভট্টাচার্য্য তৎকালে ব্যবহৃত চাষবাসের যন্ত্রগুলির বর্ণনা রেখে গেছেন। এগুলির নাম 'চাষাস্ত্র'। আমাদের সময়কার 'চাষাস্ত্রে'র সঙ্গে এগুলির বিশেষ কোন পার্থক্য দেখা যায় না। চাষের জন্য চাষীরা সাধারণত কোদালী, কাস্তে, লাঙ্গল, জোয়াল ফাল, আগাছা দূর করার জন্য বিড়ে এবং জমি সমান করার জন্য মই ব্যবহার করত। বলদ ও মহিষ দুই-ই চাষের জন্য ব্যবহার করা হত। গোবর জমির সারের প্রয়োজন মেটাত।

বাংলাদেশে কৃষিকাজের জন্য কৃত্রিম জলসেচের খুব বেশি প্রয়োজন হত না। সারা বাংলার অসংখ্য নদ-নদী প্রাকৃতিক জলসেচ প্রণালীর কাজ করত। তবে এযুগে জলসেচের একেবারেই কোনো ব্যবস্থা ছিল না তা নয়। বর্ষাকালে জমিতে বাঁধ দিয়ে বর্ষার জল ধরে রাখার ব্যবস্থা ছিল। বীরভূমের মল্লরাজারা বড় বড় বাঁধ দিয়ে জল ধরে রাখার ব্যবস্থা করেছিলেন। এতে দুরকমের কাজ চলত। বড় বড় বাঁধগুলি এই সীমান্ত জেলায় পরিখার কাজ করত। দেশকে বহিঃশত্রুর হাত থেকে বাঁচাত আর অনাবৃষ্টির সময় চাষীদের চাষের জল সরবরাহ করত।[১৫] পারকার সাহেব তাঁর 'দি ওয়ার ইন ইণ্ডিয়া' গ্রন্থে বাঁধ দিয়ে জল ধরে রেখে 'রিজারভার' গড়ার কথা উল্লেখ করেছেন। এ 'রিজারভার' থেকে চাষীরা চাষের জন্য জল পেত; বিনিময়ে রাষ্ট্রকে কর দিত।[১৬] এছাড়া গ্রাম বাংলার অসংখ্য পুকুরে বর্ষাকালে জল ধরে রেখে সেই জলে শীতকালে শস্যের চাষ করা হত। এ ব্যবস্থা বাংলাদেশের প্রায় সর্বত্র দেখা যেত।[১৭]

এ যুগে বাংলার বনজ সম্পদ খুব কম ছিল না। গোলাম হোসেন সলিম জানিয়েছেন বাজুহা সরকারে (রাজসাহী, পাবনা, বগুড়া ও ময়মনসিংহ) বিশাল অরণ্য ছিল।[১৮] এ অরণ্য থেকে প্রচুর পরিমাণে কাঠ পাওয়া যেত। এগুলির বেশিরভাগ বাড়ি ও নৌকা নির্মাণে ব্যবহৃত হত। বীরভূম ও বাঁকুড়ায় অরণ্য ছিল। এগুলি থেকে আসত কাঠ, মধু, লাক্ষা ও মোম। শ্রীহট্টের বন থেকে আসত নানারকম ফল, কমলালেবু ও ওষুধে ব্যবহার করার মত নানারকম চীনা

১৪। রামেশ্বর, 'শিবায়ণ', বসুমতী সং, পৃঃ ৪৪-৪৫।
১৫। এ. পি. মল্লিক, 'হিস্ট্রি অব বিষ্ণুপুর-রাজ', পৃঃ ৯৭।
১৬। পারকার, 'দি ওয়ার ইন ইণ্ডিয়া', পৃঃ ৫-৬।
১৭। স্ট্যাভোরিনাস, ঐ, প্রথম খণ্ড, পৃঃ ৩৯৬।
১৮। 'রিয়াজ', পৃঃ ৪৩।

মূল। এ অরণ্যে প্রচুর পরিমাণে অলি কাঠ (aloe) মিলত। জলপাইগুড়ি জেলার অরণ্য থেকেও প্রচুর কাঠ পাওয়া যেত।[১৯] সুন্দরবন অঞ্চলের প্রধান ফসল হল কাঠ ও আম। আমের ফলন বাংলার সর্বত্র। 'খুলাসাৎ' রচয়িতা বরবকাবাদ (মালদা, রাজশাহী ও বগুড়া) ও শ্রীহট্টে প্রচুর পরিমাণে কমলালেবু উৎপন্ন হত বলে জানিয়েছেন। তিনি এ অঞ্চলের আরো একটি অদ্ভুত ফলের কথা উল্লেখ করেছেন। তিনি এর নাম দিয়েছিলেন 'সাংতাড়া'। তাঁর বর্ণনা থেকে মনে হয় এগুলি সম্ভবত আমাদের দেশের বাতাবিলেবু।

এ যুগে কৃষি উৎপাদনের পদ্ধতি ও পরিমাণে বড় রকমের কোনো পরিবর্তন দেখা যায় না। ভূমি বন্দোবস্তের ক্ষেত্রেও কোনো বড় রকমের পরিবর্তন ঘটেনি। মুর্শিদকুলী খাঁ বাংলার পতিত ও অনাবাদী জমি চাষের আওতায় আনার জন্য চেষ্টা করেছিলেন। তিনি ছোট ছোট কৃষকদের উৎসাহদানের জন্য তাঁর রাজস্ব বিভাগের কর্মচারীদের নির্দেশ দিয়েছিলেন বলে জানা যায়। কৃষকদের হালের গরু ও মহিষ কেনার জন্য তিনি সরকারী ঋণের ব্যবস্থা করে দিয়েছিলেন। দুর্ভিক্ষের সময় বা অনাবৃষ্টির ফলে শস্যের ক্ষতি হলে তিনি কৃষকদের খাজনা মকুব করে দিতেন। আর কৃষিজমি যাতে ভালভাবে চাষ হয় তার জন্য তিনি কৃষকদের কৃষিঋণ (তাকাবি) দেওয়ার নীতিও অনুসরণ করতেন।

মুর্শিদকুলী খাঁ বাংলার জমিদারদের ওপর কড়া নজর রাখতেন। কৃষক বা রায়তের ওপর অত্যাচার হলে কোন জমিদার সহজে নিস্তার পেত না। এজন্য তাঁর সময়ে জমিদাররা সব সময় সন্ত্রস্ত থাকত। জমিদারের ভকিল মুর্শিদাবাদে নবাবের দরবারের আশেপাশে বিক্ষুব্ধ রায়তের খোঁজ করত। এরকম কোনো বিক্ষুব্ধ রায়তের সন্ধান পেলে নবাবের দরবারে অভিযোগ পেশ করার আগেই ভকিল তাকে খুশী করে বিরোধ মিটিয়ে নিত। সুজাউদ্দিন ও আলিবর্দীও বাংলার কৃষকদের রক্ষা করার নীতি অনুসরণ করেছিলেন। তাঁরা কৃষকদের ওপর নজর রাখতেন। মারাঠা আক্রমণের অবসানে আলিবর্দী কৃষির পুনর্গঠনে মন দিয়েছিলেন। বাংলার বিধ্বস্ত গ্রাম ও কৃষি গড়ে তোলা ছিল তাঁর জীবনের শেষ কাজ। সমসাময়িক ব্যক্তিদের লেখা থেকে এ তথ্য জানা যায়। কৃষি বাংলার জাতীয় সম্পদ। কৃষি ও কৃষককে রক্ষা করাকে বাংলার নবাবরা তাঁদের কর্তব্য বলে মনে করতেন। এটা ছিল এ যুগের রাষ্ট্রনীতি।

১৯। জে. রেনেল, 'জার্নালস্', পৃঃ ৬৮।

এ যুগে জমিদারদের সঙ্গে রায়তের সম্পর্কে কোনো বড় পরিবর্তন ঘটেনি। জমিদাররা রায়তের দণ্ডমুণ্ডের কর্তা। রায়তের সঙ্গে জমিদারের সম্পর্ক প্রত্যক্ষ ও ঘনিষ্ঠ; সরকারের সঙ্গে ক্ষীণ ও অপ্রত্যক্ষ। এ সময়কার বাংলায় খাদ্যশস্যের বড় রকমের ঘাটতি দেখা যায় না। ১৭১১ খ্রীষ্টাব্দে একবার খাদ্যাভাব দেখা দিয়েছিল। কয়েক হাজার লোক এ দুর্ভিক্ষে মারা যায় বলে কোম্পানীর কাগজপত্রে উল্লেখ আছে।[২০] মুর্শিদকুলী খাঁ খাদ্যশস্যের রপ্তানি বন্ধ করে এবং গুদামজাত শস্য উদ্ধার করে দক্ষতার সঙ্গে এ সমস্যার মোকাবিলা করেছিলেন। ১৭৩৭ খ্রীষ্টাব্দে বাংলাদেশে ঝড়ের পর এবং পঞ্চাশের দশকের প্রথম দিকে (১৭৫২, ১৭৫৪) বন্যায় খুব অল্পকালের জন্য খাদ্য সরবরাহে টান পড়েছিল। তবে সাময়িক ঘাটতি কখনো গুরুতর রূপ পরিগ্রহ করেনি।

বাংলার কৃষিজাত পণ্য ইউরোপে রপ্তানি হত না। এর কারণ দুটি—কৃষি-পণ্য আকারে বিশাল, জাহাজে জায়গা দখল করে বেশি; সেজন্য কৃষিপণ্যের জাহাজ পরিবহন ভাড়াও বেশি। কৃষিপণ্য সহজে নষ্ট হয়; এজন্য বাংলা থেকে সুদূর ইউরোপে কৃষিপণ্য নিয়ে যাওয়া সহজ হত না। ইউরোপের শিল্পে চাল বা তৈলবীজের ব্যবহার তখনো শুরু হয়নি। এ সময় বাংলার কৃষিজ পণ্য নীল ও পাট রপ্তানি হত না। যেটুকু উৎপন্ন হত অভ্যন্তরীণ প্রয়োজনে লেগে যেত। তবে বাংলা থেকে নানা ধরণের কৃষিপণ্য—চাল, চিনি, ডাল, তৈলবীজ, আফিম, নীল, লংকা প্রভৃতি ভারতের অন্যান্য প্রদেশে এবং পশ্চিম ও দক্ষিণ-পূর্ব এশিয়ার দেশগুলিতে রপ্তানি করা হত।

১৭৬৯ খ্রীষ্টাব্দের ৫ই এপ্রিল বাংলাদেশে ইস্ট ইণ্ডিয়া কোম্পানীর গভর্ণর হ্যারি ভেরেলষ্ট বিলাতে ডিরেক্টর সভাকে লিখছেন: 'বাংলায় যে পণ্য উৎপন্ন হয় তা বৈচিত্র্যে ও প্রাচুর্যে অনন্য। এর গুণগত মানও বেশ উঁচু অথচ দামে সস্তা। এর ফলেই বাংলার সমৃদ্ধি'।[২১] মোহাম্মদ রেজা খাঁ এবং উইলিয়ম বোল্টস্ সাক্ষ্য দিচ্ছেন যে নবাবী আমলে বাংলার 'শিল্পী ও কারিগর তাদের খুশীমত পণ্য উৎপাদন করত এবং নিজেদের পছন্দমত উৎপন্ন পণ্য বিক্রি করত। বাংলার সরকার তাদের স্বাধীনতায় হস্তক্ষেপ করত না'।[২২]

২০। ডায়েরি এণ্ড কন্সালটেশন বুক, ৯ই জুলাই, ১৭১১।

২১। এন. কে. সিংহ সম্পাঃ, 'ফোর্ট উইলিয়ম—ইণ্ডিয়া হাউস করেসপণ্ডেন্স', পঞ্চম খণ্ড, পৃঃ ৫৪৫-৫৫৩।

২২। রেজা খাঁর নোট, মজিদ খানের 'দি ট্রানজিশন ইন বেঙ্গলে' উদ্ধৃত, পৃঃ ১৪। উইলিয়ম বোল্টস্, 'কনসিডারেশনস্ অন ইণ্ডিয়ান এ্যাফেয়ার্স', পৃঃ ১৯৪।

অর্থাৎ আভ্যন্তরীণ শিল্প উৎপাদনের ক্ষেত্রে ও বাজারে স্বাধীনতা ছিল। শিল্পী ও কারিগর স্বাধীনভাবে উৎপাদন করত এবং উৎপন্ন পণ্যগুলি স্বাধীনভাবে বিক্রিও করতে পারত। প্রাক্-পলাশী যুগে বাংলার নবাবরা শিল্পোৎপাদনে এবং আভ্যন্তরীণ বাজারে এ স্বাধীনতা বজায় রাখতে পেরেছিলেন।

বাংলার এ সময়কার শিল্পোৎপাদনে তিন ধরণের ব্যবস্থা চালু ছিল। হস্ত-শিল্পী নিজের মূলধনে স্বাধীনভাবে পণ্য উৎপাদন করত এবং নিজের পছন্দমত দামে বাজারে বিক্রি করত। এ ব্যবস্থাকে অর্থনীতিবিদ্‌রা হস্তশিল্প ব্যবস্থায় (handicraft system of production) উৎপাদন বলে অভিহিত করেছেন। দ্বিতীয় ব্যবস্থাটি হল কুটীর শিল্প উৎপাদন (domestic system of production)। এ ব্যবস্থায় কারিগর বণিক, মহাজন বা দালালদের কাছ থেকে মূলধন আগাম নিত এবং নির্দ্দিষ্ট দামে এবং নির্দ্দিষ্ট সময়ে পণ্য যোগান দিত। এ ব্যবস্থা দাদ্‌নি (dadni system) ব্যবস্থা নামেও পরিচিত। তৃতীয়টি হল ইউরোপীয় বা এদেশীয় বণিক বা মহাজনদের বাড়িতে বা ফ্যাক্টরিতে দলবদ্ধভাবে পণ্যোৎপাদন করা (factory system of production)। এ ব্যবস্থায় মূলধন, কাঁচামাল এবং উৎপাদনের সাজ-সরঞ্জাম বণিক, মহাজন বা ফ্যাক্টরি মালিক সরবরাহ করত। এ ব্যবস্থায় উৎপাদকের স্বাধীনতা ক্ষুণ্ণ হত এবং পারিশ্রমিকও কম পেত।

প্রাক্-পলাশী যুগে বাংলার শিল্পে সম্মানের স্থানটি নিঃসন্দেহে বয়ন-শিল্পের। বয়নশিল্পের তিনটি বিভাগ—সূতীবস্ত্র, রেশম বস্ত্র এবং চট। বয়নশিল্পের এই তিন বিভাগের মধ্যে আবার সূক্ষ্ম ও মোটা বস্ত্র উৎপাদন প্রাধান্য পেয়েছিল। এ ছাড়া নানা ধরণের রেশম বস্ত্র ও রুমাল, চটের কাপড়, নানাপ্রকারের গালিচা, শতরঞ্চি, মাদুর, শীতলপাটি বাংলাদেশে বয়ন করা হত। অবশ্য বস্ত্র শিল্পই এ যুগে বাংলার শিল্প ক্ষেত্রে প্রাধান স্থানাধিকারী। এর উৎপাদনের পরিমাণ বিশাল যদিও মূলত এটি একটি কুটীর শিল্প। এ যুগে বাংলার অর্থনীতিতে বয়ন শিল্পের প্রভাবও অসামান্য। বাংলা যে পরিমাণ বস্ত্র উৎপাদন করত, তাতে তার বিশাল জনগণের প্রয়োজন মিটিয়েও প্রচুর উদ্বৃত্ত হত। উদ্বৃত্ত বস্ত্রের সমস্তটাই বিদেশে রপ্তানি করা হত। বিদেশে বাংলা বস্ত্রের চাহিদা বস্ত্র শিল্পের অসাধারণ উন্নতির কারণ। রবার্ট ওরমে লিখেছেন 'বাংলার প্রতিটি গ্রামের পুরুষ, নারী ও শিশুরা বস্ত্র বয়নে নিযুক্ত থাকত।' এ

যুগের পর্যটকদের বিবরণে দেখা যায় শহর ছেড়ে গ্রামের দিকে পা বাড়ালেই চোখে পড়ত গ্রামের লোক—পুরুষ, নারী, শিশু নির্বিশেষে—সূতা কাটা বা বয়নে নিযুক্ত। তবে এযুগে বাংলার তাঁতীদের আর্থিক স্বাচ্ছন্দ্য তেমন ছিল না। বরং বলা যায় ওরা ছিল বেশ গরীব। ওরমেও এরকম অভিমত ব্যক্ত করেছেন। মহাজন, দালাল ও রাজকর্মচারীদের দ্বারা ওরা নিগৃহীত ও শোষিত হত।

বাংলা সমস্ত ধরণের বস্ত্র উৎপাদন করত—মোটা সূতীবস্ত্র থেকে সূক্ষ্ম মস্‌লিন ও রেশম বস্ত্র। এশিয়া ও ইউরোপে বাংলা বস্ত্রের চাহিদাও ছিল ক্রমবর্ধমান। এর কারণ হল বাংলার বস্ত্র গুণে উন্নত আর দামে সস্তা। পাত্তুলো মন্তব্য করেছেন বস্ত্রশিল্পে 'পৃথিবীর আর কোনো দেশ বাংলার সমকক্ষ হতে পারবে না বা প্রতিদ্বন্দ্বিতায় বাংলাকে হারাতে পারবে না।'[২৩] এ যুগে সারা দেশ জোড়া ছিল এই বয়ন শিল্প। এক এক জেলায় এক বিশেষ ধরণের বস্ত্র উৎপন্ন হত। নাটোরের জমিদারির মধ্যে মালদা, হরিয়াল, শেরপুর, বালিকুশি ও কগমারিতে তাঁতীরা বিভিন্ন উন্নত ধরণের বস্ত্র উৎপাদনে নিয়োজিত ছিল। ইউরোপীয় বাজারের জন্য এখান থেকে পাওয়া যেত খাসা, এলাচি, হামাম, চৌতা, উতালি, সুসিজ ও শিরসুচীর শ্রেণীর সূক্ষ্মবস্ত্র। বসরা (ইরাক), মোখা (ইয়েমেন), জেদ্দা (আরব), পেগু (বর্মা), অচিন (সুমাত্রা) এবং মালক্কার (মালয়েশিয়া) জন্য এখান থেকে সংগৃহীত হত কোসা, বাফ্‌তা, সনুজ, মলমল,, তাঞ্জীব ও কেণ্ডিস প্রভৃতি জাতের উন্নত বস্ত্র।[২৪] ঘোড়াঘাট ও রঙ্গপুরের আড়ঙ্‌গুলি সূক্ষ্ম সূতীবস্ত্র 'সন্তোষ বুদাল' সরবরাহ করত। ইস্ট ইণ্ডিয়া কোম্পানী এ অঞ্চল থেকে সানোস, মলমল ও তাঞ্জীব সংগ্রহ করত। বর্ধমানের রাজার অধীনে খিরপাই, রাধানগর ও দেওয়ানগঞ্জ প্রভৃতি স্থান বস্ত্র শিল্পের কেন্দ্র ছিল। এ অঞ্চলে তৈরি হত বিভিন্ন ধরণের সূতীবস্ত্র। এগুলির মধ্যে বিশেষ করে উল্লেখযোগ্য হল দুরিয়া, তেরেন্দাম, কুট্টানি, সুসি, সূতী রুমাল, গুরা, সেস্টারময়িস, সাণ্টন কুপিস, চুড়িদারি, কুষ্টা ও দুসূতা। এ জেলার অপেক্ষাকৃত কমনামী অনেকগুলি জায়গায় নীচুমানের অনেক মোটা বস্ত্র উৎপন্ন হত। এগুলি শিরবান্দ, গুলাবান্দ প্রভৃতি নামে পরিচিত। ইংরাজ ইস্ট ইণ্ডিয়া কোম্পানী বাঁকুড়া ও বীরভূমে প্রচুর পরিমাণে সূতী ও রেশম বস্ত্র কিনত। বীরভূমের ইলামবাজার থেকে 'গুরা'

২৩। পাত্তুলো, 'এন এসে আপন ইমপ্রুভিং এণ্ড কাল্টিং ভেটিং বেঙ্গল', পৃঃ ২৫।
২৪। জে, জেড, হলওয়েল, ঐ, পৃঃ ১৯৪।

জাতীয় বস্ত্র কোম্পানীর জন্য কেনা হত। মেদিনীপুরে সূতীবস্ত্র ও সূক্ষ্ম মস্‌লিন পাওয়া যেত। রেশম ও সূতীর মিশ্র বস্ত্রও এখানে মিলত।

গ্রোস লিখেছেন 'রাধানগর সূতীবস্ত্র, রেশমী রুমাল ও উড়্‌নীর জন্য বিখ্যাত।'[২৫] কলকাতার কাছে ওলন্দাজ কুঠী বরানগরে মোটা নীল রুমাল তৈরি হত। নদীয়া ও মুর্শিদাবাদ বিভিন্ন ধরণের সূতী ও রেশমী বস্ত্রের জন্য খ্যাতি অর্জন করেছিল। কৃষ্ণচন্দ্রের জমিদারির মধ্যে শান্তিপুর, বরণ প্রভৃতি স্থানে ইউরোপীয় বাজারে রপ্তানির জন্য উৎকৃষ্ট বস্ত্র উৎপন্ন হত।[২৬] গ্রোস লিখছেন 'কাশিমবাজারের চারপাশের জমি উর্বর, লোকজন খুব পরিশ্রমী; এরা সারাবছর নানারকম শিল্পোৎপাদনে নিযুক্ত থাকে।' সাধারণভাবে তাদের রেশম উৎপাদনের পরিমাণ দাঁড়াত বছরে বাইশ হাজার বেল (এক বেলে একশ পাউণ্ড রেশম থাকে)। কাশিমবাজারের তাঁতীরা 'তাসাতি' বানাত এবং দেশের মধ্যে সবচেয়ে সুন্দর সূতীবস্ত্র এখানে তৈরি হত। রেনেল সাহেবের মতে এসময়কার কাশিম-বাজার বাংলার রেশমের সবচেয়ে বড় সাধারণ বাজার। এখানে বিপুল পরিমাণে রেশম উৎপন্ন হত বাংলাদেশ যা সারা এশিয়াতে রপ্তানি করে প্রচুর অর্থোপার্জন করত। গুজরাটের রেশম শিল্পীরা বাংলার রেশম সূতো ও কাঁচা রেশমের ওপর অনেকখানি নির্ভর করত। এ রেশমের তিন থেকে চার লক্ষ পাউণ্ড ইউরোপে রপ্তানি করা হত। ইউরোপের বয়ন শিল্পে এ রেশম ব্যবহৃত হত।[২৭]

তিন ধরনের গুটি থেকে বাংলার রেশম পাওয়া যেত। বড় পালু (Bombyx textor) দেশিপালু (Bombyx fortunatus) এবং নিস্তারি (Bombyx creasi)। তুঁতে, শাল, আসন প্রভৃতি গাছে পোকা পালন করে এবং গুটি জলে সিদ্ধ করে রেশম বানানো হত। রেশম সূতো বানানোর এ দেশীয় পদ্ধতি খুব একটা উন্নত ধরণের ছিল না। সূতো কর্কশ ও অসমান হত; মাঝে মাঝে ছিঁড়ে যেত। দুই, তিন বা চার পর্দার সূতোও উঠত। তার ফলে সূক্ষ্ম রেশম বস্ত্র উৎপাদন করা যেত না। পলাশী যুদ্ধের আগে উন্নত পদ্ধতির প্রয়োগে বাংলার রেশম শিল্পের উন্নতি ও পরিবর্তন ঘটানোর কোনো চেষ্টা হয়নি। বেশি বর্ষায় রেশম শিল্পের ক্ষতি হয়। ১৭৫২ ও ১৭৫৪ খ্রীষ্টাব্দে প্রবল বর্ষণে বহু রেশম

২৫। গ্রোস, 'ভয়েজ টু দি ঈস্ট ইণ্ডিজ', দ্বিতীয় খণ্ড, পৃঃ ২৩৬।

২৬। হলওয়েল, ঐ, পৃঃ ২০২।

২৭। কে. কে. দত্ত, 'বেঙ্গল সুবা', প্রথম খণ্ড, পৃঃ ৪২৩।

পোকা মারা যায়। তুঁতে গাছেরও ক্ষতি হয়। এ সময় বাংলার রেশম দুষ্প্রাপ্য ও দুর্মূল্য হয়ে উঠেছিল।[২৮]

বাংলাদেশে বস্ত্র শিল্পে ঢাকার স্থান সর্বাগ্রে। বিভিন্ন সূতী এবং সূক্ষ্ম মস্‌লিন বস্ত্র তৈরিতে ঢাকা এ সময়ে দেশে ও বিদেশে খ্যাতি অর্জন করেছিল। এ যুগে ঢাকায় মস্‌লিনের বিশাল ব্যবসা। ঢাকা মস্‌লিনের বেশিরভাগ ইউরোপে রপ্তানি করা হত।[২৯] 'রিয়াজের' গ্রন্থকার জানিয়েছেন ঢাকায় সাদা মস্‌লিন সব চেয়ে ভাল তৈরি হত। ঢাকা জেলার প্রায় সব গ্রামেই বয়ন শিল্প চালু ছিল। এর মধ্যে ঢাকা শহর, সোনার গাঁ, দুমরা, তিতবাড়ি, জঙ্গলবাড়ি এবং বাজেদপুরে উৎকৃষ্ট মস্‌লিন বানানো হত। ঢাকার কালোকোপা, জালালপুর, নারায়ণপুর, চাঁদপুর এবং শ্রীরামপুরে মোটা কাপড় উৎপন্ন হত। ঢাকার তাঁতে সব ধরণের বস্ত্রই তৈরি হত। সূক্ষ্ম গোসামীর মস্‌লিন থেকে রাজকন্যাদের বস্ত্র এখানে পাওয়া যেত। এখানে গরীব কৃষকদের মোটা বস্ত্রও অঢেল পরিমাণে তৈরি করা হত। ঢাকার মস্‌লিন সম্পর্কে স্ট্যাভোরিনাসের একটি মন্তব্য বেশ গুরুত্বপূর্ণ। 'এখানে যে সুন্দর মস্‌লিন উৎপন্ন হত তার কুড়ি গজ বা তার বেশি পরিমাণ সহজেই একটি সাধারণ পকেট তামাক কৌটায় ভরা যেত।' ঢাকার তাঁতীরা অতি সূক্ষ্ম মস্‌লিন তৈরি করত সামান্য, অসম্পূর্ণ, দেশী হাতিয়ার নিয়ে—যা দেখে ইউরোপীয়রা অবাক হতেন। ১৭৫৫ খ্রীষ্টাব্দে ইস্ট ইণ্ডিয়া কোম্পানী ঢাকা থেকে সরবতী, মলমল, অলবলি, তাঞ্জীব, তোরিন্দাম, নয়নসুখ, দুরিয়া, জামদানী প্রভৃতি মস্‌লিন সংগ্রহ করেছিল।[৩১] চট্টগ্রাম থেকেও কোম্পানী বস্ত্র সংগ্রহ করত। এখান থেকে মিলত মোটা সূতী বস্ত্র।

সূতো অনুযায়ী মস্‌লিনকে চার ভাগে ভাগ করা যায়। সাধারণ (ordinary), সূক্ষ্ম (fine), অতি সূক্ষ্ম (superfine) এবং অতি অতি-সূক্ষ্ম (fine superfine)। এগুলি সাদা, দাগ টানা, নানারকম ছাপ ও বিভিন্ন রঙের হত। বস্ত্রের ওপর নানারকম কাজের জন্য ঢাকা এ সময় খ্যাতি লাভ করেছিল। ঢাকাতে নানাধরণের বস্ত্রে ফুলের কাজ, সূঁচের কাজ এবং এমব্রয়ডারি কাজ হত।

২৮। বেঙ্গল পাবলিক কনসালটেশন, ২৪শে নভেম্বর, ১৭৫৫। রেভাঃ জেমস্‌ লঙ্‌, 'সিলেকশনস ফ্রম আনপাবলিশড্‌ রেকর্ড'স অব দি গভর্ণমেন্ট,' পৃঃ ৭৫।

২৯। জে. রেনেল, 'মেমোয়ার অব এ ম্যাপ অব হিন্দুস্থান', পৃঃ ৬১।

৩০। জেমস্‌ টেলর, 'এ ডেসক্রিপটিভ এ্যাকাউন্ট অব দি কটন ম্যানুফ্যাকচার্স ইন ঢাকা,' পৃঃ ৪।

৩১। লেটার ফ্রম দি কোর্ট, ১৯শে ডিসেম্বর, ১৭৫৫।

ঈস্ট ইণ্ডিয়া কোম্পানী এজন্য বহু নারী শ্রমিক নিয়োগ করেছিল। এ কাজের জন্য কোম্পানীর অন্যান্য ফ্যাক্টরি থেকে ঢাকাতে বস্ত্র পাঠানো হত। ঢাকাতে বস্ত্রের ওপর সোনারুপো এবং রেশমের এমব্রয়ডারি কাজও হত। রুমাল ও মস্‌লিনের ওপর হাতের কাজ বিদেশীদের দৃষ্টি আকর্ষণ করেছিল। এগুলি ইউরোপের বিভিন্ন দেশে বাংলার হাতের কাজের কদর বাড়িয়েছিল।[৩২] বাংলার মহিলারা বাংলার বয়ন শিল্পের সঙ্গে ঘনিষ্ঠভাবে যুক্ত ছিল। হাতের কাজ ছাড়াও বাংলার তাঁতের প্রয়োজনীয় সুতোর বেশির ভাগ মহিলারাই সরবরাহ করত। এ যুগে বাংলায় কার্পেট, শতরঞ্জি, দুলিচা, গালিচা, মাদুর, শীতলপাটি প্রভৃতি বনানো হত। বিজয়রামের 'তীর্থমঙ্গলে' এগুলির উল্লেখ আছে। সুজন রায়ের 'খুলাসাতে' বাংলার শীতল পাটির কথা আছে। তাঁতে চট বোনা হত। চট থেকে ব্যাগ ও কার্পেট হত। 'আইন-ই-আকবরীতে বাংলার চটের উল্লেখ আছে। ঘোড়াঘাট অঞ্চলে (রঙ্গপুর) চটের কার্পেট বোনা হত। এগুলি সবই বাংলার অভ্যন্তরীণ প্রয়োজন মেটাত। বাংলার বাইরে চট ও চটজাত দ্রব্যের তেমন বাজার ছিল না। সেজন্য রপ্তানি কম হত।

এ যুগে বাংলার অপর প্রধান শিল্প হল চিনি। বাংলা থেকে চিনি তৃতীয় প্রধান রপ্তানি যোগ্য পণ্য। এশীয় দেশগুলিতে চিনি রপ্তানি করে বাংলা প্রচুর অর্থোপার্জন করত।[৩৩] ১৭৫৬ খ্রীষ্টাব্দে বাংলার মোট উৎপন্ন চিনির পরিমাণ পাঁচ লক্ষ মণ। পলাশী যুদ্ধের আগের দুই দশকে (১৭৩৭-১৭৫৭) চিনি রপ্তানি করে বাংলা মোট ষাট লক্ষ টাকা রোজগার করেছিল। স্ট্যাভোরিনাস্‌ তাঁর গ্রন্থে বাংলার দেশীয় চিনি প্রস্তুত পদ্ধতির বিস্তৃত বর্ণনা দিয়েছেন। কাঠের যন্ত্রে পিষে আখের রস বার করা হত। তারপর এই রস থেকে দেশীয় পদ্ধতিতে জ্বালিয়ে, পরিস্রাবণ করে জটিল প্রক্রিয়ায় চিনি বানানো হত।[৩৪] তাঁর বিবরণী থেকে সোরা, আফিম ও লাক্ষা প্রস্তুতের পদ্ধতিও জানা যায়। গোলাম হোসেন জানিয়েছেন এ যুগে বাংলায় কৃত্রিম উপায়ে বরফ তৈরি করা হত। শীতকালে গরম জল মাটির নীচে রেখে এটা সহজেই করা যেত। বাংলার সমুদ্রোপকূলে, বিশেষ করে গঙ্গা ও সমুদ্রের সঙ্গমস্থলে, লবণ উৎপাদন করা হত। বাংলায় লবণ প্রস্তুতের প্রধান স্থানগুলি হল হিজলি, কাঁথি, তমলুক ও সুন্দরবন

৩২। কে, কে. দত্ত, ঐ পৃঃ ৪২৭।
৩৩। লেটার টু কোর্ট, ৩রা ফেব্রুয়ারী, ১৭৪৩।
৩৪। স্ট্যাভোরিনাস, ঐ, প্রথম খন্ড, পৃঃ ১৪০।

এ অঞ্চলের লবণ উৎপাদনকারী জমিগুলি 'জলপাই' নামে অভিহিত হত। জলপাই জমিতে সমুদ্রের নোনাজল ওঠে। এগুলি খালারিতে বা খণ্ডে ভাগ করে লবণ উৎপাদক মালঙ্গিদের বন্দোবস্ত দেওয়া হত। এক একটি খালারিতে গড়ে ৭ জন মালঙ্গি ২৩৩ মণ লবণ প্রস্তুত করত। এ থেকে বাংলা সরকার বার্ষিক রাজস্ব পেত চল্লিশ থেকে পয়তাল্লিশ হাজার টাকা। এক মেদিনীপুর জেলাতে প্রায় চার হাজার খালারি ছিল। নোনাজল জঙ্গলের কাঠে জালিয়ে খুব সহজেই লবণ প্রস্তুত করা হত। বাংলার উৎপন্ন লবণ আভ্যন্তরীণ প্রয়োজন মিটিয়ে ভূটান, আসাম, কাশ্মীর, তিব্বত ও নেপালে রপ্তানি করা যেত।[৩৫]

রেনেলের জার্নাল থেকে বাংলার বীরভূম জেলার লোহার খনিগুলির পরিচয় পাওয়া যায়। এ জেলাতে বেশ কয়েকটি লোহার খনি ছিল। এগুলি থেকে লোহা তুলে নিকটবর্তী কারখানাতে ব্যবহারযোগ্য করা হত। বীরভূমের দেওচা, মহম্মদ বাজার, দামড়া এবং মল্লারপুরে লোহার কারখানাগুলি গড়ে উঠেছিল। এখানকারা কৃষ্ণনগরেও একটি লোহার খনি ছিল বলে জানা যায়। বীরভূমের মল্লরাজারা স্থানীয় কারিগর দিয়ে উন্নত ধরণের কামান ও অন্যান্য অস্ত্রশস্ত্র বানাতেন। বিষ্ণুপুরের রাজাদের বিখ্যাত দলমাদল কামান এবং গোপাল সিংহের পিতা প্রথম রঘুনাথ সিংহের উন্নত ধরনের তরবারি আজও এর সাক্ষ্য দিচ্ছে। মীর কাশিম মুঙ্গেরে অস্ত্র কারখানা বানিয়েছিলেন। এ বিষয়ে প্রযুক্তি বিদ্যা আগেই এদেশীয়দের আয়ত্বে এসেছিল বলে মনে হয়। কলকাতা ও কাশিমবাজারে ভারী কামান টানা গাড়ি তৈরি হত বলে কোম্পানীর কাগজপত্রে উল্লেখ আছে।

নবাবী আমলে বাংলার প্রয়োজনীয় কাগজ এদেশে প্রস্তুত করা হত। আমাদের দিনের কাগজের সঙ্গে তুলনায় এ কাগজ অবশ্যই নিম্নমানের ছিল। এগুলি অনেকটা হলদেটে, কর্কশ, অসমান, দাগবিশিষ্ট ও আঁশযুক্ত হত। হাতে তৈরি এ কাগজে অনেক ছিদ্র থাকত। অল্পদিনে বা খুব সহজে ছিঁড়ে যেত। এ কাগজ কালি টেনে নিত এবং পোকায় খেত। যারা কাগজ প্রস্তুত করত তারা কাগজী নামে পরিচিত হত। কাগজীদের অবস্থা মোটামুটি স্বচ্ছল ছিল বলা চলে। কাগজ বানানোর জন্য বেশি পুঁজির দরকার হত না। বাংলাদেশে পাট, চুণ ও জল দিয়ে খুব সহজ পদ্ধতিতে কাগজ তৈরি হত। চুণের জলে ভেজানো পাটের মণ্ড ঢেঁকিতে কুটে, বাঁশের ছাঁচে ফেলে, রৌদ্রে শুকিয়ে কাগজ

৩৫। জে. গ্র্যান্ট, এ্যানালিসিস অব দি ফিনান্সেস অব বেঙ্গল, এপ্রিল, ১৭৮৬। ফারমিংগার, 'ফিফ্‌থ রিপোর্ট' দ্বিতীয় খণ্ড দ্রষ্টব্য।

বানানোর ব্যবস্থা ছিল।[৩৬] বাংলার কাগজ কেনার জন্য মাদ্রাজ প্রেসিডেন্সি থেকে মাঝে মাঝে নির্দেশ আসত।[৩৭] ভারতের অন্যান্য প্রদেশেও বাংলার কাগজ কিছু কিছু রপ্তানি করা হত।

এ যুগে বাংলায় বসবাসকারী বিদেশী বণিক, পর্যটক, পর্যবেক্ষক সকলেই বাংলার অসংখ্য হস্তশিল্পের কথা উল্লেখ করেছেন। এ দেশীয় সমকালীন লেখক ও কবিদের রচনায় বাংলার উন্নত ধরণের বহু হাতের কাজের সন্ধান পাওয়া যায়। এগুলি প্রধানত হল সোনা, রূপো ও হাতির দাঁতের কাজ, শাঁখার কাজ, পিতল, কাঁসা ও ভরণের কাজ, লোহা ও কাঠের কাজ। এ যুগে মুর্শিদাবাদ, বাঁকুড়া ও বীরভুম পিতল কাঁসার কাজের জন্য খ্যাতি অর্জন করেছিল। এক শ্রেণীর কারিগর বা হস্তশিল্পী এক একটি বিশেষ কাজে বংশপরম্পরায় নিযুক্ত থাকত। সেজন্য তাদের প্রস্তুত সামগ্রী উন্নত মানের হত। নওয়াজেস মোহাম্মদের দেওয়ান রাজবল্লভ ঢাকার কাছে রাজনগরের হস্তশিল্পী ও কারিগরদের আহ্বান করে বসিয়েছিলেন। রাজনগরে পিতল কাঁসার বাসন, লোহার জিনিস, অস্ত্রশস্ত্র, মাটির তৈজসপত্র এবং সুতীবস্ত্র সারা পূর্ব বাংলায় জনপ্রিয় হয়েছিল।[৩৮] এ যুগে ঢাকার শাঁখার কাজ সারা বাংলায় সুপরিচিত। মুর্শিদাবাদে হাতির দাঁতের কাজ ও কাঠের কাজ বাংলার প্রয়োজন মেটাত। ঢাকা এ যুগের বাংলার নৌবহরের (নাবারা) প্রধান ঘাঁটি। চট্টগ্রামও একটি নৌঘাটি। নৌবহরের প্রয়োজন ছাড়াও বাংলার অভ্যন্তরীণ যোগাযোগের প্রধান মাধ্যম নৌকা। এ সমস্ত প্রয়োজন মেটাত বাংলার মিস্ত্রি কারিগররা। বাংলার কারিগররা অসংখ্য শৌখীন ও বৃহৎ নৌকা তৈরি করত। করম আলি 'মুজাফর নামায়' বাংলার নৌকাগুলির নাম উল্লেখ করেছেন। সমসাময়িক সাহিত্যেও বজরা, ময়ূরপংখী, খোসখান, পালবারা, সেরিঙ্গা, স্লুপ প্রভৃতি নৌকার পরিচয় পাওয়া যায়। বাংলার কারিগররা সামরিক প্রয়োজন, নৌ বাণিজ্য ও দ্রুত যাতায়াতের জন্য বিশেষ বিশেষ নৌকা প্রস্তুত করত।

৩৬। মন্টগোমারি মার্টিন, 'ইস্টার্ণ ইন্ডিয়া', দ্বিতীয় খন্ড, পৃঃ ৯৩৫-৯৩৬।
৩৭। কনসালটেশনস্, ৯লা অক্টোবর, ১৭৩৯।
৩৮। রসিকলাল গুপ্ত, 'মহারাজা রাজবল্লভ সেন', পৃঃ ৭৭।

চতুর্থ অধ্যায়

বাণিজ্য ও যোগাযোগ

আলোচনার সুবিধার জন্য প্র্যাক্-পলাশী যুগের বাংলার সামগ্রিক বাণিজ্যকে তিন ভাগে ভাগ করা যায়—অভ্যন্তরীণ, আন্তঃপ্রাদেশিক ও আন্তর্জাতিক। বাংলার বণিক সমাজ আভ্যন্তরীণ ও আন্তঃপ্রাদেশিক বাণিজ্যে অংশ নিত। অভারতীয় ও ইউরোপীয়রা বাংলার বহির্বাণিজ্য পরিচালনা করত। এ যুগের বাংলার বণিক সমাজকেও তিন ভাগে ভাগ করা যায়—বড়, মাঝারি ও ছোট। বড় ব্যবসায়ী ও মহাজনদের হাতে সব সময় বিশাল পুঁজি মজুত থাকত। নিজেদের সম্পদ ও ঋণে এ পুঁজি গড়ে উঠত। বড় ব্যবসায়ীদের সংগঠন ও ব্যবসায়ের পরিমাণও বিশাল। মাঝারি ও ছোট ব্যবসায়ীদের মাধ্যমে এরা সরাসরি উৎপাদকদের সঙ্গে যোগাযোগ প্রতিষ্ঠা করতে সক্ষম হত। মাঝারি ও ছোট ব্যবসায়ীদের পুঁজি কম। এদের ব্যবসায়ী কাজ কর্মের ধরণও আলাদা। এদের বেশির ভাগ কোনো বিশেষ দ্রব্যে বা বিশেষ অঞ্চলে ব্যবসা প্রতিষ্ঠা করত। এছাড়া বড় ব্যবসায়ীদের কমিশন এজেন্ট হিসাবে দাদন নিয়ে এরা পণ্য সরবরাহ ব্যবসায়ে লিপ্ত থাকত। নিজেদের মূলধন কম বলে অধিকাংশ সময় এদের সুদে টাকা ধার নিতে হত। বণিক শ্রেণীর ওপর তলায় অবৈধভাবে বা অসাধু উপায়ে টাকা রোজগারের ঝোঁক থাকলেও সাধারণভাবে বাংলার বণিকরা কঠোরভাবে ববসায়ী রীতি নীতি মেনে চলত। বিদেশী বণিকরা বাংলার বণিকদের চরিত্র, ব্যবসায়ী বুদ্ধি এবং পুঁজির পরিমাণ ভালভাবে যাচাই করে তবেই এদের সঙ্গে কোনো চুক্তি করত। অষ্টাদশ শতাব্দীর প্রথমার্ধে ইংরাজ, ফরাসি ও ওলন্দাজরা সাধারণত বৃহৎ বণিকদের সঙ্গে পণ্য সরবরাহের চুক্তি করত। আর্থিক নিশ্চয়তা, সুনাম এবং পণ্য সরবরাহ সম্পর্কে নিশ্চিত হওয়ার জন্য এরা বৃহৎ ব্যবসায়ী-দের দ্বারস্থ হত। এ যুগের বাংলার বণিকদের আর একটি উল্লেখযোগ্য বৈশিষ্ট্য হল এরা সাধারণত নিজেদের বর্ণ ও সম্প্রদায়ের মধ্যে ব্যবসায়িক কাজকর্ম ও লেনদেন সীমায়িত রাখত। হিন্দু ব্যবসায়ীরা সাধারণত মুসলমান বা অন্য সম্প্রদায়ের বণিকদের সঙ্গে ব্যবসায়িক লেন-দেন করত না। তবে সমুদ্র বাণিজ্যের জন্য মুসলমান বণিকদের জাহাজ ভাড়া নেওয়ার ব্যাপারে কোনো আপত্তি দেখা

যায় না। অনেক সময় হিন্দু সমাজের এক বর্ণের লোক অন্য বর্ণের সঙ্গে সহজে ব্যবসায়িক লেনদেনের সম্পর্ক স্থাপন করত না। বিদেশী ইউরোপীয় কোম্পানী-গুলি খুব কমই মুসলমান বণিকদের সঙ্গে ব্যবসায়িক সম্পর্ক প্রতিষ্ঠা করত। সম্ভবত মুসলমান রাজশক্তির সঙ্গে সম্পর্ক তিক্ত হতে পারে এ ভয়েই ইউরোপীয় বণিকরা সযত্নে মুসলমান বণিকদের পরিহার করত। তাছাড়া এ যুগে বাংলা-দেশে মুসলমান বণিকদের সংখ্যাও খুব কম।

সমাজ বিজ্ঞানী ও অর্থনীতিবিদ্‌রা এ যুগে বাংলা বাণিজ্যের সামগ্রিক উন্নতির কয়েকটি আর্থ-সামাজিক কারণ উল্লেখ করেছেন। এ যুগের বাংলায় যোগাযোগ ব্যবস্থা মোটামুটি ভাল। বাংলায় মজুরের যোগান অব্যাহত এবং সস্তা। মজুর ও খাদ্যশস্যের দাম কম হওয়ায় উৎপন্ন পণ্যের দামও কম। বাংলার কৃষি উন্নত এবং নানা ধরণের কৃষিজ পণ্য বাংলায় পাওয়া যেত। এখানকার কুটীর ও হস্ত শিল্প উন্নতমানের পণ্য সরবরাহ করত। ভারতের বিভিন্ন প্রদেশে, এশিয়ার বিভিন্ন দেশে ও ইউরোপে বাংলার উৎপন্ন কৃষিজ ও শিল্প পণ্যের বিপুল চাহিদা দেখা যায়। সর্বোপরি এ দেশের অপেক্ষাকৃত উন্নত মুদ্রা ব্যবস্থা এবং সহজ বাণিজ্যিক পুঁজির যোগান বাণিজ্যের সহায়ক পরিমণ্ডল রচনা করেছিল। জগৎ শেঠ পরিবার, পাঞ্জাবী, আর্মেনীয় ও এদেশীয় বণিকগোষ্ঠী এ পুঁজি সরবরাহ করত। উপরোক্ত কারণগুলি প্রাক্-পলাশী যুগে বাংলার বাণিজ্যিক সমৃদ্ধির কারণ বলে বিবেচিত হয়।

বাণিজ্য সহায়ক-এ পরিবেশের সঙ্গে যুক্ত হয়েছিল বাংলার বিশাল অভ্যন্তরীণ বাজার ও বাণিজ্য। এ যুগে মুর্শিদাবাদের কাছে ভগবানগোলা এবং ঢাকার কাছে রাজনগর অভ্যন্তরীণ বাণিজ্যের বড় ঘাঁটি। তাছাড়া অসংখ্য ছোট ছোট বাজার, গঞ্জ ও হাট সারা বাংলাদেশে। বড় বড় মহাজন ও পাইকারী ব্যবসায়ী থেকে ছোট ছোট অসংখ্য দোকানদার ও ব্যবসায়ী বাংলার অভ্যন্তরীণ বাণিজ্যের সঙ্গে যুক্ত ছিল। এরা বিদেশীদের যেমন পণ্য সরবরাহ করত তেমনি বাংলার বিভিন্ন অভ্যন্তরীণ বাণিজ্য পণ্য যেমন চাল, লবণ, পান, সুপারি, তামাক, তেল, লঙ্কা প্রভৃতি জল ও স্থল পথে এক জেলা থেকে আর এক জেলায় নিয়ে যেত। এ যুগে অভ্যন্তরীণ বাণিজ্যের একটি উল্লেখযোগ্য দিক হল বাংলার নবাবরা বিভিন্ন বণিক ও বিশিষ্ট ব্যক্তিদের কয়েকটি নিত্য প্রয়োজনীয় দ্রব্যে একচেটিয়া ব্যবসায়ের অধিকার দিয়েছিলেন। আর্মেনীয় বণিক খাজা ওয়াজেদ এ যুগের শেষ দিকে লবণের ব্যবসায় একচেটিয়া অধিকার ভোগ করত। ঠিক তেমনি-

ভাবে চট্টগ্রাম ও শ্রীহট্ট অঞ্চলে ফৌজদাররা অনেক জিনিসের ওপর একচেটিয়া ব্যবসায়ের অধিকার ভোগ করত। এগুলির মধ্যে বিশেষ করে উল্লেখযোগ্য হল তামাক, সুপারি ও চূণের একচেটিয়া ব্যবসা। পলাশী যুদ্ধের আগে বাংলার বিদেশী বণিকরাও অভ্যন্তরীণ বাণিজ্যে অংশ গ্রহণ করেছিল। ইউরোপীয় কোম্পানীগুলির সর্বশ্রেণীর কর্মচারী বাংলাদেশে বক্তিগত ব্যবসা করত। তবে এ যুগে এ বাণিজ্য তেমন ব্যাপক ও বিপুল রূপ নেয়নি। পলাশীযুদ্ধের পরে ইউরোপীয় বণিকদের অভ্যন্তরীণ বাণিজ্যে ব্যাপকভাবে অনুপ্রবেশ ঘটেছিল। ইউরোপীয় বণিকরা সাধারণভাবে এদেশীয় বেনিয়ান ও গোমস্তাদের মাধ্যমে এদেশের অভ্যন্তরীণ, আন্তঃপ্রাদেশিক ও এশীয় বাণিজ্যে অংশ গ্রহণ করত। এদেশীয়রা পুঁজি, ব্যবসায়ী সংগঠন, বুদ্ধি ও শ্রম যোগাত। ইউরোপীয় বণিকরা মোট লভ্যাংশের কুড়ি থেকে পঁচিশ শতাংশ ভাগ পেত। অনেকে আবার স্বাধীন ব্যবসায়ী সংগঠন গড়ে তুলেছিল। নিজেদের অফিস ও কর্মচারী রেখে ব্যবসা পরিচালনা করত। সমকালীন ব্যবসায়ের হিসাবপত্র থেকে দেখা যায় বাংলার অভ্যন্তরীণ বাণিজ্যে লাভের অঙ্কটা ভালই দাঁড়াত। এক হিসাবে দেখা যায় এসময় বাংলাদেশে চালের ব্যবসায়ে লাভের পরিমাণ দাঁড়াত শতকরা পঁচিশ টাকা। অন্যান্য জিনিসের ব্যবসায়ে লাভের পরিমাণ এর কম হত না। অবশ্য সারাবছর সব জিনিসের ব্যবসায়ে লভ্যাংশ এক রকম হতে পারে না। বিশেষ সময়ে বিশেষ দ্রব্যে লাভের পরিমাণ বাড়ে। আবার কিছুকাল পরে সেই পণ্যে লভ্যাংশ কমে যায়। এ যুগে বাংলার অভ্যন্তরীণ বাণিজ্যে বিভিন্ন দ্রব্যের লাভের হারে এরমক উত্থান পতন দেখা যেত।

প্রাক্-পলাশী বাংলার সঙ্গে ভারতের অন্যান্য প্রদেশের বাণিজ্য সম্পর্ক ছিল বিস্তৃত ও বিশাল। পূর্বে আসাম, ভূটান, তিব্বত ও নেপাল থেকে পশ্চিমে গুজরাট; উত্তরে কাশ্মীর ও উত্তর ভারতের বিভিন্ন অঞ্চল থেকে দক্ষিণে করমণ্ডল ও মালাবার উপকূল পর্যন্ত এ বাণিজ্যের বিস্তার। পশ্চিম উপকূলের বোম্বাই ও সুরাটের সঙ্গেও বাংলার ভালরকমের বাণিজ্য ছিল।[১] স্থলপথে বর্তমান উত্তর প্রদেশের মির্জাপুর বাংলা ও উত্তর ভারত এবং বাংলা ও পশ্চিম ভারতের মধ্যে মধ্যবর্তী ব্যাবসায়ী ঘাঁটি হিসাবে কাজ করত। উত্তর ও মধ্য ভারতের, দিল্লী, আগ্রা, এলাহাবাদ, অযোধ্যা, কাশী, বুন্দেলখণ্ড ও মালবের সঙ্গে বাংলার ঘনিষ্ঠ বাণিজ্য সম্পর্ক গড়ে উঠেছিল। সমসাময়িক ব্যক্তিদের বিবরণী থেকে জানা যায় এ যুগে

১। আলেকজান্ডার ডাও, 'হিন্দুস্তান', প্রথম খণ্ড, পৃঃ ১১৫।

ভারতের বিভিন্ন প্রদেশ থেকে বণিক দল বাংলায় বাণিজ্য করতে আসত। এ সময় বাংলার অবাঙালী বণিকদের মধ্যে আফগান, শেখ, কাশ্মীরী, মূলতানী, প্যাগিয়া (পাগড়িধারী উত্তর ভারতীয় বণিক), ভুটিয়া এবং সন্ন্যাসীরাই প্রধান। সন্ন্যাসী ও ফকির বণিকরা হিমালয় সংলগ্ন অঞ্চলের উৎপন্ন উদ্ভিজ ফসল, চন্দনকাঠ, মালার বীচি, নানারকম ভেষজ দ্রব্য, গাছ গাছালি বাংলায় নিয়ে আসত। হলওয়েল জানিয়েছেন দিল্লী ও আগ্রা থেকে বণিকদল বর্ধমানে বাণিজ্যের জন্য আসত। এখান থেকে তারা সীসা, তামা, টিন, লঙ্কা ও নানারকম বস্ত্র নিয়ে যেত। এ বাণিজ্যের পরিমাণ হত বিশাল। দিল্লী ও আগ্রার বণিকদল তাদের প্রয়োজনীয় জিনিসগুলি নগদ টাকায় কিনত। কিছু পরিমাণ পণ্য বিনিময় প্রথায় বেচাকেনা হত। আফিম, সোরা ও ঘোড়ার বিনিময়ে তারা বাংলা থেকে তাদের প্রয়োজনীয় পণ্য সংগ্রহ করত।

বাংলা থেকে একই উদ্দেশ্যে বণিকদল দিল্লী আগ্রা অঞ্চলে যেত। এরা ঐ অঞ্চলে নিয়ে যেত লবণ, চিনি, আফিম, রেশম, রেশমী বস্ত্র, অসংখ্য সূতীবস্ত্র এবং মস্লিন। সব মিলিয়ে আগ্রা দিল্লী অঞ্চলের সঙ্গে বাংলার বাৎসরিক বাণিজ্যের পরিমাণ চার কোটি টাকায় গিয়ে দাঁড়াত।[২] এছাড়া বাংলার বণিকরা ভারতের বিভিন্ন প্রান্তে বাণিজ্য করতে যেত। আসাম, কাছাড় ও নেপাল থেকে আনত প্রধানত কাঠ ও হাতির দাঁত। বালাশোর বা বালেশ্বর থেকে আনত লোহা ও পাথরের জিনিসপত্র, চাল ও অন্যান্য দ্রব্য। বালেশ্বরে পাঠাত তামাক ও অন্যান্য পণ্য। বাংলার বণিকরা আসামে পাঠাত লবণ, তামাক ও সুপারি। পূর্ব ও পশ্চিম উপকূলের সমস্ত বন্দর ও শহরে, দিল্লী ও আগ্রার সন্নিহিত অঞ্চলে, কাশী, এলাহাবাদ ও অযোধ্যাতে বাংলার বণিকদের দেখা যেত। বাংলার বণিকরা এদেশ থেকে নিয়ে যেত সূতী ও রেশমীবস্ত্র, মস্লিন, চিনি, তামাক, সুপারি, লবণ, আদা, হলুদ, লঙ্কা প্রভৃতি। বাংলায় নিয়ে আসত ফল, ওষুধ, কড়ি, টিন, তূলা, শঙ্খ প্রভৃতি নানারকম পণ্য। কাশ্মীরী ও আর্মেনীয় বণিকরা এযুগে বাংলার আন্তঃপ্রাদেশিক বাণিজ্যে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা নিয়েছিল। কাশ্মীরী বণিকরা বাংলা থেকে লবণ সংগ্রহ করত। এজন্য সুন্দরবনের মালঙ্গিদের আগাম টাকা দিয়ে সস্তায় লবণ বানিয়ে নিত। এই বণিকদল বাংলা ও তার প্রতিবেশী দেশগুলির সঙ্গে

২। আবে রেনল, 'এ ফিলজফিকাল এন্ড পলিটিক্যাল হিস্ট্রি অব দি সেটেলমেন্টস্', প্রথম খন্ড, পৃঃ ৪০৮। পাউন্ড ১৭,৫০,০০০।

বাণিজ্যে অংশ নিত। এরা বাংলা থেকে বস্ত্র, রেশম, ঝিনুক, চামড়া, নীল, মুক্তো, তামাক, চিনি, লবণ, সুপারি, মশলা, ব্রডক্লথ, লোহার জিনিসপত্র, ও মালদা সাটিন নিয়ে নেপাল, তিব্বত ও ভূটানে যেত। তারা বাংলার জন্য এ সমস্ত অঞ্চল থেকে নানারকম ভেষজ দ্রব্য, সোনা, রেশম, হাতির দাঁত, পশমের কাপড়, মুখোশ ও লাক্ষা নিয়ে আসত।

আন্তঃ প্রাদেশিক বাণিজ্যে অন্যতম পণ্য হল বাংলার লবণ। বাংলা থেকে লবণ ভারতের বিভিন্ন প্রদেশে পাঠান হত। জলপথে লবণ পাঠানো হত বলে পরিবহন ব্যয় বেশি হত না। এতে লবণের দাম কম থাকত, বাংলা থেকে বিশাল পরিমাণে লবণ পাঠানো হত কাশী ও মির্জাপুরে। সেখান থেকে আবার চালান যেত অযোধ্যা, এলাহাবাদ, বুন্দেলখণ্ড ও মালব রাজ্যে। এ যুগে বাংলার তামাক ও সুপারির উৎপাদন যথেষ্ট। এগুলি উত্তর ভারতের নিত্য প্রয়োজনীয় দ্রব্য। বাংলা থেকে তামাক ও সুপারি উত্তর ভারতের বিভিন্ন প্রদেশে রপ্তানি করা হত। বাংলা থেকে প্রচুর পরিমাণে লবণ আসামে পাঠানো হত। পাঁচ'শ ছ'শ টনের অন্ততঃ চল্লিশখানি বড় নৌকা বা জাহাজ বাংলার লবণ নিয়ে প্রতিবছর আসাম যেত। বাংলা-আসাম লবণ ব্যবসায়ে লাভ হত অসাধারণ—প্রায় শতকরা ২০০ ভাগ।

বাণিজ্যের সঙ্গে শিল্পের ঘনিষ্ঠ সম্পর্ক। এ সময়ে বাংলার প্রধান শিল্প পণ্য হল সূতীবস্ত্র, রেশমীবস্ত্র এবং মস্‌লিন। সারাভারতে এ পণ্যের বাজার উত্তরে থেকে পশ্চিমের গুজরাট এবং উত্তর পশ্চিমে লাহোর পর্যন্ত বিস্তৃত। বোম্বাই ও সুরাট থেকে বিপুল পরিমাণে কাঁচা তুলা বাংলায় আসত। এগুলি বাংলার তাঁতে ব্যবহৃত হত। বাংলা থেকে কাঁচা রেশম গুজরাট ও ভারতের অন্যান্য অঞ্চলে রপ্তানী করা হত। এর পরিমাণও নেহাত কম হত না। আলিবর্দীর সময়ে শুধু মুর্শিদাবাদের (চুণাখালি) শুল্কচৌকির যে হিসাব পাওয়া যায় তাতে দেখা যাচ্ছে বার্ষিক কম পক্ষে ৭০ লক্ষ টাকার রেশম বাংলার বাইরে পাঠানো হত। ইউরোপীয়রা বাংলা থেকে যে রেশম কিনত তা এ হিসাবের মধ্যে ধরা হয়নি।

১৭৫৬ খ্রীষ্টাব্দ পর্যন্ত বাংলার আন্তঃপ্রাদেশিক বাণিজ্যের একটি প্রধান পণ্য হল বাংলার চিনি। বাংলার চিনি মাদ্রাজ, মালাবার উপকূল, বোম্বাই, সুরাট ও সিন্ধুপ্রদেশে চালান দেওয়া হত। এ সময়কার ভারতবর্ষে বাংলা এ পণ্যের সবচেয়ে বড় কেন্দ্র ছিল বলে মনে করার যথেষ্ট কারণ আছে। পলাশী

যুদ্ধের আগে বাংলার বার্ষিক মোট রপ্তানিযোগ্য চিনির পরিমাণ পঞ্চাশ হাজার মণ। চিনির ব্যবসা থেকে প্রায় পঞ্চাশ শতাংশ লাভ হত। সেই পরিমাণে বাংলার আর্থিক সমৃদ্ধি ঘটত। পলাশী যুদ্ধের পর যখন জাভা থেকে সস্তা চিনি ভারতের পশ্চিম উপকূলে এসে হাজির হয় তখন থেকে বাংলার এই লাভজনক আন্তঃপ্রাদেশিক বাণিজ্য ক্ষতিগ্রস্থ হয়।

এ যুগে বাংলায় পাট থেকে তাঁতে বা হাতে চট বোনা হত। শতাব্দীর প্রথমদিকে চট অভ্যন্তরীণ প্রয়োজনে ব্যবহৃত হত। এ পণ্য রপ্তানি প্রায় ছিল না বললেই চলে। পঞ্চাশের দশক থেকে (১৭৫০) কিছু কিছু চট ও চটের ব্যাগ বাংলা থেকে বাইরে চালান দেওয়া শুরু হয়। ঈস্ট ইণ্ডিয়া কোম্পানীর বোম্বাই প্রেসিডেন্সি ১৭৫৩ খ্রীষ্টাব্দে বাংলা থেকে 'গানি' বা চট কেনার নির্দেশ দিয়েছিল।[৩] ১৭৫৯ খ্রীষ্টাব্দের ২১শে জুলাই মাদ্রাজ প্রেসিডেন্সি থেকে কলকাতায় চট কেনার নির্দেশ এসেছিল। ১৭৫৫ সনের কোম্পানীর নথিপত্রে ২০০০ 'গানিব্যাগের' উল্লেখ দেখা যায়। এসব সাক্ষ্য থেকে মনে হয় এ সময় থেকেই বাংলার বাইরে বাংলার চট ও চটের ব্যাগের কদর বাড়ছিল। বাংলাদেশ এ পণ্য রপ্তানি করে বেশ কিছু অর্থোপার্জন শুরু করেছিল।

প্রধান প্রধান পণ্যগুলি ছাড়াও বাংলা থেকে অনেকগুলি ছোটখাট কৃষিজ পণ্য যেমন লম্বা লঙ্কা, চাল, আফিম, আদা, হলুদ প্রভৃতি পশ্চিম ও পূর্ব উপকূলের প্রদেশগুলিতে রপ্তানি করা হত। এর বিনিময়ে বাংলা এ সমস্ত অঞ্চল থেকে সংগ্রহ করত তার প্রয়োজনীয় ওষুধ, ভেষজ দ্রব্যাদি, ফল, কড়ি, টিন, শঙ্খ প্রভৃতি।[৪] বাংলার বিদেশী কোম্পানীগুলি আন্তঃ প্রাদেশিক বাণিজ্যে অংশ গ্রহণ করত। ইংরাজ, ফরাসি ও ওলন্দাজরা বাংলা থেকে চিনি, চাল, চটের ব্যাগ, আদা, হলুদ, তেল এবং নানা খনিজ দ্রব্য বোম্বাই, মাদ্রাজ, সুরাট, পণ্ডিচেরি, কালিকট, মাহে—পূর্ব ও পশ্চিম উপকূলের অন্যান্য বন্দর ও শহরে বিক্রি করত। বিদেশী কোম্পানীগুলির কর্মচারীরাও এ ব্যবসায়ে নিযুক্ত ছিল। লাইসেন্সধারী ইংরাজ স্বাধীন বণিক (free merchant) এবং লাইসেন্সহীন বেআইনি বণিক (interloper) উভয়েই এ বাণিজ্যে অংশ নিত। সব মিলিয়ে বাংলার আন্তঃপ্রাদেশিক বাণিজ্যের পরিমাণ নেহাত কম হত না।

এ সময়কার আন্তঃপ্রাদেশিক বাণিজ্যের শ্রীবৃদ্ধির কারণ হল বাংলার

৩। বোম্বাই কাউন্সিলের লেটার টু ক্যালকাটা, ১২ই আগস্ট, ১৭৫৩।

৪। এস. সি. হিল, 'বেঙ্গল ইন ১৭৫৬-১৭৫৭', তৃতীয় খণ্ড, পৃঃ ৩১০।

অভ্যন্তরীণ শান্তি। মারাঠা আক্রমণ ছাড়া আর কোনো বড় রকমের গোলযোগ এ যুগের বাংলায় দেখা যায় না। মুর্শিদকুলী থেকে সিরাজুদ্দৌলা পর্যন্ত বাংলার নবাবরা বাণিজ্য ও বণিকদের সযত্নে রক্ষা করতেন। আগেকার মুঘল সুবাদাররা যে সমস্ত একচেটিয়া ব্যবসায়ে (সওদা-ই-খাস ও সওদা-ই-আম) লিপ্ত ছিলেন এ যুগের নবাবরা তা তুলে দেন। এ যুগে রাষ্ট্রীয় একচেটিয়া ব্যবসার সামান্য মাত্র অবশিষ্ট ছিল। সুতরাং অভ্যন্তরীণ ক্ষেত্রে প্রতিযোগিতামূলক বাজার গড়ে উঠেছিল। বাণিজ্য পণ্যের ওপর শুল্কের হারও কম ছিল। সাধারণত বিদেশীদের ও এদেশীয়দের ২½ শতাংশ হারে বাণিজ্য শুল্ক দিতে হত। এ যুগের শেষ দিকে প্রধানত দুটি কারণে এই আন্তঃপ্রাদেশিক বাণিজ্যের ওপর অশুভ ছায়া নেমে আসে। উত্তর ও দক্ষিণ ভারতের সর্বত্র অনেকগুলি স্বাধীন রাজ্য গড়ে ওঠে। স্বাধীন রাজা ও সুলতানরা আলাদা আলাদাভাবে আন্তঃপ্রাদেশিক বাণিজ্যের ওপর শুল্ক স্থাপন করেছিল। দ্বিতীয়ত সারা ভারতে লুটেরা, ডাকাত ও দস্যুদের উৎপাত আন্তঃপ্রাদেশিক বাণিজ্যের পথে অন্তরায় সৃষ্টি করেছিল। এসব বাধাবিপত্তি সত্ত্বেও এ যুগে বাংলার আন্তঃপ্রাদেশিক বাণিজ্য লাভজনক ও সমৃদ্ধ ছিল বলে জানা যায়।

প্রাক্-পলাশী যুগে বাংলার আন্তর্জাতিক বা বহির্বাণিজ্য আয়তনে বিশাল এবং প্রকৃতিতে বৈচিত্র্যপূর্ণ। বাংলার আর্থ-সামাজিক জীবনে এর প্রভাব অপরিসীম। ইউরোপীয়দের মধ্যে ইংরাজ, ফরাসি, ওলন্দাজ, দিনেমার, বেলজিয়ামের অধিবাসী ও জার্মানদের সঙ্গে বাংলার বাণিজ্য সম্পর্ক ছিল। তাছাড়া পূর্ব ও পশ্চিম এশিয়ার দেশগুলির সঙ্গে বাংলার ভাল বাণিজ্য সম্পর্ক প্রতিষ্ঠিত হয়েছিল। পশ্চিমে আরব, পারস্য, জর্জিয়া, আর্মেনিয়া, ইরাক, সিরিয়া, মিশর এবং কায়রোর মধ্য দিয়ে অটোমান তুর্কী সাম্রাজ্যের প্রধান প্রধান বন্দরের সঙ্গে বাংলার বাণিজ্য সম্পর্ক গড়ে উঠেছিল। পূর্ব এশিয়ায় তার বাণিজ্য প্রসারিত হয়েছিল বাটাভিয়া, সুমাত্রা, মালয়, বর্মা, শ্রীলঙ্কা, থাইল্যাণ্ড, ইন্দোচীন ও চীনের সঙ্গে।[৫] এ যুগে ওলন্দাজদের মোট এশীয় বানিজ্যের এক তৃতীয়াংশ, আর ইংরাজদের মোট এশীয় বাণিজ্যের ষাট শতাংশ বাংলার সঙ্গে।[৬] ডাও লিখেছেন আন্তর্জাতিক বাণিজ্য বাংলার পক্ষে অনুকূল হত (favourable balance of trade); বহির্বাণিজ্যের মাধ্যমে বাংলা

৫। আলেকজাণ্ডার ডাও, ঐ, প্রথম খণ্ড, পৃঃ ১১৪-১১৫।
৬। পি. জে. মার্শাল, 'ঈস্ট ইণ্ডিয়ান ফরচুনস্', পৃঃ ২৯।

প্রচুর পরিমাণে অর্থোপার্জন করত। আন্তঃপ্রাদেশিক ও আন্তর্জাতিক বাণিজ্যে প্রতি বছর লেনদেনের পর বাংলার মোট লাভের পরিমাণ দাঁড়াত এক কোটি ষোল লক্ষ টাকার ওপর। শতকের গোড়ার দিকে আলেকজাণ্ডার হ্যামিলটন হুগলীকে বাংলার সবচেয়ে বড় আমদানী-রপ্তানী বন্দর বলে উল্লেখ করেছিলেন। হুগলী হল বক্স বন্দর—বাংলা সুবায় সম্রাটের সবচেয়ে বড় শুল্ক চৌকি। ১৭২৮ খ্রীষ্টাব্দে হুগলী বন্দরে যে আমদানী-রপ্তানি শুল্ক আদায় করা হয়েছিল তার পরিমাণ দু লক্ষ বিয়াল্লিশ হাজার চৌদ্দ সিক্কা টাকা। এ হিসাবের মধ্যে পাশের নটি গঞ্জের শুল্কও ধরা আছে। পলাশী যুদ্ধের সময় কলকাতা নিঃসন্দেহে বাংলার সবচেয়ে বড় বন্দর। এখানে প্রতি বছর গড়ে ৫০ খানি জাহাজ আন্তর্জাতিক বাজারে বাংলার রপ্তানি ও আমদানি পণ্য পরিবহনে ব্যবহৃত হত। কলকাতার লোকসংখ্যা প্রায় এক লক্ষ। এবং মোট বাণিজ্যের পরিমাণ এক মিলিয়ন পাউণ্ড বা এক কোটি টাকা। গ্রোস লিখেছেন বাংলার আন্তর্জাতিক বাণিজ্যের জন্য প্রতি বছর পঞ্চাশ থেকে ষাটখানা জাহাজ প্রয়োজন হত। এগুলিতে বোঝাই হয়ে বাংলার পণ্য বিদেশে যেত।[৭]

এ যুগে ইউরোপীয়রা ছাড়া বাংলার বহির্বাণিজ্যে বিদেশী বণিকদের মধ্যে আরব, চীনা, তুর্কী, ইরানী, আবিসিনীয়, জর্জীয় ও আর্মেনীয়দের দেখা যায়। লোহিত সাগর ও পারস্য উপসাগরের উপকূলে জেদ্দা (আরব), মোখা (ইয়েমেন), বসরা (ইরাক), গোমব্রুন (পারস্যের বন্দর আব্বাস), পূর্ব এশিয়ায় ইন্দোনেশিয়া, সুমাত্রা, মালয়, আফ্রিকার পূর্বউপকূলে কেনিয়া ও মোজাম্বিকে এরা বাংলার পণ্য নিয়ে যেত। এমন কি ম্যানিলা ও চীনেও এরা বাংলার পণ্য রপ্তানি করত। বাংলা থেকে সংগ্রহ করে নিয়ে যেত বাংলার শিল্পজাত পণ্য, সুতীবস্ত্র, রেশমী বস্ত্র ও কাঁচা রেশম, মসলিন ও আফিম, চাল, চিনি, আদা, হলুদ, লম্বা লংকা প্রভৃতি। এ-সব অঞ্চল থেকে বাংলাদেশে নিয়ে আসত কাঁচা তূলা, লংকা, ফল, ওষুধ, শাঁখা, কড়ি, টিন, তামা, বাদাম, ঘোড়া, গোলাপজল ও সিরাজী মদ। ১৭১৭ খ্রীষ্টাব্দে বাংলা থেকে দুখানা জাহাজে কমপক্ষে পাঁচ'শ টন মাল পারস্যে গিয়েছিল। ১৭৩০ খ্রীষ্টাব্দ থেকে এ অঞ্চলে রাজনৈতিক অশান্তির জন্য লোহিত সাগর ও পারস্য উপসাগরীয় অঞ্চলে বাংলা বাণিজ্যের মন্দা ভাব দেখা দেয়। পারস্য ও ইরাকে রাজনৈতিক সংঘর্ষ ও অস্থিরতা এর প্রধান কারণ। পলাশী পর্যন্ত এ মন্দাভাব

৭। গ্রাস, 'ভয়েজ টু দি ইস্ট ইণ্ডিজ', দ্বিতীয় খণ্ড, পৃঃ ২৩৮।

চলেছিল। ব্রহ্মদেশের সঙ্গেও বাংলার বাণিজ্য ছিল। এদেশ থেকে জাহাজ তৈরির ভাল কাঠ, টিন, চন্দন ও সাপান কাঠ বাংলায় আমদানী করা হত।

অষ্টাদশ শতাব্দীর প্রথমার্ধে বাংলার আন্তর্জাতিক বাণিজ্যে সিংহভাগ তিনটি ইউরোপীয় কোম্পানীর—ইংরাজ, ফরাসি ও ওলন্দাজ। এ যুগে তিনটি কোম্পানীরই বাণিজ্যিক উপনিবেশ ও দুর্গ প্রতিষ্ঠিত। ইংরাজদের কলকাতা ও ফোর্ট উইলিয়ম, ফরাসিদের চন্দননগর ও ফোর্ট অরলিও আর ওলন্দাজদের চুঁচুড়া ও ফোর্ট গুস্তাভাস ইউরোপীয় বণিকদের বাংলা বাণিজ্যের প্রধান ঘাঁটি, এ ছাড়া ঢাকা, কাশিমবাজার মালদা ও রাজমহল, বর্ধমান, মেদিনীপুর ও হুগলীতে এ তিনটি কোম্পানীর ব্যবসা কেন্দ্র বা ফ্যাক্টরি ছিল। বাংলাদেশের অন্যান্য শিল্পাঞ্চলেও এদের কুঠী ছিল। এ দেশের রাষ্ট্রশক্তির সঙ্গেও ইউরোপীয় বণিকদের যোগাযোগ প্রতিষ্ঠিত হয়েছিল। প্রতিটি কোম্পানীর একটি করে নিজস্ব বণিক গোষ্ঠীও গড়ে উঠেছিল। ইউরোপীয় বণিকদের বাণিজ্যিক মূলধনের অভাব হত না। এ দেশের বণিক ও মহাজনদের কাছ থেকে দরকার হলে এরা স্বচ্ছন্দে টাকা ধার নিত। তাছাড়া ছিল জগৎ শেঠ পরিবারের অঢেল টাকা। এদের সুদের হারও খুব চড়া নয়। জগৎ শেঠরা নয় শতাংশ হারে বিদেশী বণিকদের টাকা ধার দিত। বৈদেশিক বাণিজ্যের এই প্রয়োজনীয় আর্থিক দিকগুলি ছাড়াও বাংলায় পাওয়া যেত ইউরোপীয় বাজারের উপযোগী অঢেল সুতীবস্ত্র, মস্‌লিন ও কাঁচা রেশম।

প্রধান তিনটি কোম্পানী ছাড়াও ইউরোপের আরো তিনটি কোম্পানী এ যুগে বাংলার আন্তর্জাতিক বাণিজ্যে ভাগ বসানোর চেষ্টা করেছিল। এরা হল দিনেমার; বেলজিয়ামের অস্টেণ্ড ও জার্মান এমডেন কোম্পানী। ১৭১৪ খ্রীষ্টাব্দ পর্যন্ত দিনেমাররা বাংলাদেশে সামান্য ব্যবসা করেছিল। ঐ বছর বাংলা সরকারের সঙ্গে মনোমালিন্য হেতু দিনেমাররা গোঁদলপাড়ার (চন্দননগর) উপনিবেশ ছেড়ে ট্রাঙ্কুবারে চলে যায়। ১৭১৪ থেকে ১৭৫৫ খ্রীষ্টাব্দ পর্যন্ত বাংলা বাণিজ্যে তাদের অস্তিত্ব চোখে পড়ে না। আলিবর্দীর রাজত্বের শেষ দিকে (১৭৫৫) দিনেমাররা বাংলাদেশে ফিরে এসে হুগলী জেলার শ্রীরামপুরে উপনিবেশ স্থাপন করে ব্যবসা শুরু করে দেয়। অস্টিয়ার সাম্রাজ্যভুক্ত বেলজিয়ামের অস্টেণ্ড কোম্পানী ১৭২৬ খ্রীষ্টাব্দে সম্রাটের অনুমতি নিয়ে ব্যারাকপুরের নিকট বাঁকি-বাজারে তাদের বাণিজ্য কুঠী খুলেছিল। ইংরাজ ও ওলন্দাজরা খুব স্বাভাবিকভাবে এই নতুন ইউরোপীয় প্রতিদ্বন্দ্বীকে প্রথম থেকেই ভাল চোখে দেখেনি। অস্ট্রিয়ার সম্রাটের কাছে এ কোম্পানী বন্ধ করে দেওয়ার জন্য তারা আবেদন করেছিল। শেষে

১৭৩৩ খ্রীষ্টাব্দে নবাব সুজাউদ্দিনের সময় হুগলীর ফৌজদারকে উৎকোচে বশীভূত করে তারা বাংলা থেকে এদের বিতাড়িত করতে সক্ষম হয়েছিল। এ কোম্পানী ইউরোপীয় পণ্য অনেক সস্তায় বাংলায় বিক্রি করত। অভ্যন্তরীণ বাজারে নতুন প্রতিদ্বন্দ্বী এলে তাদের রপ্তানিযোগ্য পণ্যের দাম বাড়তে পারে এই আশঙ্কায় ইংরাজ ও ওলন্দাজরা অস্টেণ্ড কোম্পানীর বিরুদ্ধাচারণ করেছিল। আলিবর্দ্দীর সময়ে প্রাশিয়ার রাজা দ্বিতীয় ফ্রেডারিক এমডেন কোম্পানী করে বাংলায় ব্যবসা করতে চেয়েছিলেন। আলিবর্দ্দী ও ইংরাজরা কেহই বাংলা বাণিজ্যে জার্মান অনুপ্রবেশ পছন্দ করেন নি। জার্মানদের পক্ষে ইংরাজ বিরোধিতা উপেক্ষা করে সে যুগে বাংলায় ব্যবসা চালানো সম্ভবপর ছিল না। তাই জার্মানদের এ প্রচেষ্টা অল্পকাল পরেই পরিত্যক্ত হয়েছিল।

এ যুগে এশীয়রা ছাড়া বাংলার আন্তর্জাতিক বাণিজ্যে রইল মাত্র তিনটি ইউরোপীয় কোম্পানী—ইংরাজ, ফরাসি ও ওলন্দাজ। এ সময়ে ফরাসিদের বাংলা বাণিজ্য তেমন জোরালো নয়। চতুর্দশ লুইয়ের রাজত্বের শেষদিকে স্পেনের উত্তরাধিকার সংক্রান্ত যুদ্ধ ও পরে রিজেন্সি কাউন্সিলের বাংলার বাণিজ্য সম্পর্কে নিঃস্পৃহতা ফরাসি বাণিজ্যকে সমৃদ্ধি দেয়নি। শুধু ডুপ্লের গভর্ণর থাকাকালীন (১৭৩১-১৭৪১) এ বাণিজ্যে কিছুটা প্রাণসঞ্চার হয়েছিল। তাঁর পণ্ডিচেরি গমনের পর ফরাসি বাণিজ্যে আবার মন্দাভাব দেখা দেয়। শতাব্দীর শুরুতে ইউরোপীয়দের মধ্যে ওলন্দাজরা বাংলা বাণিজ্যের প্রধান পক্ষ। বাণিজ্যের বেশিরভাগ তাদের হাতে। এ যুগের শেষ দিকে ওলন্দাজরাও বাংলার আন্তর্জাতিক বাণিজ্যে তেমন আগ্রহী নয়। বাটাভিয়ার মশলার ব্যবসা বেশি লাভজনক হওয়াতে তারা ওদিকে ঝুঁকেছিল। বাংলার বাণিজ্য কোনোমতে চালিয়ে যাচ্ছিল। ঠিক এ সময়ে বাংলা বাণিজ্যের সিংহভাগ ইংরাজদের হাতে চলে যায়।

প্রাক্-পলাশী যুগে ইউরোপীয় কোম্পানীগুলির ব্যবসায়ের ধরণ অনেকটা এক রকম। বিদেশী বণিকরা এদেশীয় ব্যবসাদার ও দালালদের মাধ্যমে পণ্য কেনার আগাম ব্যবস্থা করত। এর নাম 'ইনভেস্টমেন্ট'—অর্থাৎ পণ্য উৎপাদনের আগেই তাতে দাদন বা অগ্রিমের মাধ্যমে কোম্পানীগুলির অধিকার এসে যেত। যারা উৎপাদকদের দাদন দিত তাদের বলা হত দাদ্‌নি ব্যবসায়ী। এরা নির্দ্দিষ্ট দিনে, নির্দিষ্ট দামে ও গুণগত মানে কোম্পানীগুলিকে পণ্য সরবরাহ করতে চুক্তিবদ্ধ থাকত। এজন্য এরা কমিশন পেত এবং কোম্পানীগুলি আগেই পণ্যদামের অর্ধেক এদের আগাম দিত। কোম্পানীগুলির এভাবে পণ্যকেনার ব্যবস্থা

'চুক্তি ব্যবস্থা' বা 'কনট্রাক্ট সিস্টেম' নামে পরিচিত। আমাদের আলোচ্য সময়কালে এ ব্যবস্থায় কিছু কিছু ত্রুটি বিচ্যুতি দেখা দিয়েছিল। কোম্পানীগুলি ঠিক সময় মত পণ্য পেতনা ; পণ্যের নির্দ্দিষ্ট মানও বজায় থাকত না, আর দামও বেশি পড়ত। তাই ইংরাজ কোম্পানী ১৭৫৩ খ্রীষ্টাব্দে বাংলাদেশে পণ্য কেনার নতুন ব্যবস্থা চালু করেছিল। নতুন ব্যবস্থার নাম 'এজেন্সি সিস্টেম'—অর্থাৎ কোম্পানী সরাসরি তার এজেণ্ট ও গোমস্তাদের মাধ্যমে উৎপাদকদের আগাম দেওয়া ও নির্দ্দিষ্ট পণ্য সরবরাহের জন্য চুক্তি করত। কোম্পানী ও উৎপাদকদের মাঝখানে দাদ্নি ব্যবসায়ী ও মহাজন দালালরা রইল না।

এ সময়ে ইংরাজ, ফরাসি ও ওলন্দাজরা বাংলার সঙ্গে একই ধরণের ব্যবসা করত। ইউরোপ থেকে ইংরাজরা প্রধানত সোনা ও রূপো বাংলায় নিয়ে আসত। পলাশীর যুদ্ধ পর্যন্ত তাদের বাংলায় আমদানীকৃত মোট পণ্যের ৭৪ শতাংশ এই দুই ধাতু। এ ছাড়া ইংরাজদের বাংলায় আমদানীকৃত পণ্যের মধ্যে ছিল ব্রড ক্লথ (এক ধরণের সূতী ও পশমের মিশ্র ঝকমকে কাপড়), পশমের কাপড়, দস্তা, সীসা, লোহা, টিন, তামা, পারদ ও অন্যান্য ছোটখাট জিনিস। ইংরাজরা তাদের আমদানীকৃত কাপড় বাংলায় বিক্রি করার এবং এ পণ্যের বাজার তৈরি করার খুব ইচ্ছা ও উৎসাহ দেখিয়েছিল। তবে তাদের আমদানী করা কাপড় বাংলা দেশে বেশি বিক্রি হত না। বছরের পর বছর এগুলি গুদামে পড়ে থাকত।[৮] ইংরাজদের অন্যান্য পণ্যগুলির মধ্যে ধাতু ও ধাতব পণ্যগুলি বাংলার বাজারে ভালো বিক্রি হত। তবে এক্ষেত্রেও ওলন্দাজদের প্রতিদ্বন্দ্বিতার সম্মুখীন হতে হত। তারাও অনুরূপ পণ্য বাংলাদেশে বিক্রির জন্য আনত। বাংলার আন্তর্জাতিক বাণিজ্যে ফরাসিরা নয় ওলন্দাজরাই এ যুগে ইংরাজদের প্রধান প্রতিদ্বন্দ্বী। রপ্তানি বাণিজ্যের লাভ আমদানী বাণিজ্যের লোকসান পুষিয়ে দিত। এ সময় ইংরাজরা বাংলা থেকে সূতীবস্ত্র, রেশমী বস্ত্র, কাঁচা রেশম, মস্লিন ও সোরা ইংলণ্ড ও ইউরোপীয় বাজারের জন্য সংগ্রহ করত। ১৭০০ ও ১৭২০ খ্রীষ্টাব্দে ইংরাজরা নিজেদের পশম ও রেশমবস্ত্র শিল্পকে রক্ষার জন্য বাংলা তথা ভারতের সূতী ও রেশমবস্ত্রের আমদানী অনেকখানি নিয়ন্ত্রণ করেছিল। ভারতীয় বস্ত্রের ওপর উচ্চহারে আমদানী শুল্ক ধার্য্য করা হয়েছিল। তবে ইউরোপের বাজারে বাংলার সূতী ও রেশম বস্ত্রের চাহিদা থাকাতে বাংলার বস্ত্রশিল্পের ওপর ব্রিটিশ সংরক্ষণ নীতির প্রভাব তেমন

৮। লেটার টু দি কোর্ট, ৮ই ডিসেম্বর, ১৭৫৫।

ক্ষতিকর হয়নি। এ সময়ে ইংরাজ কোম্পানী বাংলা থেকে কাঁচা রেশম কিনতে থাকে। ক্রমশ এর পরিমাণ বেড়ে ১৭৩৪ সনে দু লক্ষ ন হাজার একশ ছেষট্টী পাউণ্ড হয়েছিল। ১৭৫১-১৭৫৭ সময়কালে নেমে এসে বাষিক চল্লিশ থেকে আশি হাজার পাউণ্ডে দাঁড়ায়।[৯] কোম্পানী বাংলা থেকে যে আফিম সংগ্রহ করত তা চীন, জাভা ও মালয়দ্বীপপুঞ্জে পাঠাত। সব মিলিয়ে এ সময়ে ইংরাজরা বাংলায় যে বাণিজ্য করত তার বাষিক গড় পরিমাণ দাঁড়াত প্রায় তিন লক্ষ পাউণ্ড বা চব্বিশ লক্ষ টাকা।[১০] ১৭০৮ থেকে ১৭৫৬ খ্রীষ্টাব্দের মধ্যে ইংরাজরা বাংলাদেশে মোট ৬৪, ০৬, ০২৩ পাউণ্ড দামের সোনা রূপো এবং ২২, ৮৩, ৮৪৩ পাউণ্ডের বাণিজ্য পণ্য এনেছিল। ১৭০০ খ্রীষ্টাব্দে রপ্তানি বাণিজ্যের পরিমাণ ১৮, ৯৬, ৯৬৮ টাকা (২,৩৭, ১২১ পাউণ্ড) ; ১৭১৫ খ্রীষ্টাব্দে রপ্তানি বাণিজ্যের পরিমাণ বেড়ে গিয়ে দাঁড়াল ৩২, ৯২, ০৪০ (৩, ৩০, ৯৩৮ পাউণ্ড) টাকায়। প্রাক্-পলাশী যুগে ১৭৪২ খ্রীষ্টাব্দে কোম্পানী বাংলাদেশে সবচেয়ে বেশি বাণিজ্য করেছিল।[১১] ঐ বছর মোট রপ্তানি বাণিজ্যের পরিমাণ ৪৪, ৮৩, ১৬০ টাকা (৫, ৬০, ৩৯৫ পাউণ্ড)। এ সময়ে কোম্পানীর শেয়ার মালিকরা ৫ শতাংশ থেকে ১০ শতাংশ হারে লভ্যাংশ পেয়েছিল।

এযুগে বাংলার আন্তর্জাতিক বাণিজ্যে ইংরাজদের সবচেয়ে বড় প্রতিদ্বন্দ্বী ওলন্দাজরা। শতাব্দীর প্রথম দিকে ওলন্দাজ বাণিজ্যের পরিমাণ ইংরাজদের থেকে কিছুটা বেশিই ছিল। বাংলার সমস্ত প্রধান প্রধান শিল্প ও ব্যবসা কেন্দ্রে তাদের কুঠী ছিল। এ সকল স্থানে ইংরাজদের সঙ্গে প্রতিদ্বন্দ্বিতায় তারা পণ্য কিনত। বাংলাদেশে তাদের বাণিজ্যিক ধরণও (pattern) ইংরাজদের মত। ইংরাজদের মত তারা ইউরোপ থেকে সোনা ও রূপো আনত। সঙ্গে থাকত মর কাপড়। তবে বাংলা বাণিজ্যের প্রয়োজনীয় মূলধনের সবটাই ইউরোপ থেকে আসত না। ওলন্দাজরা জাপান থেকে তামা, মালয় দ্বীপপুঞ্জ থেকে টিন ও দস্তা এবং ওলন্দাজ পূর্ব ভারতীয় দ্বীপপুঞ্জ থেকে লংকা, লবঙ্গ, জৈত্রী, জায়ফল

৯। এ হিসাব বড় পাউণ্ডে (২৪ আঃ), ছোট পাউণ্ড ১৬ আঃ। কোম্পানী বড় পাউণ্ডে কাঁচা রেশম কিনত। তালিকা দেখুন।

১০। পাউণ্ডের সঙ্গে টাকার বিনিময় হার ১ পাঃ -৮ টাকা ধরে। এযুগে পাউণ্ডের সঙ্গে টাকার বিনিময় হারে মাঝে মাঝে পরিবর্তন দেখা যায়। তবে ৮ থেকে ৯ টাকার মধ্যে ওঠানামা হত।

১১। কোম্পানীর বাংলা থেকে রপ্তানি বাণিজ্যের তালিকা দেখুন। জে. সি. সিংহ 'ইকনমিক অ্যানালস্ অব বেঙ্গল', পৃঃ ৪৮, ৫৪।

প্রভৃতি বাংলায় নিয়ে আসত। এগুলি বাংলায় বিক্রি করে রপ্তানি পণ্যের পুঁজি সংগ্রহ করা হত। ওলন্দাজরা বাংলার পণ্য সম্ভার নিয়ে যেত ভারতের অন্যান্য অঞ্চলে, পূর্ব ভারতীয় দ্বীপপুঞ্জে এবং ইউরোপীয় বাজারে। এ বাণিজ্যে প্রধান পণ্য হল সূত্রীবস্ত্র, রেশম ও আফিম। হল্যাণ্ডে নিয়ে যেত সূতীবস্ত্র, রেশম বস্ত্র, কাঁচা রেশম ও সোরা।

১৭৩১ খ্রীষ্টাব্দে ডুপ্লে চন্দননগরে ফরাসি উপনিবেশের গভর্ণর হয়ে এলেন। তাঁর আগে বাংলাদেশে ফরাসীদের বাণিজ্য খুব সামান্য ছিল। শতকের গোড়ার দিকে ইংরাজ বণিক আলেকজাণ্ডার হ্যামিলটন হুগলীতে এসেছিলেন। তিনি জানিয়েছেন চন্দননগরে ফরাসিদের একটি সুন্দর ছোট চার্চ আছে। বাংলাদেশে তাদের প্রধান কাজ হল চার্চে সমবেত হয়ে প্রার্থনা করা। ডুপ্লে আসার আগে মাত্র ৬ খানি দেশী নৌকা ফরাসিদের পণ্য বহন করত। মাঝে মাঝে তাদেরও কাজ থাকত না। ডুপ্লে গভর্ণর হয়ে আসার পর বাংলাদেশে ফরাসি বাণিজ্যের অভূতপূর্ব উন্নতি ঘটতে দেখা যায়। ৩০ থেকে ৪০ খানি জাহাজ ফরাসি বাণিজ্য পণ্য বহন করার জন্য দরকার হল। চন্দননগরের ইন্দ্রনারায়ণ চৌধুরী ও আর্মেনীয় বণিক খাজা ওয়াজেদের মাধ্যমে পণ্য কেনার ব্যবস্থা হল। ডুপ্লে দেশের অভ্যন্তরে বিভিন্ন স্থানে আরো অনেক বাণিজ্য কুঠী স্থাপন করলেন। ১৭৪১ খ্রীষ্টাব্দে ডুপ্লে যখন গভর্ণর জেনারেল হয়ে পণ্ডিচেরিতে গেলেন তখন বাংলাদেশে ৭২ খানা জাহাজ ফরাসী বাণিজ্য পণ্য বহন করত। বাংলার পণ্য তিনি সুরাট, জেদ্দা, মোখা, বসরা এবং চীন দেশে পাঠিয়েছিলেন। এমনকি তিব্বতের সঙ্গে তিনি বাণিজ্যিক সম্পর্ক স্থাপন করেছিলেন।[১২] ইংরাজ ও ওলন্দাজদের মত ফরাসিরা ইউরোপের জন্য বাংলার সূতীবস্ত্র, রেশমীবস্ত্র, রেশম এবং বিহারের সোরা কিনত। এশীয় দেশগুলির জন্য, এগুলি ছাড়া, ফরাসিরা বাংলা থেকে সংগ্রহ করত চিনি, আফিম, লাক্ষা, চাল, কড়ি প্রভৃতি।

ডুপ্লের পর ফরাসি বাণিজ্যে আবার মন্দা দেখা গেল। এর কারণ প্রধানত দুটি। বাংলা বাণিজ্যের জন্য ফরাসিদের যথেষ্ট মূলধন ছিল না। এ যুগে বাণিজ্যিক পুঁজির অভাব তাদের নিত্যসঙ্গী। দ্বিতীয়ত, চন্দননগরে ডুপ্লের উত্তরাধিকারীদের মধ্যে বাণিজ্যিক কাজকর্মে উৎসাহের অভাব লক্ষ্য করা যায়। ইউরোপে ইংরাজ ও ফরাসীদের মধ্যে ঘন ঘন লড়াই ফরাসি বাণিজ্যে মন্দার অন্যতম কারণ। তবে ১৭৪১ থেকে ১৭৫৩ খ্রীষ্টাব্দ পর্যন্ত ফরাসি বাণিজ্যের

১২। ক্যালকাটা রিভিয়্যু, ১৮৬৬, পৃঃ ১০২-১০৩।

পরিমাণ নেহাত মন্দ নয়। ১৭৫৩, ১৭৫৪ খ্রীষ্টাব্দ থেকে ফরাসি বাণিজ্যের দ্রুত অধোগতি শুরু হয়। চুঁচুড়ার ওলন্দাজ বণিকদের একখানি চিঠিতে ঐ তথ্য জানা যায়। ইউরোপে ইংরাজ ও ফরাসিদের মধ্যে সপ্তবর্ষ ব্যাপী যুদ্ধ (১৭৫৬-১৭৬৩) শুরু হলে বাংলাদেশে ফরাসী বাণিজ্যের ভরাডুবি হল বলা চলে। ঐ যুদ্ধের সূত্রধরে ক্লাইভ ১৭৫৭ খ্রীষ্টাব্দের ২৩শে মার্চ চন্দননগর দখল করে নিলেন।

এ যুগে বাংলা সরকারের সঙ্গে ইউরোপীয় কোম্পনীগুলির সম্পর্কে কোনো বড়রকমের জটিলতা দেখা যায় না। মুর্শিদকুলী থেকে সিরাজুদ্দৌলা পর্যন্ত বাংলার নবাবরা ইউরোপীয় বণিকদের সম্পর্কে যে রাষ্ট্রনীতি অনুসরণ করেছিলেন তা পরিষ্কার বোঝা যায়। এ নীতির উল্লেখযোগ্য বৈশিষ্ট্যগুলি হল, (১) বহির্বাণিজ্য দেশের সমৃদ্ধি আনে—সুতরাং এ বাণিজ্যকে উৎসাহ দিতে হবে; (২) বিদেশী বণিকদের রাজনৈতিক ও সামরিক ক্ষমতাবৃদ্ধি ও তৎপরতা সহ্য করা হবে না; সঙ্গত কারণে ইউরোপীয় কোম্পানীগুলির আঞ্চলিক সীমানা বৃদ্ধি তারা পছন্দ করতেন না; (৩) বাংলার নবাবরা চাইতেন আর্মেনীয়দের মত শুধু বণিক হিসাবে ইউরোপীয়রা বাংলায় বাণিজ্য করুক; (৪) সম্রাটের কাছ থেকে পাওয়া বাণিজ্যিক সুযোগ সুবিধা ইউরোপীয়রা ভোগ করুক তবে তারা যেন কোনো অবৈধ সুযোগ না নেয়। বাংলার আর্থিক ক্ষতি হতে পারে এমন কোনো সম্রাট প্রদত্ত বাণিজ্যিক সুযোগ সুবিধায় নবাবরা সরাসরি বাধা না দিয়ে এড়িয়ে গেছেন। মুঘল কেন্দ্রিয় শক্তির দ্রুত অধঃপতনের পরিপ্রেক্ষিতে বাংলার নবাবদের ইউরোপীয় বণিকদের সম্পর্কে অনুসৃত নীতিকে অন্যায় বা অসঙ্গত বলা যায় না।

এ যুগে ফরাসি ও ওলন্দাজরা মুঘল সম্রাটদের কাছে আবেদন নিবেদন করে বাণিজ্য শুল্কের হার ৩½ শতাংশ থেকে কমিয়ে ২½ শতাংশ করে নিয়েছিল। ইংরাজরা সম্রাট ফারুখসিয়ারের কাছ থেকে ১৭১৬ খ্রীষ্টাব্দের ৩০শে ডিসেম্বর এক ফারমান বা বাদশাহী আদেশ আদায় করে বাংলায় বিনাশুল্কে বাণিজ্যের অধিকার লাভ করেছিল। বাৎসরিক মাত্র তিন হাজার টাকার বিনিময়ে এ অধিকার। মুঘল সম্রাটরা আমদানী রপ্তানি বাণিজ্যের জন্য ইউরোপীয়দের এ অধিকারগুলি দিয়েছিলেন। ইউরোপীয় কোম্পানীগুলির কর্মচারীরা সকলেই বাংলার অভ্যন্তরীণ ও আন্তঃপ্রাদেশিক বাণিজ্যে অংশ নিত। এজন্য তারা কোম্পানীর অধিকার তাদের ব্যক্তিগত ব্যবসায়ে কাজে লাগাত। এদেশীয় বণিকদের কাছে

কোম্পানীর 'দস্তক' বিক্রি করা, নিত্য প্রয়োজনীয় জিনিসে ব্যবসা করা, সরকারের শুল্ক ফাঁকি দেওয়া প্রভৃতি সমস্যা নিয়ে মাঝে মাঝে বিরোধের সৃষ্টি হত। ১৭২৭ ও ১৭৪১ খ্রীষ্টাব্দে লবণের ব্যবসা নিয়ে বাংলা সরকারের সঙ্গে ইংরাজ কোম্পানীর কর্মচারীদের বিরোধ দেখা দেয়। এ সময়ে ইউরোপীয় কোম্পানীগুলির কর্মচারীদের ব্যক্তিগত ব্যবসা নিয়ে বাংলার নবাবদের সঙ্গে কোম্পানীগুলির বিরোধ লেগেই থাকত। এ ব্যবসা থেকে বাংলা দুরকমে ক্ষতিগ্রস্থ হত। সরকার অভ্যন্তরীণ বাণিজ্য শুল্ক থেকে বঞ্চিত হত আর এদেশীয় বণিকরা আভ্যন্তরীণ বাজারে অসম প্রতিদ্বন্দ্বিতার সম্মুখীন হত। ইউরোপীয়দের জলদস্যুবৃত্তি, নবাবের পলাতক কর্মচারীদের আশ্রয়দান, শুল্ক ফাঁকি, উপনিবেশ-গুলির বকেয়া রাজস্ব, এদেশীয় বণিক ও মহাজনদের লেনদেন নিয়ে বিরোধ বাংলার নবাবদের সঙ্গে ইউরোপীয় বণিকদের সম্পর্ক তিক্ত করে তুলত। বাংলার রাজকর্মচারীদের উৎকোচ গ্রহণ মনোবৃত্তি ও বাড়তি লাভের আশা এতে ইন্ধন জোগাত।

১৭৪০ খ্রীষ্টাব্দে কলকাতায় আগত ও প্রত্যাবৃত্ত ইংরাজ, ফরাসি ও ওলন্দাজদের জাহাজের সংখ্যা থেকে তাদের বাণিজ্যের পরিমাণ সম্পর্কে ধারণা করা যেতে পারে।

মাস	ইংরাজ	ফরাসি	ওলন্দাজ	মুর/অন্যান্য	ইংরাজ,	ফরাসি,	ওলন্দাজ	মুর/ত
জানুয়ারী	১	১	০	০	১১	৩	০	৯
ফেব্রুয়ারী	৪	০	০	০	৯	১	০	০
মার্চ	৬	০	১	০	৩	০	০	০
এপ্রিল	২	০	১	০	০	০	০	০
মে	৬	২	০	২	০	০	০	০
জুন	৭	০	০	৪	০	০	০	০
জুলাই	২	৫	০	০	২	২	২	০
আগষ্ট	৩	৪	০	৫	৩	০	০	০
সেপ্টেম্বর	৫	২	০	০	৩	১	০	০
অক্টোবর	৪	৩	০	১	২	১	০	০
নভেম্বর	২	৩	০	০	৫	৮	০	৩
ডিসেম্বর	-	—	—	—	—	—	—	—
	৪২	২০	২	১২	৩৮	১৬	২	১২

সূত্র ঃ কনসালটেশনস্, ১৪শ খণ্ড। সুকুমার ভট্টাচার্য্য, 'দি ঈস্ট ইণ্ডিয়া কোম্পানী এণ্ড দি ইকনমি অব বেঙ্গল', পৃঃ ৭৮।

(রাস্তাঘাট, যানবাহন ও যোগাযোগ ব্যবস্থার সঙ্গে একটি দেশের অর্থনীতি, কৃষি, শিল্প, বাজার, ধনোৎপাদন ব্যবস্থা এবং অন্যান্য সামাজিক ও আর্থিক কাজ-কর্ম ঘনিষ্ঠভাবে যুক্ত থাকে।[১৩] অন্যভাবে বলতে গেলে একটি দেশের অর্থনৈতিক অবস্থা সে দেশের পথঘাট, যানবাহন ও যোগাযোগ ব্যবস্থার ওপর অনেকখানি নির্ভরশীল।) ভ্যালেন্টিনের গ্রন্থে প্রকাশিত ভ্যানডেনব্রুকের মানচিত্রে[১৪] তৎকালীন বাংলার অনেকগুলি গুরুত্বপূর্ণ রাস্তা বা সড়কের উল্লেখ দেখা যায়। এ যুগে বাংলার সর্বত্র অনেকগুলি বড় বড় রাস্তা, নদীপথ এবং যোগাযোগ ব্যবস্থা সমগ্র বাংলাকে যুক্ত করে আর্থিক কর্মকাণ্ডের সহায়ক অবস্থার সৃষ্টি করেছিল। বাংলার প্রধান তিনটি কর্মকেন্দ্র হল—কলকাতা, মুর্শিদাবাদ ও ঢাকা। এগুলির সঙ্গে উত্তরে নেপাল ও ভূটান, দক্ষিণে উড়িষ্যার গঞ্জাম জেলা, দক্ষিণ পশ্চিমে সিংভূম, পালামৌ ও ছোটনাগপুর, পশ্চিমে কাশী ও গাজীপুর, উত্তর পশ্চিমে বিহারের বাতিয়া, উত্তর পূর্বে শ্রীহট্ট, জয়ন্তিয়া এবং খাসপুর এবং দক্ষিণ পূর্বে চট্টগ্রাম, রাজঘাট এবং জুলকুদ্দার সংযোগ ছিল। অনেক কম গুরুত্ব-পূর্ণ ও অপ্রধান স্থানের সঙ্গেও ভাল যোগাযোগ ছিল। বর্ধমান এ সময়ে তেমন গুরুত্বপূর্ণ স্থান নয়। তবুও এর সঙ্গে দেশের বিভিন্ন অঞ্চলের ভাল ভাল সড়ক যোগাযোগ দেখা যায়। বর্ধমান থেকে দুটি প্রধান সড়ক চন্দননগর হয়ে কলকাতা পর্যন্ত গিয়েছিল। এর মধ্যে একটি শেরশাহ নির্মিত বিখ্যাত গ্রাণ্ড ট্রাঙ্ক রোড। এখান থেকে অনেকগুলি রাস্তা ধনিয়াখালি, তমলুক, বজবজ, নদীয়া, জলঙ্গী, রাজমহল, রাধানগর, চন্দ্রকোনা এবং গঙ্গা ও ভাগীরথীর সঙ্গমস্থল ফারুকাবাদ পর্যন্ত যোগাযোগ গড়ে তুলেছিল। বর্ধমান থেকে মেদিনীপুর পর্যন্ত প্রসারিত রাস্তাটি বাদশাহী সড়ক নামে পরিচিত। বাংলার নবাবদের সৈন্য-বাহিনী এ পথে উড়িষ্যায় যাতায়াত করত। তেমনি কাশিমবাজারের সঙ্গে একাধিক স্থানের ভাল যোগাযোগ গড়ে উঠেছিল। কাশিমবাজার থেকে পাটনা পর্যন্ত একটি দীর্ঘ রাস্তার উল্লেখ পাওয়া যায়। এ ছাড়া কাশিমবাজার থেকে অনেকগুলি রাস্তা বর্ধমান, জলঙ্গী, ঢাকা, রামপুর বোয়ালিয়া, মীনখোত, দিনাজপুর, বালিটুঙ্খি, বীরভূম, মালদা, রঙ্গপুর-রাঙামাটি-গোয়ালপাড়া,

১৩। ডব্লিউ. টি. জ্যাকম্যান, 'ডেভেলপমেন্ট অব ট্রান্সপোর্টেশন ইন ইংল্যান্ড', লন্ডন, ১৯৬২, ভূমিকা।

১৪। এই মানচিত্র ১৬৬০ খ্রীষ্টাব্দে তৈরি হয়েছিল।

বীরাকিটি, কান্দি ও সুরুলের (বোলপুর) দিকে গিয়েছিল।[১৫] বিভিন্ন জেলার মধ্যে যোগাযোগ রক্ষাকারী রাস্তা ছাড়াও জেলার মধ্যে পরিবহন ও যোগাযোগের অনেক রাস্তা ছিল। এ যুগে বীরভূম জেলার মধ্যে এরকম অনেকগুলি সড়কের উল্লেখ দেখা যায়। এগুলির মধ্যে প্রধান হল নাগর থেকে দেওঘর, কুমিরাবাদ এবং মালুতি এবং নাগর থেকে মরাগ্রাম রাস্তা। নাগর থেকে তিনটি রাস্তা বেরিয়ে সিউড়ীতে শেষ হয়েছিল। এখান থেকে কৃষ্ণনগর, ইলামবাজার, উখাড়া, পাঁচেট (রাণীগঞ্জ) ও সুপুর পর্যন্ত রাস্তা ছিল। সিউড়ী থেকে গোমী, বাহ্যারি, সুরুল, মুপুর কর্ণগড় ও লাখনপুর পর্যন্ত রাস্তা গিয়েছিল। এছাড়া অনেক ছোট বড় রাস্তা বীরভূম জেলার মধ্যে ভাল যোগাযোগ ও পরিবহন ব্যবস্থা গড়ে তুলেছিল।

বড় বড় শহর কলকাতা, মুর্শিদাবাদ, হুগলী, বর্ধমান ঢাকার মধ্যে একাধিক প্রশস্ত রাজপথ যোগাযোগ স্থাপন করেছিল। এ রাস্তাগুলি সব ঋতুতে ব্যবহার করা যেত। বর্ষাকালেও এগুলি ব্যবহার করায় তেমন অসুবিধা হত না। কলকাতা থেকে সাঁওতাল পরগণার পাচওয়ারি ও পাঁকুড় পর্যন্ত রাস্তা গিয়েছিল। খুব স্বাভাবিকভামে পশ্চিমবঙ্গের মত পূর্ব ও উত্তরবঙ্গে এত ভাল রাস্তা বা সড়ক ছিল না। অসংখ্য নদী ও নালা, পদ্মা ও ব্রহ্মপুত্রের শাখা প্রশাখা বাংলার এ অঞ্চলকে জালের মত ঘিরে রেখেছে। এ রকম প্রাকৃতিক অবস্থান সত্বেও পূর্ব-বঙ্গের রাজনৈতিক ও বাণিজ্যিক দিক দিয়ে গুরুত্বপূর্ণ স্থানগুলির মধ্যে সড়ক যোগাযোগ ছিল। কলকাতা থেকে বেরিয়ে দুটি রাস্তা ঢাকা এবং আরো দুটি সড়ক বাখরগঞ্জ পর্যন্ত গিয়েছিল। কলকাতা থেকে দুটি রাস্তা চট্টগ্রাম এবং একটি রাস্তা ঢাকা হয়ে শ্রীহট্ট পর্যন্ত প্রসারিত ছিল।[১৬] মেঘনা নদীর পূর্ব দিকের অঞ্চলগুলিতে রাস্তার অবস্থা ভাল ছিল বলে মনে হয় না। রেনেল লিখেছেন লখিপুর (নোয়াখালি) থেকে চন্দরগঞ্জ পর্যন্ত রাস্তাগুলি অনেক জায়গায় ভাঙ্গা, আর চন্দরগঞ্জ থেকে কালিন্দা পর্যন্ত অঞ্চল নীচু বলে রাস্তা প্রায়ই খারাপ হয়ে পড়ে থাকত।[১৭] কালিন্দা থেকে ফেণী পর্যন্ত রাস্তাগুলির অবস্থা আরো খারাপ ছিল। ফেণী নদী থেকে চট্টগ্রাম পর্যন্ত রাস্তাগুলির মাঝে মাঝে নালা

১৫। জে. রেনেল, 'জার্নালস্', বেঙ্গল পাস্ট এণ্ড প্রেজেণ্ট, ১৯২৪, ২৮ খণ্ড, পৃঃ ১৯২।

১৬। রেনেল, 'ডেসক্রিপসন অব রোডস্ ইন বেঙ্গল এণ্ড বিহার', পৃঃ ৫, ৩৭-৩৮।

১৭। রেনেল, 'জার্নালস্', পৃঃ ৭৫-৭৬।

দেখা যেত। বেশির ভাগ নালার ওপর সেতু না থাকাতে বর্ষাকালে এগুলি পার হওয়া দুঃসাধ্য হত। বলাবাহুল্য, এ যুগে বাংলাদেশে কোন রাস্তা পাকা নয়। সবই মাটির কাঁচা রাস্তা।

অষ্টাদশ শতাব্দীর মধ্যভাগ পর্যন্ত কলকাতা থেকে উত্তর ভারতে যাওয়ার ভাল রাস্তা ছিল না। মুর্শিদাবাদ থেকে তেলিয়াগড়ি হয়ে পাটনা পর্যন্ত রাস্তা ছিল। সাঁওতাল পরগণা ও বীরভূমের পশ্চিমদিকে ছোট ছোট আধা স্বাধীন সামন্ত প্রধানরা কলকাতা ও উত্তর ভারতের মধ্যে যোগাযোগের পথে প্রধান অন্তরায় হয়ে দাঁড়িয়েছিল। কলকাতা থেকে এ অঞ্চল পর্যন্ত যে রাস্তাগুলি দেখা যায় তার মধ্যে কলকাতা থেকে ছোটনাগপুরের জুনো, কুণ্ডা ও পালামৌ রাস্তা, পাচেট পর্যন্ত দুটি রাস্তা এবং সিংভূম বরাবর চারটি রাস্তার খবর আছে রেনেলের গ্রন্থে।[১৮]

গঙ্গা ও ব্রহ্মপুত্র তাদের অসংখ্য শাখা প্রশাখা নিয়ে সারা বাংলাদেশে, বিশেষ করে পূর্ব ও উত্তরবঙ্গে, নদী পরিবহন ও যোগাযোগের প্রশস্ত ব্যবস্থা করে রেখেছিল। ডাও লিখেছেন: 'এখানে প্রতিটি গ্রামের জন্য একটি খাল, প্রত্যেক পরগণায় নদী, সমস্ত দেশের জন্য গঙ্গা যে বিভিন্ন ধারায় সাগরে পড়ে শিল্প পণ্যের রপ্তানি বাণিজ্যের দুয়ার উন্মুক্ত রেখেছে।[১৯] বর্ধমান, বীরভূম ও তৎসন্নিহিত অঞ্চলগুলি ছাড়া সারাবাংলাদেশে সর্বত্র নদী পরিবহনের ব্যবস্থা বেশ ভাল ছিল। রেনেল লিখেছেন এমনকি গরমের দিনেও বাংলাদেশের যে কোনো স্থান থেকে মাত্র পঁচিশ মাইল দূরত্বের মধ্যে নদী পরিবহনের ব্যবস্থা করা সম্ভব হত। বাংলাদেশে সাধারণভাবে আট মাইলের মধ্যে নদী পথ মিলে যায়। এই নদী পরিবহনে কর্মরত থাকত বাংলার ত্রিশ হাজার মানুষ।[২০] বাংলার জলপথে এ দেশের এককোটি মানুষের খাদ্য ও লবণ পরিবাহিত হত। বছরে দু মিলিয়ন পাইণ্ড মূল্যের (এক কোটি ষাট লক্ষ টাকা) আমদানী-রপ্তানি পণ্য নদীপথে পরিবহন করা হত। তাছাড়া অভ্যন্তরীণ শিল্প পণ্য, কৃষিকর্মে উৎপন্ন ফসল, বাংলার মাছ ও অন্যান্য পণ্য এ পথে চলাচল করত। এ যুগে নদী পরিবহনে অবশ্য অনেক সময় লেগে যেত। ১৭৫৫ খ্রীষ্টাব্দের ৮ই ডিসেম্বর ডিরেক্টর সভাকে লেখা কলকাতা কাউন্সিলের একখানি চিঠিতে দেখা যায় মালদা থেকে কলকাতায় কাপড়ের বেল আনতে সময় লাগত ৪৫ থেকে ৫০ দিন।

১৮। রেনেল, 'ডেসক্রিপসন…', পৃঃ ৪০-৭১।
১৯। আলেকজান্ডার ডাও, 'হিন্দুস্থান', প্রথম খণ্ড, পৃঃ ১০২।
২০। রেনেল, 'মেমোয়ার অব এ ম্যাপ অব হিন্দুস্থানে' (পৃঃ ৩৩৫)—এ তথ্য দিয়েছেন, হ্যামিলটন উনিশ শতকের প্রথমে বাংলার নদীপরিবহনে এর দশগুণ লোককে নিযুক্ত দেখেছিলেন।

ইংলিশ ঈস্ট ইন্ডিয়া কোম্পানীর বাংলা থেকে রপ্তানি বাণিজ্যের পরিমাণ, ১৭০০-১৭৫৭।

বৎসর	মোট রপ্তানি বাণিজ্য (টাকায়)	বৎসর	মোট রপ্তানি বাণিজ্য (টাকায়)
১৭০০	১৮,৯৬ ৯৬৮	১৭২৯	৩৬,২১,১২০
১৭০১	১৯.৯২.৯৭৬	১৭৩০	৩৬.৫২,৬৪৮
১৭০২	১৯,৭০,০৬৪	১৭৩১	৩৮ ৪০.৭২০
১৭০৩	৫,২১.৬৪৮	১৭৩২	৩৭.৬২,৭২০
১৭০৪	৯৬.১৯২	১৭৩৩	২৮ ৯৮.৭১২
১৭০৫	৫.২৭,১৪৪	১৭৩৪	৩৪.৩১ ৪৫৬
১৭০৬	৫,৯৮.৬১৬	১৭৩৫	৩২ ০৭ ৯০৪
১৭০৭	৭,৮৩,০৪৮	১৭৩৬	৩২.৬৮ ৪০৮
১৭০৮	৪.৮১ ৩৬০	১৭৩৭	২৪,০৫ ৩৬৮
১৭০৯	৮ ৪১.৭৭৬	১৭৩৮	৩৩ ০২.৪৪০
১৭১০	১৩.৯০.৫৫২	১৭৩৯	৩৬,০০,১৫২
১৭১১	২১.৭৫.৩৩৬	১৭৪০	৩২.০৯.৩০৪
১৭১২	১৮,০১,২৩২	১৭৪১	৩৯.১৯ ১১২
১৭১৩	১৮,৭৩,৮৪৮	১৭৪২	৪৪ ৮৩ ১৬০
১৭১৪	১৩,৯৬ ৮৪০	১৭৪৩	৩৮,০২,২৪৮
১৭১৫	১২,৯০ ৮৭২	১৭৪৪	৩৬,১৬ ৫৪৪
১৭১৬	১৭,২৮,১৮৪	১৭৪৫	৩৫ ৯৩ ২১৬
১৭১৭	১৬,৭৬,৩৮৪	১৭৪৬	৩৯ ৩৫ ৯৪০
১৭১৮	১৮,৮৭,৯৭৬	১৭৪৭	৩৬.৮৫ ৫২০
১৭১৯	২০,৩০,৯৪৪	১৭৪৮	৩০,৩৪,৭৩৬
১৭২০	২৬,৬২,৩৩৬	১৭৪৯	২৬.৪২,৮৮০
১৭২১	২৩,৯৯,২২৪	১৭৫০	৪০.৮৯,৪১৬
১৭২২	৮,১৩.৮২৪	১৭৫১	৩৮,৮৮.০৯৬
১৭২৩	১৭,৪৬,০৯৬	১৭৫২	২৬ ৮৬,৩৬৮
১৭২৪	১৮ ০৯,৫৬০	১৭৫৩	৩০,০৩,৫৯২
১৭২৫	১৫.২৮,৯৩৬	১৭৫৪	২৫.৯৫,৩৫৬
১৭২৬	২৭.৩১,৭৯২	১৭৫৫	৩২.৯২,০৪০
১৭২৭	৪১,০৫,৯৯২	১৭৫৬	২৬,৪৭,৫০৪
১৭২৮	৩২,৯৪.১০৪	১৭৫৭	৫,৫৩,৭৫২

সূত্র : কে. এন. চৌধুরী, 'দি ট্রেডিং ওয়ার্ল্ড' অব এশিয়া এন্ড দি ইংলিশ ইস্ট ইন্ডিয়া কোম্পানী, পৃ : ৫০৯-৫১০

ইংলিশ ঈস্ট ইন্ডিয়া কোম্পানীর বাংলা থেকে রপ্তানি বাণিজ্য ঃ

১৭০৭-১৭৫৭

পণ্য বস্ত্র

বৎসর	পরিমাণ, খণ্ড	দাম টাকায়	বৎসর	পরিমাণ, খণ্ড	দাম টাকায়
১৭০০	২,৭৪,৫৪১	১৪.৫১ ৯৯২	১৭৩০	৫.২৮.০৪৯	২৯,৩৩.৩৯২
১৭০১	২,৪৭,৭০৪	১২.০৯.৬৪০	১৭৩১	৬,১৩,৭০০	৩৩,৩৩.৬৯৬
১৭০২	২,১৩.৩০৭	১৩.২৪ ১৬৮	১৭৩২	৬ ২২ ০৫৮	২৯ ১৩ ২৩২
১৭০৩	৫২.৪৯৪	২.৯৮.১৬০	১৭৩৩	৫.৩০,২৮১	১৯ ৯৩ ৮১৬
১৭০৫	৩৬.৩১১	২,১২,৩২০	১৭৩৪	৬.২৪ ৪৪৭	২৫.৩০ ৮৮৮
১৭০৬	৭৮,২৯৬	৪.০৭.৮৭২	১৭৩৫	৬,৩৭ ৬৪৬	২৪ ৮১ ০৭২
১৭০৭	৬৬,১৮৪	৩.৪১.৯৩৬	১৭৩৬	৫ ৯৩,৩৭২	২৬ ০০.২৫৬
১৭০৮	৫৬,১৭৪	২.৯৬.১৬৮	১৭৩৭	৪,৩৯ ৯৫৬	১৬,৬৬,০৩২
১৭০৯	১.১৬.০০৫	৬,১৪.২৭২	১৭৩৮	৫.৬০,৩৮১	২৫.৩৩ ৯১২
১৭১০	২,২৩,৮১২	১০.৪৩.৬২৪	১৭৩৯	৬,৭০ ৯৩৩	২৯ ৮৪ ১৯২
১৭১১	৩,৪৭.৫৭২	১৯,৬২.৬৩২	১৭৪০	৫.৫৬.১৪১	২৬.৩৯ ৪৫৬
১৭১২	২,৮২,৮৯৩	১৬.০৭ ৬০৮	১৭৪১	৬ ৯৩ ৪৭৮	৩ ১.০১ ৯৮৪
১৭১৩	২,৫৩.৪৯৩	১৬,৭৬,৫৫২	১৭৪২	৮ ০৯.৭৭৭	৩৭ ৫৩ ৯৬০
১৭১৪	১,৯৩ ৮২২	১১.৪২.০০৮	১৭৪৩	৫ ৮৮ ০৩০	৩০ ৪৬ ০৯৬
১৭১৫	২,০২,০৩৪	১১.৬০,৪০০	১৭৪৪	৪ ৪৯ ১২১	২৬ ৪৯ ৯৬৮
১৭১৬	২,৭১.৮৬৮	১৩.৮০,৭৮৪	১৭৪৫	৫ ০২.৫৫৮	২৮ ৫৭,৬৭২
১৭১৭	১,৭৬,৯৭৮	৯,৭০.৭৫২	১৭৪৬	৫ ৫০ ২৯০	৩০.২৭ ৮৫৬
১৭১৮	২.৭৫.৭৫২	১৩.৯১ ৩৩৬	১৭৪৭	৫ ৪৭ ২২৫	২৯ ৯৬ ৬৫৬
১৭১৯	৩,৩১,২৯৪	১৬.২৩ ৪২৪	১৭৪৮	৪.২৭ ৫২৫	২৮ ৯৫.৮২৪
১৭২০	৪,৬২,৮৭৫	২৩.৬৮.২৯৬	১৭৪৯	৩,৭০.৩৬৫	২৩ ৮৩ ৬৫৮
১৭২১	৪,৯০,৮৭৫	২১;৯৬ ৮২৪	১৭৫০	৪,৬১ ০০০	৩৮,৭৬,০৫৬
১৭২২	১,৬১,৪৭২	৬.৮২ ৪২৪	১৭৫১	৪.৪৮.০৪১	৩৫,১৬,৩৬৮
১৭২৩	৩,০৪,৫৯৫	১৩.৫৪.৭৩৬	১৭৫২	৪ ০৩,১৯৫	২৭ ৮৪.২৮০
১৭২৪	২,৮৯.৮০৬	১২.৪৬,০৮০	১৭৫৩	৩.৭৬ ০২৫	২৪.১৩,৫৮৪
১৭২৫	২,৫৭ ৯০৫	১০ ৯১ ৭১	১৭৫৪	৩.৪৫ ২৬৭	২২ ৮৭.১২৮
১৭২৬	৫,৭৪.৬৩৯	২২,৯৫ ২৮৮	১৭৫৫	৩.৮১ ৫৪৩	২৬.৬০ ৫২০
১৭২৭	৮,২২.০৩৫	৩৩,৫১;৬২৮	১৭৫৬	৪,০০ ১৩৩	২১ ১৮ ০৪৮
১৭২৮	৫,৩১ ৫৪৮	২৪,৫৩ ৮৪৮	১৭৫৭	৮২ ৬৫৬	৪ ৮৭ ৬৬৪
১৭২৯	৬,০৮,১২১	৩০,৯৩ ৯৫২			

সূত্র ঃ কে. এন. চৌধুরী, 'দি ট্রেডিং ওর্য়াল্ড অব এশিয়া এণ্ড দি ইংলিশ ঈস্ট ইণ্ডিয়া কোম্পানী', সংযোজন-৫, পৃঃ ৫৪৪-৫৪৫।

ইংলিশ ঈস্ট ইন্ডিয়া কোম্পানীর বাংলা থেকে রপ্তানি বাণিজ্য

১৭০০-১৭৫৭

পণ্য কাঁচা রেশম

(কাঁচা রেশম সব সময় বড় পাউন্ড অর্থাৎ ২৪ আউন্সে ওজন হত)

বড় পাঃ=০·৬৮১ কি. গ্রা.

বৎসর	পরিমাণ/পাউন্ড	দাম টাকায়	বৎসর	পরিমাণ পাইন্ড	দাম টাকায়
১৭০০	৯৬,৩৪০	৩,৫২,৫৬৮	১৭২৯	১.১৬,৫৫০	৪,১৫,৫৫২
১৭০১	১,৪৮,৪৪৯	৬,৫৩,৩৩৬	১৭৩০	১,১৩,৫৯৫	৪.৪০,১১২
১৭০২	৮২.৩০৫	৪.১৮.৪৮০	১৭৩১	৯৪.৪৫০	৩.৯৬,০৬৪
১৭০৩	২১.১১৫	১ ৪১.৬৪৮	১৭৩২	৮৫.৫৩৯	৪.১৯,৩৬৮
১৭০৪	৭,৩৯৩	৬৫.৫০৪	১৭৩৩	১,৭১.৬৯৫	৭ ২৩.৫৩৬
১৭০৫	৪৩,৮১০	১ ৫০,২৫৬	১৭৩৪	২,০৯.১৬৬	৭,৫৭.৯৩৬
১৭০৬	৩,৩৮৪	১৪,০৬৪	১৭৩৫	১,.৪২০৫৭	৫.৫৬,৮৩২
১৭০৭	৭৭ ০৬৬	২.৭৭.১২৮	১৭৩৬	১,১৮,৭০৮	৪.৩৬,০০০
১৭০৮	৩৩.২১৩	১,২০ ৯৭৬	১৭৩৭	১,৫৫ ৯৩২	৬,০২,৪৮৮
১৭০৯	৩৪,২০০	১,৪৬,২৩২	১৭৩৮	১,৮১,৯৬৩	৬ ৯২,৬৮০
১৭১০	৬৩ ৪২৯	২,৩১.৮০০	১৭৩৯	১,২৭,৭৮২	৫,০৪,০৩২
১৭১১	৩৫ ৮৬৫	১.২৭,৩২০	১৭৪০	১,২৯,৬১৯	৪,৭৩,২৫৬
১৭১২	২১ ৯২৫	৮৪;৮১৬	১৭৪১	১,৬০,১৯৭	৫.৬৮,৬১৬
১৭১৩	৩১.৫১২	১,০৯,২২৪	১৭৪২	১,০৪,৭৪৯	৩ ৯৬ ৪০০
১৭১৪	৩০ ৩০০	১,৩৮,৩৪৪	১৭৪৩	৯০.০৪৪	৩,৫৬,২৭২
১৭১৫	২৪ ৯১৮	৮৫,৩৯২	১৭৪৪	১,২১.১০৭	৫.৪২.৭০৪
১৭১৬	৭৪.৭১৭	২.৪৫.৭৩৬	১৭৪৫	১,১৯ ৯৫৪	৪.৯১,১০৪
১৭১৭	১,০০,৩৪০	৫,৩৯,০০০	১৭৪৬	১,৪৮,০৪৫	৬,৭৪,৮০০
১৭১৮	১,২১.২৻৮	৪,১৩,৭৮৪	১৭৪৭	৯৪,৭২৯	৫,১৫,৪৯৬
১৭১৯	৮৬,০৫০	২,৯৮ ৭৬০	১৭৪৮	৮০০	৪,৭১২
১৭২০	৪১.০৭৯	১.৩০ ২০৮	১৭৪৯	২২.০১০	১,৩৯ ৯৮৪
১৭২১	২০ ৩৪৪	৫৮.৭৯২	১৭৫০	৩৪ ৪১৭	১ ৭৬.২৪০
১৭২২	১৬,৫০১	৫৯,১৩৬	১৭৫১	৪৬,০০০	২.৫২,৪০০
১৭২৩	৭৯,৬৭৩	২,৫৬ ০২৪	১৭৫২	৮২,৭৭৪	৪.৯৪,৬৬৪
১৭২৪	১ ২৪ ৯৩৩	৩.১৪.১৭৬	১৭৫৩	৭০,৬৩৪	৪ ২০,৭৬০
১৭২৫	১,২১.০১৬	৩,৬১.৩৩৬	১৭৫৪	২৯.১৯৯	১,৬৫.৭৯২
১৭২৬	১.১৯.২০০	৩ ৫৫,৭২৮	১৭৫৫	৬০,০১৩	৩,৫৪,৩৫২
১৭২৭	১ ৪১,৩৪৯	৪.৮৮.৩২৮	১৭৫৬	৪০,২৩১	২,৬৭,৪০০
১৭২৮	১.৯৩,৭০০	৭,০৩,৭৬৮	১৭৫৭		

সূত্র : কে. এন. চৌধুরী, 'দি ট্রেডিং ওয়ার্ল্ড অব এশিয়া এন্ড দি ইংলিশ ঈস্ট ইন্ডিয়া কোম্পানী' সংযোজন-৫, পৃঃ ৫৩৩-৫৩৪।

এ সময় কলকাতা থেকে দুটি জলপথ উত্তর দিকে গিয়েছিল। একটা কলকাতা থেকে বেরিয়ে, জলঙ্গী নদী ও নদীয়া হয়ে কোশী নদী অভিমুখে, অপরটি ভাগীরথী হয়ে, সুতী পেরিয়ে বিহারের মুঙ্গের ও পাটনা পর্যন্ত প্রসারিত ছিল। এযুগে এ পথটি সর্বাধিক ব্যবহৃত হত। বিহারের সোরা এ পথে চুঁচুড়া, চন্দননগর ও কলকাতায় আসত। কলকাতা থেকে জলপথে ঢাকা যেতে হলে জলঙ্গী হয়ে পদ্মা, সেখান থেকে পাবনা হয়ে ইছামতীর মধ্য দিয়ে জাফরগঞ্জ; সেখান থেকে ধলেশ্বরী হয়ে ঢাকা। ঢাকা থেকে গোয়ালপাড়া যাওয়ার নদীপথে পড়ত লখিয়া নদী ও পুরাতন ব্রহ্মপুত্র। ঢাকা থেকে নদীপথে শ্রীহট্ট যেতে হলে পথে বুড়িগঙ্গা, ছোট মেঘনা ও সুরমা নদী পাড়ি দিতে হত। বাংলার পূর্বভাগে নদীগুলি এমন সুন্দরভাবে ছড়িয়ে আছে যে জনগণের পণ্য পরিবহনের কোনো অসুবিধা হত না। পূর্ববঙ্গের প্রতিটি প্রধান প্রধান শহর ও শিল্প কেন্দ্রের সঙ্গে নদীপথে যোগাযোগ ছিল। সমকালীন বিদেশী পর্যটকরা পূর্ববঙ্গের নদীপথ ও নৌ পরিবহনের উচ্ছ্বসিত প্রশংসা করেছেন। এদের রেখে যাওয়া বর্ণনা এরকম ঃ 'নদীতীরে অসংখ্য শহর ও গঞ্জ ; নয়ন মনোহর ধানক্ষেতের মধ্য দিয়ে নদীগুলি প্রবাহিত। নদীগুলি দেখতে সুন্দর এবং নৌপরিবহনের অত্যন্ত উপযোগী।' 'কোনো কোনো নদী এত চওড়া ও গভীর যে এগুলি দিয়ে বড় জাহাজ স্বচ্ছন্দে যেতে পারে।'[২১]

এ যুগে সুন্দরবনের মধ্যেও অসংখ্য নাব্য নদীর উল্লেখ আছে। এগুলি দিয়ে যাতায়াত ও পরিবহনের কাজ চলত। এখান থেকে জলঙ্গী পর্যন্ত নাব্য নদীপথ ছিল।[২২] এখান থেকে নদীপথে সহজে ঢাকা যাওয়া যেত। নবাবগঞ্জ খাল দিয়ে হাজিগঞ্জ থেকে সহজেই ঢাকা ও লখিপুর যাওয়ার জলপথ ছিল বলে জানা যায়। সারাবছর এপথে নৌচলাচল করত। কর্ণফুলি থেকে রাঙামাটি পর্যন্ত প্রায় পঞ্চাশ মাইল দীর্ঘ নদীপথ অভ্যন্তরীণ নৌপরিবহনে ব্যবহৃত হত। বরিশালের বিপরীত দিকে দুর্গাপুর খাল দিয়ে লখিপুর হয়ে বাখরগঞ্জ যাওয়ার জলপথ ছিল। ঢাকার নিকট বুড়িগঙ্গানদী সারা বছর, এমনকি গরমের দিনেও, বড় বড় নৌকা বহন করত। মেঘনার শাখা পাঙ্খিয়া দিয়ে সারাবছর মালবোঝাই বড় বড় নৌকা যাতায়াত করত। ছোট মেঘনা দিয়ে সহজেই শ্রীহট্ট যাওয়া যেত। গঙ্গা-পদ্মা পথ ছাড়াও জলঙ্গী থেকে আত্রেয়ী নদীর মধ্য দিয়ে ঢাকা যাওয়া যেত।

২১। স্ট্যাভোরিনাস, 'ভয়েস', প্রথম খণ্ড, পৃঃ ৩৯৯।

২২। রেনেল, 'মেমোয়ার', পৃঃ ২৫৯।

উত্তরবঙ্গের পুনর্ভবা, ধরলা ও তিস্তা নদী, মানস ও ঘাগট খাল নৌপরিবহনে সাহায্য করত।[২৩] ঘাগটখালে জানুয়ারী মাসেই দেড়'শ মণী নৌকা স্বচ্ছন্দে চলাচল করতে পারত। ধরলা নদীতে সারাবছর দুহাজার মণী নৌকা চলত। এ জল-পথটি রঙ্গপুরের কুড়িগ্রাম থেকে ব্রহ্মপুত্র পর্যন্ত প্রসারিত ছিল।

সমসাময়িক ব্যক্তিদের বর্ণনা থেকে স্থলপথের যানবাহন সম্পর্কে একটা মোটামুটি ধারণা করা যায়। এযুগে স্থলপথে প্রধান যান হল বলদ ও ঘোড়ায় টানা গাড়ি। পালকিও সুখাসন যাতায়াতের জন্য ব্যবহার করা হত। মাল পরিবহনের জন্য বলদ ও ঘেড়ায় টানা গাড়ি ছাড়া হাতি ও পশ্চিমাঞ্চলে উটের ব্যবহার হত। যাতায়াতের জন্য বাংলাদেশে ঘোড়ার ব্যবহার খুব কম। ঘোড়ার যেটুকু ব্যবহার দেখা যায় তা পশ্চিমাঞ্চলেই বেশি। পূর্ববঙ্গে ঘোড়ার ব্যবহার আরো কম। বাংলাদেশে নৌপরিবহন ও যাতায়াতের জন্য নানাধরণের নৌকা ব্যবহৃত হত। 'খুলাসাৎ' রচয়িতা জানিয়েছেন শতাব্দীর শুরুতে বাংলাদেশে নৌকার সংখ্যা হল ৪,৪০০।[২৪] নৌকাগুলি নানাধরণের। এযুগে ব্যবহৃত প্রধান প্রধান নৌকাগুলি হল বালাম, গোধা, স্লুপ, সারেঙ্গা, সম্পান ও কোঁদা।[২৫] করম আলি 'মুজাফ্‌ফরনামায়' ঘুরাব, স্লুপ, বজরা, মাসুয়া, পাতিলা, উলাখ, জালিয়া, ময়ূরপংখী, ঘারদুর, কোষা, চলকর, ভাওলিয়া, পাঁসুলি, পালবার প্রভৃতি নৌকার কথা উল্লেখ করেছেন।[২৬]

জেমস্ রেনেল তৎকালীন বাংলার ডাক চৌকি ও ডাক রাস্তাগুলির কথা উল্লেখ করেছেন। এ রাস্তাগুলির মাঝে মাঝে সরাইখানা ও ডাক দেওয়া-নেওয়ার জন্য চৌকি ছিল। এখানে পথিকরা বিশ্রাম করত, ঘোড়া ও গাড়ির বলদ খাবার ও জল পেত এবং সংবাদ আদান প্রদানের জন্য চৌকিগুলি ব্যবহৃত হত। ডাক বাহকরা তাদের 'ডাক' বিনিময় করত। কলকাতা থেকে এ রকম ছটি ডাক রাস্তা বাংলার বিভিন্ন দিকে গিয়েছিল। (১) কলকাতা থেকে মুর্শিদাবাদ, রাজমহল হয়ে বক্সার পর্যন্ত : (২) কলকাতা থেকে মুর্শিদাবাদ হয়ে দিনাজপুর ; (৩) কলকাতা থেকে যশোহর হয়ে ঢাকা ; (৪) কলকাতা থেকে বর্ধমান ; (৫) কলকাতা থেকে মেদিনীপুর হয়ে বালেশ্বর ; (৬) কলকাতা থেকে কুলপি।

২৩। রেনেল, 'জার্ণালস', পৃ: ৫৪।
২৪। সুজন রায় ভাণ্ডারী, 'খুলাসাৎ', পৃ: ৪৬।
২৫। দীনেশ চন্দ্র সেন, 'বৃহৎবঙ্গ', দ্বিতীয় খণ্ড, পৃ: ৯২৬।
২৬। করম আলি, 'মুজাফফর নামা', বেঙ্গল নবাবস্, পৃ: ৫০।

সমকালীন ব্যক্তিদের বিবরণী থেকে জানা যায় সে যুগে সারাদেশে ডাক আদান প্রদানের ব্যবস্থা ছিল। এ ব্যবস্থার মাধ্যমে বাংলাদেশের এক প্রান্ত থেকে অপর প্রান্তে সংবাদ পাঠানো ও সংগ্রহ করা হত। ডাক হরকরা দেশের সংবাদ এক স্থান থেকে আর এক স্থানে পৌঁছে দিত। ডাক হরকরা ছিল দু রকমের। যারা পায়ে হেঁটে সংবাদ বহন করত তাদের বলা হত 'তাপ্পি' বা সাধারণ হরকরা। অশ্বারোহী হরকরা 'কাসিদ' নামে অভিহিত হত। কাসিদরা সাধারণত দিনে পঁচিশ থেকে তিরিশ মাইল রাস্তা পাড়ি দিতে পারত।[২৭] মাঝে মাঝে বিশেষ প্রয়োজনে এরা আরো দ্রুতগতিতে সংবাদ পেঁাছে দিত। এ যুগে কাশিমবাজার থেকে মাত্র সাতাশ ঘণ্টার মধ্যে কলকাতায় সংবাদ পেঁাছে দেবার নজির আছে। নবাব সিরাজুদ্দৌলা ১৭৫৬ খ্রীষ্টাব্দের ২রা জুন ইংরাজদের কাশিমবাজার কুঠী দখল করেছিলেন। নবাব দরবারে ইংরাজ প্রতিনিধি ওয়াটস্ সাহেব এ সংবাদ পরদিন কলকাতায় ইংরাজদের কাছে পেঁাছে দিয়েছিলেন।[২৮] সাধারণত মুশিদাবাদ থেকে কলকাতায় সংবাদ পাঠাতে সময় লাগত দু থেকে চার দিন। বিশেষ পরিস্থিতিতে সংবাদ আরো তাড়াতাড়ি পাঠানোর ব্যবস্থা করা যেত। মুর্শিদাবাদ থেকে রঙ্গপুর যেতে কাসিদদের সময় লাগত চারদিন। যে জমিদারির মধ্য দিয়ে কাসিদ বা ডাক হরকরা যেত সেখানকার জমিদার ওদের আহার, বাসস্থান ও অন্যান্য প্রয়োজনীয় জিনিস সরবরাহ করত। জমিদাররা ওদের নিরাপত্তা, রক্ষণাবেক্ষণ এবং নিরাপদ ভ্রমণের জন্য দায়ী থাকত। সরকারী কর্মচারীরাও ওদের নিরাপত্তা ও নিরাপদ ভ্রমণ সুনিশ্চিত করার দিকে লক্ষ্য রাখত।[২৯]

২৭। রেনেল, 'জার্নালস্', পৃঃ ১৩১।

২৮। এস. সি. হিল, 'বেঙ্গল' প্রথম খন্ড, পৃঃ ১২৬।

২৯। বোল্টস্, 'কনসিডারেশনস্', পরিশিষ্ট, পৃঃ ১৪২।

পঞ্চম অধ্যায়

রাজ্যের আর্থিক কাঠামো—আয় ব্যয়

নবাবী আমলে বাংলারাজ্যের আয়ের প্রধান উৎস হল জমি। মুঘল ব্যবস্থায় ভূমি রাজস্ব ছাড়া অন্যান্য উৎসকে (যেমন বাণিজ্য শুল্ক ইত্যাদি) রাষ্ট্রীয় আয়ের স্থায়ী মাধ্যম বলে মনে করা হত না। মুঘল ভূমি রাজস্ব ব্যবস্থা অনুযায়ী এ যুগে বাংলাদেশের সমস্ত জমি দু ভাগে বিভক্ত—খালসা ও জাগীর। খালসা জমি থেকে মোট আয় সম্রাটের প্রাপ্য রাজস্ব হিসাবে চিহ্নিত করা থাকত। জাগীর জমি প্রাদেশিক প্রশাসনের ব্যয় নির্বাহের জন্য চিহ্নিত হত। সুবাদার বা নাজিম, দেওয়ান, ফৌজদার প্রভৃতি উচ্চপদস্থ রাজকর্মচারীরা তাদের স্ব স্ব বিভাগের ব্যয় নির্বাহের জন্য জাগীর পেতেন। বিভিন্ন বিভাগের ব্যয় নির্বাহের জন্যও জাগীর নির্দিষ্ট হত। যেমন ঢাকায় অবস্থিত বাংলার নৌবহরের জন্য জাগীর নির্দিষ্ট ছিল। তেমনি গোলন্দাজ বাহিনী, সীমান্ত অঞ্চলে নিযুক্ত সেনাবাহিনী ও সৈন্য শিবিরের জন্যও জাগীর নির্দিষ্ট হত। এছাড়া সরকার জমির একটা অংশ বিভিন্ন জনহিতকর কাজ, সেবামূলক কাজ, পুরস্কার ও পারিতোষিক হিসাবে নির্দিষ্ট করে রাখত। বলা বাহুল্য এগুলি সবই নিষ্কর। খালসা ও জাগীর উভয় শ্রেণীর জমিতে নিষ্কর জমি থাকত।

বাংলাদেশের জমিদাররা খালসা ও জাগীর জমি থেকে ভূমি রাজস্ব আদায় করতেন। এ যুগের বাংলার জমিদারদের তিন ভাগে ভাগ করা যায়। (১) প্রাচীন জমিদার বংশগুলি—বর্ধমান, বীরভূম, বিষ্ণুপুর, ত্রিপুরা, কুচবিহার, সুসাঙ্ প্রভৃতি। বাংলার প্রাচীন জমিদারদের একাংশ বাংলায় মুঘল শাসন প্রতিষ্ঠিত হওয়ার আগে থেকেই এ দেশের ভূমি ও ভূমি রাজস্ব ব্যবস্থার সঙ্গে যুক্ত ছিলেন। কুচবিহার ও ত্রিপুরার রাজারা দীর্ঘকাল স্বাধীনভাবে রাজত্বও করেছিলেন। (২) নবাবী আমলে বাংলাদেশে কয়েকটি বড় বড় জমিদারি প্রতিষ্ঠিত হয়েছিল। যেমন নাটোর, দীঘাপাতিয়া ময়মনসিংহ ও মুক্তাগাছা। (৩) বাংলার অসংখ্য মাঝারি ও ছোট জমিদার ও তালুকদার।

ভূমি ও ভূমি রাজস্ব বিভাগ হল দেওয়ানের বিভাগ। দেওয়ান তার অধীনস্থ আমিল, ক্রোরি, ফুসিলদার, ফতেদার, মোকাদ্দম, শিকদার ও পাটওয়ারি[১]

১। গঙ্গারাম 'মহারাষ্ট্র পুরাণে' শিকদার ও পাটওয়ারিদের কথা উল্লেখ করেছেন, পৃ: ২২-২৩।

শ্রেণীর কর্মচারীদের নিয়ে ভূমি বন্দোবস্ত গড়ে তুলতেন এবং রাজস্ব আদায় করতেন। 'কানুনগো ভূ-সম্পত্তির রেজিস্টার ছিলেন। তাঁহার নিজের কোন ক্ষমতা ছিল না। কোন্ স্থানের ভূমির উর্বরতা কিরূপ, তাহার ন্যায্য কর কত ইত্যাদি বিষয়ের হিসাব রাখিতেন এবং নবাব দেওয়ান এবং দারোগার নিকট তাহা জানাইতেন।'[২]

বাংলার ভূমি রাজস্বের তালিকা

১৭০০-১৭৫৭

শাসনকাল	বৎসর	ভূমি রাজস্বের পরিমান (টাকায়)
মুর্শিদকুলী খাঁ (দেওয়ান)	১৭০০	১.১৭,২৮ ৫৪১
,,	১৭০১	১,২০ ৪৯ ৯৮৯
,,	১৭০২	১.২৪.৭৯.২৫১
,,	১৭০৩	১.২৫.৪১,০১৮
,	১৭০৪	১,২৬,৫৫,৫৬৯
,,	১৭০৫	১,২৬,৬৯.০৬৯
,,	১৭০৭	১,২৬,৭৬.৬৪৭
জিয়াউল্লাহ (দেওয়ান)	১৭০৮	১.২৬ ৭৬,৮৫৩
,,	১৭০৯	১,২৬,৭৯,৫৭১
মুর্শিদকুলী খাঁ (দেওয়ান)	১৭১০	১,২৬,৭৮,৭২৪
,,	১৭১১	১,৩৪,০০.১৭৫
,,	১৭১২	১,৩৪,২৬,৯৩৮
মুর্শিদকুলী (দেওয়ান ও ডেপুটি সুবাদার)	১৭১৩	১.৩৫,৭০,০৮৭
,,	১৭১৪	১,৩৫,৭১,৫১৭
,,	১৭১৫	১,৩৮,৭৯.৫৪৮
,,	১৭১৬	১.৩৯,৩৯,৪০১
মুর্শিদকুলী (সুবাদার)	১৭১৭	১.৪০,২৭,৭৯৫
,,	১৭১৮	১,৪০,২৯,৮৬৯
,,	১৭১৯	১,৪০,৩০,৩৫৩
,,	১৭২০	১,৪০,৯১,৩২৬
,,	১৭২১	১,৪১.০৯,১৯৪
,,	১৭২২	১,৪২,৮৮,১৮৬
সুজাউদ্দিন (১৭২৭ ১৭৩৯)	১৭২৮	১,৪২.৪৫,৫৬১
সরফরাজ খাঁ (১৭৩৯-১৭৪০)	১৭৪০	১,৪২.৪৫.৫৬১
আলিবর্দী (১৭৪০-১৭৫৬)	১৭৫৬	১,৪২-৪৫,৫৬১
সিরাজ (১৭৫৬ ১৭৫৭)	১৭৫৭	১.৪২.৪৫,৫৬১

সূত্র: এন. কে, সিংহ, দি ইকনমিক হিস্ট্রি অব বেঙ্গল, দ্বিতীয় খণ্ড, পৃঃ ৩ এবং ফিফথ রিপোর্ট, দ্বিতীয় খণ্ড, পৃঃ ১২০।

২। কার্তিকের চন্দ্র রায়, ক্ষিতীশ বংশাবলীচরিত, পৃঃ ২২।

১৭০০ খ্রীষ্টাব্দের নভেম্বর মাসে মুঘল সম্রাট আরঙ্গজেব তাঁর বিশ্বস্ত কর্মচারী কারতালাব খাঁকে (পরবর্তীকালে মুর্শিদকুলী খাঁ) বাংলার দেওয়ান নিযুক্ত করলেন। এ সময়ে বাংলার ভূমি রাজস্ব ব্যবস্থার বেশ কিছু ত্রুটি বিচ্যুতি সম্রাটের নজরে এসেছিল। খালসা জমির পরিমাণ কমেছিল আর সেই অনুপাতে জাগীর জমির পরিমাণ বেড়েছিল। ভাল ভাল খালসা জমি উচ্চ কর্মচারীরা জাগীর হিসাবে গ্রাস করেছিল। খালসা জমি থেকে নিয়মিত রাজস্ব আদায় হত না। বাংলার আর্থিক অবস্থা এমন দাঁড়িয়েছিল যে মাঝে মাঝে অন্যান্য প্রদেশ থেকে টাকা এনে বাংলার আয়-ব্যয়ের ঘাটতি মেটানো হত। মুর্শিদকুলী বাংলার 'দেওয়ানি' বিভাগের দায়িত্ব গ্রহণ করে সম্রাটের অনুমোদন নিয়ে, বাংলার উচ্চ রাজকর্মচারীদের জাগীর কমিয়ে দিলেন। কেড়ে নেওয়া জাগীরের ভূমি রাজস্বের পরিমাণ হল দশ লক্ষ একুশ হাজার চারশ পনেরো টাকা। যাদের জাগীর কেড়ে নেওয়া হল তাদের উড়িষার অনুন্নত, অনধিকৃত, বিদ্রোহপ্রবণ অঞ্চলে নতুন জাগীর দেওয়া হল। দ্বিতীয়ত, তিনি বাংলার জমি জরীপ করে নতুন 'হস্তবুদ' (ভূমি ও ভূমি রাজস্ব সম্পর্কে বিস্তারিত হিসাব) গড়ে তুললেন। বাংলার জমি ভাগ করা হল আবাদী, অনাবাদী ও বন্ধ্যা এই তিন ভাগে। এই হস্তবুদের ভিত্তিতে ১৭২২ খ্রীস্টাব্দে মুর্শিদকুলী করলেন 'আসল জমা' বা 'তোমার জমা'—বাংলার নতুন ভূমি বন্দোবস্ত। এই নতুন ভূমি বন্দোবস্তে তিনি বাংলার ভূমি রাজস্ব বাড়ালেন এগারো লক্ষ বাহাত্তর হাজার দুশ উনআশি টাকা।[৩] মুর্শিদকুলীর আগে ১৬৫৮ খ্রীষ্টাব্দে শাহ সুজার সময়ে বাংলার ভূমি বন্দোবস্ত হয়েছিল। ঐ সময় বাংলার মোট ভূমি রাজস্ব ধার্য হয়েছিল এক কোটি একত্রিশ লক্ষ পনেরো হাজার ন'শ সাত টাকা। মুর্শিদকুলী বাংলার ভূমি রাজস্ব বাড়িয়ে করলেন এক কোটি বিয়াল্লিশ লক্ষ অষ্টআশি হাজার একশ ছিয়াশি টাকা। ১৭২২ খ্রীষ্টাব্দের বন্দোবস্তে চৌষট্টি বছরে (১৬৫৮-১৭২২) বালার ভূমি রাজস্ব বাড়ানো হল শতকরা ১৩½ টাকা হারে, জাগীর জমির কিছু অংশ অধিগ্রহণের ফলে মোট রাজস্ব বৃদ্ধি হল নয়শতাংশ। মোট রাজস্বের মধ্যে খালসা জমির রাজস্বের পরিমাণ এক কোটি নয় লক্ষ ষাট হাজার সাত'শ নয় টাকা আর জাগীর জমির রাজস্বের পরিমাণ দাঁড়াল তেত্রিশ লক্ষ সাতাশ হাজার চার'শ সাতাত্তর টাকা।

৩। জেমস্ গ্রান্ট, 'অ্যানালিসিস অব দি ফিনান্সেস অব বেঙ্গল', ফারমিংগার, 'ফিফ্‌থ রিপোর্ট', দ্বিতীয় খণ্ড, পৃ: ১২০।

মুঘল ব্যবস্থায় জনবসতি ও চাষ আবাদ বাড়লে ভূমি রাজস্ব বাড়ানোর ব্যবস্থা দেখা যায়। সুতরাং মুর্শিদকুলীর সময় ভূমি রাজস্ব বৃদ্ধি মোটেই অস্বাভাবিক নয়। মুর্শিদকুলী ব্যয় সঙ্কোচ নীতিতে বিশ্বাস করতেন। প্রশাসনিক ব্যয় কমানো ও দক্ষতা বৃদ্ধিকল্পে তিনি ভূমি রাজস্ব সংগ্রহের জন্য নতুন প্রশাসনিক কাঠামো গড়ে তুলেছিলেন। তাঁর আগে বাংলায় ছিল ৩৪ সরকার এবং ১৩৫০ মহল। মুর্শিদকুলী বাংলাকে ১৩ চাকলা ও ১৬৬০ পরগণায় ভাগ করলেন। মুর্শিদকুলীর সময়ে বাংলার ১৩টি চাকলার নাম হল বন্দর বালাশোর, হিজলী, মুর্শিদাবাদ, বর্ধমান, হুগলী বা সপ্তগ্রাম, ভূষণা (রাজশাহী, মাহমুদাবাদ, ফতেহাবাদ প্রভৃতি), যশোর, আকবরনগর (রাজমহল ও পূর্ণিয়া), ঘোড়াঘাট (রঙ্গপুর), কুরিবাড়ি (কামরূপ, আসাম), জাহাঙ্গীরনগর (সোনারগাঁ, বাকলা), শ্রীহট্ট এবং ইসলামাবাদ (চট্টগ্রাম)।

মুর্শিদকুলীর আগে থেকে বাংলার জমিদাররা বাংলাদেশে ভূমি রাজস্ব আদায় করতেন। খালসা ও জাগীর উভয় ক্ষেত্রে এরা রাজস্ব আদায় করার দায়িত্ব পেতেন। এর বিনিময়ে আদায়ীকৃত রাজস্বের দশ শতাংশ এবং কিছু নিষ্কর 'নানকর' জমি ভোগ করতেন। বৈশাখ মাসে পুণ্যাহের দিন জমিদারদের বকেয়া রাজস্ব এবং আগামী বছরের দেয় রাজস্ব সম্পর্কে বন্দোবস্ত হত।[৪] এ সময়ে বাংলার জমিদাররা দেওয়ানী বিভাগে সমবেত হতেন এবং নবাব ও দেওয়ান এদের রাজস্ব আদায়ের সনদ দিতেন। বাদশাহী ও নবাবী সনদ থেকে বাংলার জমিদারদের দায়িত্ব ও কর্তব্য সম্পর্কে অনেকখানি জানা যায়। সনদের প্রথমে পরগণার নাম ও তার রাজস্বের পরিমাণ উল্লিখিত হত। তারপরে সচরাচর এরূপ বর্ণনা থাকত। 'প্রজাগণ যে নির্দ্ধারিত রাজস্ব দিয়া থাকে, তাহার অধিক এক কপর্দ্দকও লইবে না, এবং ছলে বা কৌশলে তাহাদের নিকট আর কিছু লইবে না। তাহাদিগকে সুখে রাখিতে যত্ন করিবে, এবং তাহাদের প্রতি কেহ কোন দৌরাত্ম করিতে না পারে তদ্বিষয়ে যত্নশীল থাকিবে। কাহারও জায়গিরের (নিষ্কর ভূমি) প্রতি হস্ত প্রসারণ করিবে না। জমিদারীর উন্নতি সাধনে নিরন্তর যত্ন করিবে, এবং নির্দ্ধারিত রাজস্ব[৫], প্রদান পূর্বক আমার সরকারের মঙ্গলাভিলাষী

৪। ইউসুফ আলি, আহবাল-ই-মহাব্বত জঙ্গ' (যদুনাথ সরকারের অনুবাদ), বেঙ্গল নবাবস্, পৃঃ ১৫৪-১৫৫।

৫। কার্তিকের চন্দ্ররায়, ঐ, পৃঃ ৯৮। বড় বড় জমিদাররা বাদশাহের কাছ থেকে সনদ পেতেন।

থাকিবে।' জমিদারদের কাজ হল নির্ধারিত ভূমি রাজস্ব আদায় করে রাজকোষে জমা দেওয়া, জমিদারির কৃষিকাজ দেখা, অনাবাদী জমি চাষে আনা, জলসেচ ও বাঁধের ব্যবস্থা করা ইত্যাদি। এছাড়া, এ যুগে বাংলার জমিদারদের পুলিশ ম্যাজিস্ট্রেটের দায়িত্বও ছিল। জমিদারির মধ্যে চোর ডাকাতের হাত থেকে তারা প্রজাদের রক্ষা করতেন। তাদের আর একটি গুরুত্বপূর্ণ কাজ হল ভূমি ও ভূমি রাজস্বের হস্তবুদ ও সরহদ্দ প্রস্তুত করে সরকারের প্রয়োজনমত সরবরাহ করা।

সলিমুল্লাহ্ জানিয়েছেন মুর্শিদকুলী বাংলার জমিদারদের সঙ্গে কঠোর ব্যবহার করতেন। যদুনাথ সরকারের মতে মুর্শিদকুলী বাংলার ভূমি রাজস্ব বন্দোবস্তের ক্ষেত্রে এক যুগান্তকারী পরিবর্তন ঘটিয়েছিলেন। তিনি বাংলাদেশে ভূমিরাজস্ব আদায়ের জন্য 'মালজামিনী' বা ইজারা ব্যবস্থা চালু করেছিলেন। বাংলার এ যুগের ইজারাদারদের সঙ্গে তিনি ফরাসি দেশের ফারমিয়ের জেনারেলদের' তুলনা করেছেন। ফরাসি দেশের ফারমিয়ের জেনারেলদের মত বাংলার ইজারাদাররা নির্দিষ্ট সময়ের জন্য জমিদারি থেকে রাজস্ব আদায় করে নির্ধারিত কমিশন ভোগ করত। যদুনাথ সরকারের মতে মুর্শিদকুলী জমিদারদের ওপর ইজারাদারদের স্থাপন করেছিলেন। এদের চাপে বাংলার প্রাচীন জমিদাররা ধ্বংস হয়ে যায় এবং মুর্শিদকুলীর ইজারাদাররা পরবর্তীকালে কর্ণওয়ালিশের সময় চিরস্থায়ী বন্দোবস্তে স্থায়ী জমিদার বলে স্বীকৃতি পান।[৬]

আবদুল করিম এ মত খণ্ডন করেছেন। মুর্শিদকুলী জমিদারদের রেখে-ছিলেন। খালসা জমির কতকাংশে, বাজেয়াপ্ত করা জমিদারিতে ইজারাদাররা খাজনা আদায় করতেন। মুর্শিদকুলীর হস্তবুদ অনুসারে এদের রাজস্ব আদায় করতে হত। এজন্য জমিদারদের মত তাঁরা কমিশন পেতেন। মুর্শিদকুলীর সময় জমিদার ও ইজারাদার উভয় শ্রেণীর করসংগ্রাহকগণ প্রজা বা রায়তদের কাছ থেকে রাজস্ব আদায় করতেন। সুতরাং তাঁর কর সংগ্রহ ব্যবস্থাকে মিশ্র ব্যবস্থা বলা যেতে পারে। যে সমস্ত জমিদার নিয়মিত খাজনা দিতে পারত না শুধু তেমন কিছু জমিদার তাঁর সময়ে উৎখাত হয়েছিল। তাঁর সহযোগী নাজির আহমেদ ও রেজা খাঁ এদের দৈহিক নির্যাতন দিতেন বলে জানা যায়। তাঁর সময়ে নাটোর, দীঘাপাতিয়া, ময়মনসিংহ ও মুক্তাগাছার জমিদারি গড়ে উঠেছিল তেমনি তাঁর সময়ে

৬। যদুনাথ সরকার সম্পাঃ 'হিস্ট্রি অব বেঙ্গল', দ্বিতীয় খণ্ড, ২১ অধ্যায়।

বিদ্রোহের জন্য ভুষণার সীতারাম রায় ও রাজশাহীর দর্পণারায়ণ জমিদারি হারিয়েছিলেন। মুঘল ভূমি রাজস্ব ব্যবস্থায় শুধু বিদ্রোহের জন্য জমিদার উৎখাত হতেন। অন্য কোনো কারণে নয়। 'নবাবেরা ভূম্যধিকারিগণকে বশীভূত করিয়া, অথবা তাহাদের জমিদারীতে ক্রোক সাজোয়াল দিয়া, বাকী রাজস্ব আদায় করিয়া লইতেন, এবং কখন কখন মহাল খাস করিয়া অন্যের সহিত বন্দোবস্ত করিতেন'।[৭] জমিদার সম্পূর্ণ জমিদারি বাকী খাজনার জন্য হারাতেন না।

১৭২৮ খ্রীষ্টাব্দে সুজাউদ্দিন মুর্শিদকুলীর ব্যবস্থায় সামান্য পরিবর্তন করে চালু রেখেছিলেন। প্রকৃত পক্ষে কর্ণওয়ালিশের সময় পর্যন্ত বাংলার ভূমি ও ভূমি রাজস্ব ব্যবস্থা মুর্শিদকুলীর অবদান। সুজাউদ্দিনের সময় জমিদারদের প্রতি কঠোরতা হ্রাস করা হল। নিয়মিত রাজস্ব দেওয়ার প্রতিশ্রুতি দেওয়ায় বন্দী জমিদারদের মুক্ত করা হল। খালসা জমি থেকে মোট এক কোটি নয় লক্ষ আঠারো হাজার চুরাশি টাকা রাজস্ব ধার্য্য করা হয়েছিল। জাগীর জমির মোট রাজস্ব নির্ধারিত হল তেত্রিশ লক্ষ সাতাশ হাজার চার'শ সাতাত্তর টাকা। দুদফায় বাংলার মোট ভূমি রাজস্বের পরিমাণ হল এক কোটি বিয়াল্লিশ লক্ষ প'য়তাল্লিশ হাজার পাঁচ'শ একষট্টী টাকা। সরফরাজ খাঁ, আলিবর্দী ও সিরাজুদ্দৌলার সময় বাংলার ভূমি রাজস্বের পরিমাণ একই রইল।

মুর্শিদকুলী বাংলার ভূমি রাজস্বের ক্ষেত্রে এক উল্লেখযোগ্য পরিবর্তন ঘটিয়েছিলেন। তিনি দেওয়ানী বিভাগের মুৎসুদ্দি ও হিসাব রক্ষকদের জন্য এক খাতে (ওয়াজাসাৎ খাসনোবিশী) বাংলার জমিদারদের ওপর বাড়তি ভূমি রাজস্ব বসিয়েছিলেন। একে আবওয়াব (abwab)) বলে। মুর্শিদকুলীর সময় এ বাড়তি ভূমি রাজস্বের পরিমাণ ছিল সামান্যই—মাত্র দু লক্ষ আটান্ন হাজার আট শ সাতান্ন টাকা। সুজাউদ্দিন মুর্শিদকুলীর পদাঙ্ক অনুসরণ করে চার খাতে মোট উনিশ লক্ষ চোদ্দ হাজার প'চানব্বই টাকার আবওয়াব বা বাড়তি ভূমি রাজস্ব ধার্য্য করেছিলেন। এ চারটি খাত হল (১) নজরানা মোকরারি (দু লক্ষ আটচল্লিশ হাজার চল্লিশ টাকা)—দিল্লীতে বাদশাহী রাজস্ব পাঠানোর খরচ ; (২) জার মাথোট (এক লক্ষ বাহান্ন হাজার সাত'শ ছিয়াশি টাকা)—পুন্যাহ, নজর, খেলাত, বাঁধের খরচ ও রসুম নেজারাত—হেড পিওনের মফঃস্বল থেকে রাজস্ব আনার খরচ ;

৭। কার্তিকের চন্দ্র রায়, ঐ, পৃঃ ৫।

(৩) মাথোট ফিলখানা (তিন লক্ষ বাইশ হাজার ছ'শ একত্রিশ টাকা)—নাজিম ও দেওয়ানের হাতির খরচ এবং (৪) ফৌজদারি আবওয়াব (সাত লক্ষ নব্বুই হাজার দু'শ আটত্রিশ টাকা)—সুদূর সীমান্ত জেলাগুলির ফৌজদারি কর। আলিবর্দ্দী মোট চারটি আবওয়াব বা ভূমি রাজস্বের ওপর বাড়তি কর বসিয়েছিলেন, এ চারটি আবওয়াব হল (১) চৌথ মারাঠা (পনেরো লক্ষ একত্রিশ হাজার আট'শ সতেরো টাকা), (২) আহুক প্রভৃতি (এক লক্ষ চুরাশি হাজার এক'শ চল্লিশ টাকা), (৩) কিমত খেস্ত গৌড় (আট হাজার টাকা এবং (৪) নজরানা মনসুরগঞ্জ (পাঁচ লক্ষ এক হাজার পাঁচ'শ সাতানব্বই টাকা)। ১৮৫১ খ্রীষ্টাব্দে আলিবর্দ্দী নাগপুরের অধিপতি রঘুজী ভোঁসলেকে বাংলার রাজস্ব থেকে বাৎসরিক বারো লক্ষ টাকা চৌথ দিতে প্রতিশ্রুত হন। সেই প্রতিশ্রুতি অনুযায়ী তিনি খালসা জমিতে এই বাড়তি কর ধার্য্য করেছিলেন। আহুক হল শ্রীহট্ট থেকে জনহিতকর কাজের জন্য আনা চুনের জন্য কর। গৌড়ের প্রাসাদ ভেঙ্গে ইট পাথর আনার খরচ মেটানোর জন্য একটি ছোট কর হল 'কিমত খেস্ত গৌড়'। সিরাজের প্রাসাদ, হীরাঝিলের কাছে মনসুরগঞ্জ বাজারে এবং পার্শ্ববর্তী জমিদারির ওপর স্থাপিত কর হল নজরানা মনসুরগঞ্জ। আলিবর্দীর সময়ে আবওয়াব খাতে মোট রাজস্ব আদায়ের পরিমাণ হল বাইশ লক্ষ পঁচিশ হাজার পাঁচ'শ চুয়ান্ন টাকা। মুর্শিদকুলী থেকে আলিবর্দ্দী পর্যন্ত আবওয়াব খাতে ধার্য্য মোট রাজস্বের পরিমাণ হল তেতাল্লিশ লক্ষ আটানব্বুই হাজার চার'শ ছ টাকা।

বাংলার জমিদাররা কৃষক বা রায়তদের ওপর আনুপাতিক হারে আবওয়াব ধার্য্য করেছিলেন। তাছাড়া এ অজুহাতে রাজস্বের পরিমাণ আরো কিছু বাড়িয়ে নেওয়া হল। ১৭৮৯ খ্রীষ্টাব্দের ১৮ই জুনের সুবিখ্যাত 'মিনিটে' জন শোর বাংলার নবাবদের আবওয়াব বা বাড়তি ভূমিকর সম্পর্কে কঠোর মন্তব্য করেছেন। তাঁর অভিমত হল বাংলার জমি ও কৃষি সম্পদের পক্ষে এ বাড়তি কর বহন করা খুব একটা কঠিন ব্যাপার ছিল না ঠিকই। তবে এ ধরণের বাড়তি ভূমিকর জমিদার ও রায়ত উভয়ের পক্ষে ক্ষতিকারক। এ ধরণের করের 'প্রত্যক্ষ প্রবণতা হল জমিদারকে বলপ্রয়োগে অধিক রাজস্ব আদায়ের দিকে ঠেলে দেয় এবং সমস্ত ব্যবস্থা প্রবঞ্চনা, গোপনতা এবং দুর্দশার সৃষ্টি করে।'[৮] এই আবওয়াব বা বাড়তি ভূমিরাজস্ব বাংলার গ্রামীন অর্থনীতিতে বিরূপ প্রতিক্রিয়া সৃষ্টি

৮। জন শোরের মিনিট, ১৮ই জুন, ১৭৮৯। ফার্মিংগার, ঐ, দ্বিতীয় খণ্ড, পৃঃ ৮-১৭।

করেছিল। সম্রাটের বিনা অনুমতিতে মুর্শিদকুলী সামান্য টাকার আবওয়াব ধার্য্য করেছিলেন। তাঁর উত্তরাধিকারীরা ক্রমশ এ বাড়তি কর বাড়াতে থাকেন। প্রাক্ পলাশী যুগে আবওয়াব বাংলার নবাবদের আয়ের একটি প্রধান উৎসে পরিণত হল। আলিবর্দ্দীর সময় পর্যন্ত এ খাতে রাজস্ব বাংলার ভূমি রাজস্বকে শতকরা তেত্রিশ ভাগ (৩৩%) বাড়িয়েছিল। আর জমিদাররা আবওয়াবের সুযোগ নিয়ে কৃষকদের ওপর যে নতুন রাজস্ব হার চাপালো তাতে তাদের দেয় রাজস্বের পরিমাণ ৫০ শতাংশ বেড়ে গেল। কৃষকদের কথা এ ব্যাপারে মোটেই ভাবা হল না। রায়তেরা এ বাড়তি করের বোঝা বইতে পারবে কিনা, বাড়তি করের পরিমাণ কতখানি হবে, দুঃখ কতখানি বাড়বে—এসব প্রশ্ন খতিয়ে দেখা হয়নি।

সুজাউদ্দিনের সময় থেকে বাংলার নবাবরা কতকগুলি নতুন ধরণের আর্থিক অসুবিধার সম্মুখীন হয়েছিলেন। প্রশাসনিক ও সামরিক ব্যয় বৃদ্ধি পেয়েছিল। বিদেশ থেকে প্রচুর পরিমাণে সোনা ও রূপো বাংলার বাজারে আসাতে টাকার দাম হঠাৎ কমে যায়। এজন্য বাংলা সরকারের আর্থিক অবস্থার ওপর চাপ সৃষ্টি হয়েছিল। এ অবস্থার প্রতিকার কল্পে এবং রাষ্ট্রীয় আয়-ব্যয়ে সমতা আনার জন্য বাংলার নবাবরা বাড়তি ভূমি রাজস্ব স্থাপন করতে বাধ্য হয়েছিলেন। তবে অসাধু জমিদাররা যাতে এ সুযোগ গ্রহণ করে প্রজাদের দুর্দশা আরো বাড়িয়ে না তোলেন সে সম্পর্কে কোনো প্রতিরোধমূলক ব্যবস্থা তারা গ্রহণ করেননি। ফলে যা হবার তাই হল। রায়তদের দুর্গতি বাড়ল। জমিদাররা এসুযোগে আরো অনেক অবৈধ করের বোঝা রায়তদের দুর্বল কাঁধে চাপালেন। নবাবী আমলে 'ভূম্যধিকারীরা ভূকর ব্যতীত অনেক প্রকার কর লইতেন। তৈলকার, কুম্ভকার, কর্ম্মকার, স্বর্ণকার, সূত্রধর গাঁড়ার গোপ, ক্ষুরী, রজক, তন্তুবায় প্রভৃতি ব্যবসায়ীগণ স্ব স্ব ব্যবসায়ের জন্য ভূম্যধিকারীকে কিছু কিছু কর দিত। ভূকরের ন্যায় এ সকল করও জমাওয়াশীলবাকীভুক্ত হইত। ......পূর্বের ভূমির কর অল্প থাকাতে রাইয়তেরা এইরূপ অর্থ প্রদানে কাতর হইতেন না।'[১] এযুগে ভূকরের হার কত ছিল নিশ্চিত করে বলা শক্ত। একটি প্রচলিত মত হল মুর্শিদকুলীর সময় ভূকরের সাধারণ হার বিঘা প্রতি দশ আনার বেশি হত না। তখন বাংলাদেশে এক টাকায় চার থেকে পাঁচ মণ চাল পাওয়া যেত। সম্ভবত ভূমি

১। কার্তিকেয় চন্দ্র রায়, ঐ, পৃঃ ৬-৭।

রাজস্বের হার ছিল উৎপন্ন ফসলের এক তৃতীয়াংশ।[১০] মোরল্যাণ্ডের হিসাব মত আরঙ্গজেবের সময় উৎপন্ন ফসলের পঞ্চাশ শতাংশ হারে ভূমি রাজস্ব নির্ধারিত হত।[১১]

মুঘল ব্যবস্থায় ভূমি রাজস্ব ছাড়া আর সমস্ত রাষ্ট্রীয় আয়ের উৎসকে অনিশ্চিত ও অস্থায়ী মনে করা হত। এযুগে অন্য সমস্ত শুল্ক ও করকে এক কথায় 'সায়ের' বলা হত। ভূমি রাজস্ব ছাড়া আর সবই 'সায়ের'। 'আইন-ই আকবরী'র দ্বিতীয় খণ্ডে সায়ের করের এক দীর্ঘ তালিকা আছে।[১২] নবাবী আমলে বাংলদেশে সায়ের কর রাষ্ট্র আয়ের এক প্রধান ও লোভনীয় উৎস হয়ে দাঁড়িয়েছিল। এর কারণ হল এ যুগে বাংলার কৃষি, শিল্প ও বাণিজ্যের উন্নতি এবং বিদেশী বণিকদের এ দেশে বিপুল পরিমাণ বাণিজ্য। মুর্শিদকুলীর সময় থেকে সায়ের বিভাগ গড়ে ওঠে। এ বিভাগে একজন ভারপ্রাপ্ত দারোগা বা সুপারিণ্টেণ্ডেণ্ট ছিলেন। তিনি কর স্থাপন ও সংগ্রহে ভারপ্রাপ্ত হতেন। তার অধীনে শুল্ক চৌকিতে 'আমিন চৌকিয়ৎ' নামক কর্মচারী প্রতি শুল্ক চৌকির প্রধান হিসাবে কাজ করত। এ কর ধার্য্য করা হত বাড়ি, দোকান, বাজার, গঞ্জ, মদ, আমদানী-রপ্তানি দ্রব্য, গুদাম, কুঠি, ফেরিঘাট প্রভৃতির ওপর। অনেক সময় মেলা থেকে শুল্ক আদায় করা হত। তাছাড়া লাইসেন্স ফি, সেতু শুল্ক প্রভৃতি এর আওতায় পড়ে। সাধারণভাবে এর শতকরা হার ছিল ২½ টাকা। বাংলার নবাবরা বিভিন্ন শ্রেণীর বণিকদের কাছ থেকে বিভিন্ন হারে কর সংগ্রহ করতেন। বাংলার মুসলমান বণিকরা ২½ শতাংশ হারে বাণিজ্যশুল্ক দিত; হিন্দু বণিকদের বাণিজ্য পণ্যের ওপর মাশুলের হার ৩½ শতাংশ; আর্মেনীয়দের দেয় শুল্কের হার ৩½ শতাংশ, ওলন্দাজ ও ফরাসিরা দিত ২½ শতাংশ হারে। আর ইংরাজরা বার্ষিক তিন হাজার টাকার বিনিময়ে সারাবছর বিনাশুল্কে বাণিজ্য করত। এছাড়া, বিভিন্ন জমিদারির এলাকা দিয়ে পণ্য নিয়ে যেতে হলে আলাদা কর দিতে হত।

হলওয়েল জানিয়েছেন সুজাউদ্দিন সায়ের কর আদায় করার জন্য সারা বাংলা দেশে কুড়িটি নতুন চৌকি বসিয়েছিলেন। জেমস্ গ্রাণ্টের প্রতিবেদনে

১০। আবদুল করিম, 'মুর্শিদকুলী এণ্ড হিজ টাইমস্', পৃঃ ৮৫-৮৮।

১১। মোরল্যাণ্ড, 'এগ্রারিয়ান সিস্টেম অব মোসলেম ইণ্ডিয়া', পৃঃ ৯৩৫।

১২। আবুল ফজল, 'আইন-ই-আকবরী', (জ্যারেট সং), দ্বিতীয় খণ্ড, পৃঃ ৫৭ ৫৮, ৬৬। সম্রাট আকবর অনেকগুলি সায়ের কর তুলে দেন। যদুনাথ সরকার, 'মুঘল অ্যাডমিনিস্ট্রেশন', পৃঃ ৯০-৯০৫।

দেখা যায় সুজাউদ্দিনের সময় রাজধানী মুর্শিদাবাদ ও বক্স বন্দর হুগলী থেকে এ খাতে বেশ কিছু টাকা আদায় করা হয়েছে। একবছরে রাজধানীর (সায়ের চুণাখালি) সায়ের খাতে আদায়ীকৃত অর্থের পরিমাণ তিন লক্ষ এগারো হাজার ছ'শ তিন টাকা। ঐ সময় হুগলী থেকে আদায়ের পরিমাণ দুলক্ষ সাতানব্বই হাজার নয়'শ একচল্লিশ টাকা।[১৩]

বাংলার নবাবদের একালে আয়ের অপর উৎস হল টাকশাল। দুটি কারণে বাংলা সরকারের টাঁকশাল থেকে প্রতিবছর মোটা টাকা আয় হত। এর একটি কারণ হল এ যুগে বাংলায় প্রচলিত মুদ্রা ব্যবস্থা। এ ব্যবস্থায় মুদ্রা পুরাতন হলে বাজারে তার দাম কমে যেত।[১৪] সেজন্য প্রতি তিন বছর অন্তর মুদ্রা পুনরায় টঙ্কনের (recoining) ব্যবস্থা চালু ছিল। বাংলার মহাজন ও ব্যবসায়ীরা শতকরা দু টাকা হারে রাজস্ব দিয়ে তাদের পুরাতন মুদ্রা 'সোনাত' নতুন মুদ্রা 'সিক্কায়' রূপান্তরিত করে নিত। অপর কারণটি হল বিদেশী বণিকরা বাংলার বস্ত্র ও রেশম কেনার জন্য বিপুল পরিমাণ সোনা ও রূপো বাংলার টাঁকশালে এনে হাজির করত। এ থেকে রাষ্ট্রের বেশ কিছু টাকা আয় হত। সুজাউদ্দিনের সময় মুর্শিদাবাদ টাঁকশালের বার্ষিক আয়ের পরিমাণ হল তিন লক্ষ চার হাজার এক'শ তিন টাকা। বাংলা সরকারের দুটি টাঁকশাল মুর্শিদাবাদ ও ঢাকা থেকে বছরে কম পক্ষে পাঁচ লক্ষ টাকা আয় হত।

রাষ্টীয় আয়ের এ চারটি (ভূমি রাজস্ব, আবওয়াব, সায়ের ও টাঁকশালের আয়) প্রধান উৎস ছাড়া বাংলার নবাবরা প্রয়োজন হলে জমিদার ও বণিকদের কাছে থেকে বিশেষ কর বা খাজনা (special levics) আদায় করতেন। গোলাম হোসেন ও হলওয়েল উভয়ে সাক্ষ্য দিচ্ছেন যে আলিবর্দী মারাঠা যুদ্ধের সময় এবং আফগান বিদ্রোহ কালে (১৭৪৫, ১৭৪৮) ইউরোপীয় বণিকদের কাছ থেকে প্রতিরক্ষার জন্য সাময়িক সাহায্য (casual aids) নিয়েছিলেন। আলি-বর্দীর যুক্তি হল প্রতিরক্ষার দায় তাঁর, অথচ এর ফলভোগ করেন ইউরোপীয়

১৩। জেমস্ গ্রাণ্ট, 'এ্যানালিসিস অব দি ফিনান্সেস অব বেঙ্গল', 'ফিফ্থ রিপোর্ট,' দ্বিতীয় খণ্ড, পৃঃ ১৯৪-২০৪। রাজধানী মুর্শিদাবাদ চুণাখালি পরগণার মধ্যে। এজন্য রাজধানীর সায়ের 'সায়ের চুণাখালি' নামে পরিচিত।

১৪। সপ্তম অধ্যায় দেখুন

বণিকরা। এ ব্যাপারে তাদেরও আর্থিক দায়িত্ব থাকা উচিত। অবশ্য তিনি একে কখনো স্থায়ী কর হিসাবে রূপ দেবার চেষ্টা করেননি। আলিবর্দ্দী বাংলার ধনী জমিদার, বিশেষ করে যাঁরা গঙ্গার পূর্ব তীরে বাস করতেন তাদের কাছ থেকে সাময়িক জবরদস্তি কর (temporary exactions) আদায় করেছিলেন। জেমস্ গ্রান্টের মতে এ খাতে আদায়ীকৃত অর্থের পরিমাণ বিপুল (a large sum)। অনেকের মতে এর পরিমাণ দেড় কোটি টাকা। ১৭৪৮ খ্রীষ্টাব্দে বিহারে আফগান বিদ্রোহের সময় আলিবর্দ্দী জগৎ শেঠ পরিবারের কাছ থেকে বিপুল পরিমাণ টাকা (mighty sums) নিয়েছিলেন। আলিবর্দ্দী জমিদারদের কাছ থেকে যে সাময়িক জবরদস্তি কর আদায় করেছিলেন জমিদাররা তার একটা অংশ বা পুরোটা অবশ্যই কৃষকদের ঘাড়ে চাপিয়েছিলেন। সিরাজুদ্দৌল্লা কলকাতা দখলের পর (জুন, ১৭৫৬) মুর্শিদাবাদে ফেরার পথে ফরাসি ও ওলন্দাজদের কাছ থেকে যথাক্রমে তিন ও সাড়ে চার লক্ষ টাকা আদায় করেছিলেন। শুধু সিরাজ নন, মুর্শিদকুলী, সুজাউদ্দিন এবং আলিবর্দীও সুযোগ পেলে ইউরোপীয় বনিকদের কাছ থেকে টাকা আদায় করতেন। ইউরোপীয় কোম্পানীগুলির কর্মচারীরা রাজ্যের বহু টাকার শুল্ক ফাঁকি দিত। বাংলার নবাবরা চাপ দিয়ে মাঝে মাঝে টাকা আদায় করে সেটা পুষিয়ে নিতেন।

এ যুগে বাংলার নবাবদের মধ্যে মুর্শিদকুলী ও সুজাউদ্দিন নিয়মিতভাবে দিল্লীর সম্রাটের প্রাপ্য রাজস্ব (Imperial tribute) পাঠিয়েছিলেন। তাঁরা প্রতিবছর এক কোটিরও কিছু বেশি টাকা দিল্লীতে পাঠাতেন। সুজাউদ্দিন প্রতি বছর এক কোটি পঁচিশ লক্ষ টাকা দিল্লীতে পাঠাতেন বলে গ্রাণ্ট সাহেব মত প্রকাশ করেছেন। এরা দুজনে প্রায় চল্লিশ কোটি টাকা রাজস্ব ও সেই সঙ্গে বহুমূল্য উপঢৌকন পাঠিয়েছিলেন। বাংলা থেকে দিল্লীতে পাঠানো উপ-ঢৌকনের মধ্যে থাকত মসলিন, হাতির দাঁতের কাজ, ভাল কাঠের কাজ, হাতি প্রভৃতি। আলিবর্দ্দী তাঁর রাজত্বের প্রথমদিকে একসঙ্গে কিছু টাকা মুঘল সম্রাট মুহম্মদ শাহকে পাঠিয়েছিলেন। সম্রাটের প্রতিনিধি মুরিদ খাঁকে তিনি কিছু উপঢৌকন দিয়েছিলেন। এরপর বাংলাদেশে মারাঠা আক্রমণ শুরু হয় এবং আলিবর্দ্দীও দিল্লীতে রাজস্ব পাঠান বন্ধ করে দেন। সিরাজদ্দৌলাও দিল্লীতে কোনো রাজস্ব পাঠাননি। মুর্শিদকুলী ও সুজাউদ্দিন দিল্লীতে যে রাজস্ব পাঠিয়েছিলেন। বাংলার অভ্যন্তরীণ অর্থনীতির ওপর নিঃসন্দেহে তার প্রভাব পড়েছিল। এ যুগে বাংলাদেশে টাকা খুব দুষ্প্রাপ্য। টাকার ক্রয় ক্ষমতাও

খুব বেশি। ১৭২৮ খ্রীষ্টাব্দ পর্যন্ত রূপোর সিক্কা টাকায় দিল্লীর রাজস্ব পাঠানো হত। পরে জগৎশেঠদের দিল্লী শাখার মাধ্যমে হুণ্ডিতে সম্রাটের প্রাপ্য রাজস্ব পাঠানো যেত। সুতরাং ১৮২৮ খ্রীষ্টাব্দ পর্যন্ত প্রতিবছর এক কোটি টাকা বাংলার অভ্যন্তরীণ বাজার থেকে উধাও হত। ফলে টাকা আরো দুষ্প্রাপ্য হত। জিনিস পত্রের দাম আরো নামত। কৃষক ও কারিগর তার শ্রমের যথোপযুক্ত মূল্য পেত না। বাংলাদেশে সঞ্চয়ও কম হত। কৃষক ও কারিগর তার শ্রমের ফসল টাকার মাধ্যমে সঞ্চয় করতে পারত না। কৃষি, শিল্প, ব্যবসা-বাণিজ্য ব্যাহত হত।

বাংলার জমির একটা অংশ জাগীর হিসাবে চিহ্নিত হত। এর আয় থেকে বাংলার প্রশাসনিক ব্যয় নির্বাহ করা হত। মুর্শিদকুলীর সময় বাংলাদেশে মোট জাগীরের পরিমাণ হল তেত্রিশ লক্ষ সাতাশ হাজার চারশ সাতাত্তর টাকার। এর মধ্যে নিজামত জাগীরের পরিমাণ চৌদ্দ লক্ষ পঞ্চান্ন হাজার দু'শ বারো টাকা। সুজাউদ্দিন ও আলিবর্দীর সময় বাংলার জাগীর জমির পরিমাণ একই ছিল। সুজাউদ্দিনের সময়, (১) নিজামতের জাগীরের পরিমাণ দশ লক্ষ সত্তর হাজার চারশ পঁয়ষট্টী টাকা, (২) দেওয়ানের জাগীর এক লক্ষ ছেচল্লিশ হাজার দুশ পঞ্চাশ টাকা, (৩) উচ্চতম রাজপুরুষদের জন্য জাগীর দু লক্ষ পঁচিশ হাজার টাকা, (৪) ঢাকা, শ্রীহট্ট, পূর্ণিয়া রঙ্গপুর ও রাজমহলের পাঁচজন সীমান্ত জেলার ফৌজদারের জাগীর চার লক্ষ বিরানব্বই হাজার চার'শ টাকা, (৫) শ্রীহট্ট, ঢাকা, হিজলি, রাজমহলের একুশজন মনসবদারের জাগীর এক লক্ষ দশ হাজার চার'শ বাহান্ন টাকা। (৬) চারজন সীমান্ত অঞ্চলের জমিদারের জন্য (ত্রিপুরা, মুচবা, সুসাঙ ও তেলিয়াগড়ি) জাগীর উনপঞ্চাশ হাজার সাত'শ পঞ্চাশ টাকা, (৭) জীবিকার জন্য 'মাদাদি মাস' পঁচিশ হাজার দু'শ পয়ষট্টি টাকা, (৮) শ্রীহট্টের জমিদারদের ভাতা পঁচিশ হাজার ন'শ সাতাশ টাকা, (৯) দুজন মৌলভীর জন্য বংশানুক্রমিক জাগীর 'এনাম আল্‌টুমগা' দু হাজার এক'শ সাতাশ টাকা, (১০) একজন মোল্লার ভাতা 'রুজিনাদারান' তিনশ সাইত্রিশ টাকা, (১১) ৯২৩ জন পর্তুগীজ নাবিকসহ ৭৬৮ খানি রণতরী সম্বলিত বাংলার নৌবহরের খরচ সাত লক্ষ আটাত্তর হাজার ন'শ চুয়ান্ন টাকা। (১২) ঢাকা, চট্টগ্রাম, রাঙামাটি ও শ্রীহট্টের সীমান্ত পাহারা দেবার জন্য সৈন্য ও গোলন্দাজ বাহিনীর জাগীর তিন লক্ষ উনষাট হাজার একশ আশি টাকা। (১৩) ত্রিপুরা ও শ্রীহট্টে রাষ্ট্রের জন্য হাতি ধরার খরচ (খেদা আফিয়াল) চল্লিশ হাজার এক'শ

এক টাকা [১৫] মোট ১৬৬০ পরগণার মধ্যে ৪০৪ পরগণার জাগীর রাজস্ব প্রশাসনিক ব্যয় নির্বাহ করার জন্য নির্দিষ্ট করে রাখা হয়েছিল।

গোলাম হোসেন জানিয়েছেন 'বাংলার নবাবরা সেনাবাহিনীতে হাজার হাজার লোক পদাতিক ও অশ্বারোহী হিসাবে নিয়োগ করতেন। তারা সব সময়ের জন্য নিযুক্ত থাকত এবং স্বচ্ছন্দ জীবন যাপন করত।'[১৬] ব্যয় সঙ্কোচে বিশ্বাসী মুর্শিদকুলী বাংলার পদাতিক ও অশ্বারোহী বাহিনী আশ্চর্য্যজনকভাবে কমিয়ে এনেছিলেন। তাঁর সময় পদাতিক বাহিনীতে মাত্র চার হাজার এবং অশ্বারোহী বাহিনীতে দুই হাজার লোক ছিল। এই হল বাংলার সমগ্র সেনাবাহিনী। এই ছোট্ট সেনাবাহিনী নিয়ে তিনি বাংলায় শান্তি বজায় রেখেছিলেন। সুজাউদ্দিন সেনাবাহিনী ব্যাড়িয়ে পঁচিশ হাজার করলেন। এর অর্ধেক পদাতিক এবং অর্ধেক অশ্বারোহী। আলিবর্দ্দীকে এক বিশাল বাহিনী পুষতে হয়েছিল। তাঁর সময় বাংলার পদাতিক ও অশ্বারোহী বাহিনীর সংখ্যা এক লক্ষে পেঁাছেছিল। সিরাজুদ্দৌলার সেনাবাহিনীর সংখ্যা দাঁড়িয়েছিল পঞ্চাশ হাজার। আলিবর্দ্দী ও সিরাজ দিল্লীতে রাজস্ব পাঠানো বন্ধ করেছিলেন। সুতরা তাঁদের পক্ষে এ বাহিনী পোষণ করা মোটেই দুঃসাধ্য হয় নি। সুজাউদ্দিন ও আলিবর্দ্দী উভয়েই সেনাবাহিনীকে সন্তুষ্ট রাখতেন। সৈন্যদের নিয়মিতভাবে বেতন, উপঢৌকন ও পুরস্কার দেওয়া হত।

মুঘল ভূমি রাজস্ব ব্যবস্থায় জনহিতকর কাজের জন্য নিষ্কর ভূমি নির্দিষ্ট করে রাখা হত। এগুলিকে বলে ওয়াকফ্ (wakf)। রাষ্ট্র থেকে এ রকম দান পেত প্রতিষ্ঠান, কোনো ব্যাক্তি বা পরিবার নয়। রাষ্ট্র থেকে মস্‌জিদ, মাদ্রাসা, মক্তব, দরগা প্রভৃতি রক্ষণাবেক্ষণের জন্য নিষ্কর ভূমি দান করা হত। এরকম জমির আয় থেকে জনহিতকর প্রতিষ্ঠানগুলির ব্যয় নির্বাহ করা হত। হিন্দুদের মন্দির, দেবালয়, সর্বজনীন পূজো যেমন শিবের গাজন প্রভৃতির জন্য ব্রহ্মোত্তর, দেবোত্তর, বিষ্ণোত্তর; শিবোত্তর ইত্যাদি নিষ্কর জমি বন্দোবস্তের নজির আছে। বাংলার নবাবরা ধর্মপ্রাণ ব্যক্তি, উচ্চবংশজাত ব্যক্তি, হেকিম কবিরাজ ও পণ্ডিত-ব্যক্তিদের জন্য নানা ধরণের জাগীর বা নিষ্কর জমি দিতেন। এ যুগে এগুলির নাম 'আইমা' ও 'মাদাদিমাস'। আইমা ও মাদাদিমাস জাগীর প্রথমে ব্যক্তি

১৫। জেমস্ গ্রাণ্ট, ঐ, ফারমিংগার, দ্বিতীয় খণ্ড, পৃঃ ১৯৪-২০৪।

১৬। গোলাম হোসেন, 'সিয়ার', তৃতীয় খণ্ড পৃ: ২০২।

বিশেষকে সারাজীবনের জন্য দেওয়া হত। পরবর্তীকালে ঐ ব্যক্তির পরিবার পুরুষানুক্রমে তা ভোগ করত। ১৬৯০ খ্রীষ্টাব্দে সম্রাট আরঙ্গজেব এক ফরমান জারী করে 'মাদাদিমাস' জাগীর পুরুষানুক্রমে ভোগ করার অধিকার দেন। এ ধরণের জাগীরগুলি অধিকারীরা নিঃশর্তে ভোগ দখল করত। এছাড়া কৃতী রাজ-পুরুষদের ভোগ করার জন্য জাগীর দেওয়া হত।[১৭] এ ধরণের জাগীরগুলিকে তিন ভাগে ভাগ করা যায়। ইনাম-ই আলতামঘা বা পুরুষানুক্রমে ভোগ করার জাগীর, জাবতি বা সারাজীবন ভোগ করার জাগীর এবং মাসরুৎ বা শর্তাধীন জাগীর। কর্মচারী চাকরীতে ইস্তফা দিলে বা অবসর গ্রহণ করলে এ ধরণের জাগীর রাষ্ট্র ফিরে পেত।[১৮] তাছাড়া পান্থশালা, ফকির, মুসাফির প্রভৃতির জন্য জাগীর বরাদ্দ হত।[১৯]

এ যুগে বাংলার নবাবরা আর্ত মানুষ, গরীব দুঃখীদের নানাভাবে সাহায্য করতেন। গোলাম হোসেনের বিবরণী থেকে জানা যায় আলিবর্দীর ভ্রাতুষ্পুত্র ও জামাতা নওয়াজেস মোহাম্মদ খাঁ মুর্শিদাবাদের দুস্থ বিধবা ও বৃদ্ধদের গোপনে সাহায্যে করার জন্য মাসে তিরিশ হাজার টাকা খরচ করতেন।[২০] তিনি আরো জানিয়েছেন এ যুগে অনেকেই রাজ্যের কোষাগার থেকে পেন্‌সন পেত। আর্ত ও দুঃখীরা দেওয়ানী রেজিষ্টরে তাদের নাম লেখাত এবং রাজকোষ থেকে পেন্‌সন পেত। মুর্শিদকুলী, সুজাউদ্দিন ও আলিবর্দী পণ্ডিত ও ধর্মপ্রাণ ব্যক্তিদের শ্রদ্ধা করতেন। রাষ্ট্র থেকে এদের জীবিকার ব্যবস্থা করা হত। মুর্শিদকুলী রাজধানীর গরীবদের নিয়মিত খাওয়ানোর ব্যবস্থা করেছিলেন। ভবঘুরে, দুঃখী, আর্ত, অনাথ মানুষরা তাঁর সময়ে রাজধানীতে নিয়মিত আহার পেত। তিনি রাজধানীতে রবিউল আওয়াল মাসে পয়গম্বর হজরত মোহাম্মদের পবিত্র জন্ম ও মৃত্যু দিনে উৎসব করতেন। রাজধানীতে কোরাণ পাঠ ও অন্যান্য ধর্মীয় কাজকর্ম করার জন্য মুর্শিদকুলী দু হাজার লোক নিযুক্ত করেছিলেন। সুজাউদ্দিন প্রতি বছর বিরাট রাষ্ট্রীয় ভোজসভার আয়োজন করতেন। সেখানে দেশের বিদ্বান ও পণ্ডিত ব্যক্তিরা বিশেষভাবে আমন্ত্রিত হতেন। ব্যক্তিগত ভাবে তিনি ছিলেন খুবই উদার প্রকৃতির মানুষ। রাষ্ট্রের কোষাগার থেকে নিয়মিতভাবে তিনি তাঁর কর্মচারীদের আর্থিক

১৭। ইরফান হাবিব, 'এগ্রারিয়ান সিস্টেম অব মুঘল ইণ্ডিয়া' অষ্টম অধ্যায় দ্রষ্টব্য।

১৮। আমিনি কমিশন রিপোর্ট ; আর. বি. র‍্যামস্ বোথাম, 'স্টাডিজ ইন দি ল্যান্ড রেভিন্যু হিস্ট্রি অব বেঙ্গল', ১৭৬৯-১৭৮৭, পৃঃ ১০৭।

১৯। ফাজ্‌ল রাব্বি, ঐ, পৃঃ ৬৬-৬৯।

২০। গোলাম হোসেন, 'সিয়ার', প্রথম খণ্ড, পৃঃ ৩৫৬-৩৫৭।

সাহায্য দিতেন। মাঝে মাঝে অযাচিতভাবে উপহার পাঠাতেন।[২১] সাময়িক ব্যক্তিদের বিবরণে জানা যায় তিনি দরিদ্র ব্যক্তিদের অকাতরে টাকা বিলোতেন।

এ যুগে বাংলার নবাবদের মধ্যে মুর্শিদকুলী ও সিরাজুদ্দৌলা উভয়ে রাষ্ট্রীয় ব্যয় সঙ্কোচ (retrenchment) করার চেষ্টা করেছিলেন। মুর্শিদকুলী সব সময়ে প্রশাসনিক ব্যয় কমানোর দিকে লক্ষ্য রাখতেন। দুর্নীতি বন্ধ করার জন্য তিনি নিজে হিসাব পরীক্ষা করে খাতায় সই করতেন। উচ্চ পদস্থ কর্মচারীদের বেতন কমিয়ে এবং সৈন্য সংখ্যা হ্রাস করে মুর্শিদকুলী রাজকোষে উদ্বৃত্ত টাকার ব্যবস্থা করেছিলেন। সিরাজুদ্দৌলাও ব্যয় সঙ্কোচ করার পক্ষপাতী ছিলেন। রাষ্ট্রের বাড়তি খরচ তিনি নতুন কর (contributions) বসিয়ে তুলে নিতেন। তিনি সব সময় খরচ কমানো এবং আয় বাড়ানোর দিকে নজর রাখতেন। আত্মীয়দের মোটা বেতনের কর্মহীন উচ্চপদ এবং পেন্সন তিনি কেড়ে নিয়েছিলেন। এতে আলিবর্দীর সময়কার প্রশাসনিক কাঠামো ক্ষতিগ্রস্থ হয়েছিল।[২২]

২১। ফজলে রাব্বি, ঐ, পৃ: ৩৭-৩৯।
২২। মশিয়ে লর মেমোয়ার; এস. সি. হিল, 'থ্রি ফ্রেঞ্চমেন ইন বেঙ্গল', পৃ: ৭৪-৭৫।

ষষ্ঠ অধ্যায়

দ্রব্যমূল্য, মূল্যস্তর, বাজার ও মজুরি

প্রাক্-পলাশী যুগে বাংলার দ্রব্যমূল্য, মূল্যস্তর, বাজার ও মজুরির আলোচনার সুবিধার্থে ১৭৩৭ খ্রীষ্টাব্দকে বিভাজন রেখা হিসাবে ধরা যেতে পারে। বিষয়ের দিকে লক্ষ্য রেখে এ যুগকে দুই পর্বে ভাগ করা যায়। ১৭০০ থেকে ১৭৩৭ একটি পর্ব, অপরটি হল ১৭৩৭ থেকে ১৭৫৭ পর্যন্ত। অনেকগুলি কারণে ১৭৩৭ থেকে বাংলার অভ্যন্তরীন বাজারে দ্রব্যমূল্য, মূল্যস্তর এবং সেই সঙ্গে মজুরি ক্রমাগত বাড়তে থাকে। ১৭৫৫ খ্রীষ্টাব্দ নাগাদ এই ঊর্ধ্বগতি চরম আকার ধারণ করেছিল। ঐ বছর নভেম্বর ডিসেম্বর মাসে ভাল ফসলের সম্ভাবনা দেখা দিল এবং মূল্যস্তরও নামতে শুরু করল। ১৭৩৭ খ্রীষ্টাব্দ থেকে মূল্য সূচক বাড়ার কারণ হিসাবে অর্থনীতিবিদ্ ও ইতিহাসবিদ্‌রা কতকগুলি প্রাকৃতিক, রাজনৈতিক, আর্থিক ও সামাজিক কারণ দেখিয়েছেন। (১) ১৭৩৭ খ্রীষ্টাব্দের ৩০শে সেপ্টেম্বর ও ১লা অক্টোবর বাংলাদেশে প্রবল ঝড় হয়; এতে প্রচুর ক্ষয় ক্ষতি হয় এবং এর পরের বছর প্রায় দুর্ভিক্ষের অবস্থা সৃষ্টি হয়। (২) ঝড় ও দুর্ভিক্ষের প্রকোপ থেকে রক্ষা পাওয়ার দু-তিন বছর পরেই বাংলাদেশে শুরু হল মারাঠা আক্রমণ (১৭৪২—১৭৫১)। এ আক্রমণ পশ্চিম বাংলায় সীমাবদ্ধ থাকলেও বাংলার কৃষি, শিল্প ও বাণিজ্যের ক্ষতি হয়েছিল। মারাঠা আক্রমণ রুখতে বাংলা সরকারকে প্রচুর সৈন্য সংগ্রহ করতে হয় এবং মোটা টাকা সৈন্য বাহিনীর বেতন হিসাবে খরচ হয়। একই সঙ্গে শুরু হয় বিহারে আফগান বিদ্রোহ (১৭৪৫, ১৭৪৮)। সম্রাটের প্রাপ্য রাজস্ব পাঠানো বন্ধ হল এবং নবাবদের প্রতি বছর বহুমূল্য হীরে মণি জহরত কিনে টাকা জমানোর প্রবণতা আর দেখা গেল না। ফলে বেশ কিছু টাকা বাংলার অভ্যন্তরীণ বাজারে এল। (৩) বাংলা সরকার অভ্যন্তরীণ বাণিজ্য শুল্কের তাৎপর্য উপলব্ধি করে বাজার থেকে বেশ কিছু টাকা সায়ের খাতে আদায় করছিলেন। স্থানীয় শুল্কের জন্য স্থানীয় বাজারে ভোগ্য পণ্য ও নিত্য প্রয়োজনীয় জিনিস পত্রের দাম ক্রমাগত বেড়ে চলল। (৪) বিভিন্ন ইউরোপীয় বণিক সম্প্রদায় এ সময়ে বাংলার বাজার থেকে প্রচুর পরিমাণে সূতী ও রেশমী কাপড় এবং কাঁচা রেশম কিনত। তাতে প্রতিযোগিতামূলক বাজারের রীতি অনুযায়ী জিনিস পত্রের দাম বাড়ল। (৫) ১৭৫১ খৃষ্টাব্দের এপ্রিল মাসে

দেশের বিভিন্ন স্থানে বন্যা হয়। তাতে খাদ্য শস্যের দাম বেড়ে যায়।[১] খাদ্য শস্যের দাম বাড়লে দেশে উৎপন্ন অন্যান্য পণ্যেরও দাম বাড়ে। এর সঙ্গে ছিল বিদেশীদের আনা বিপুল পরিমাণ সোনা ও রূপো। সব মিলিয়ে অভ্যন্তরীণ বাজারে টাকার যোগান বেশি হল, উৎপাদন কমলো, লোকসংখ্যা বাড়ল, ফলে দ্রব্য মূল্যের ঊর্ধ্বগতি। জিনিসের দাম বাড়লে জীবনধারণের মূল্য সূচক বাড়ে এবং এর সঙ্গে সঙ্গতি রেখে বেতন, মজুরি ইত্যাদিও বেড়ে চলে। ১৭৩৭ থেকে ১৭৫৭ পর্যন্ত বাংলাদেশে এই ধারাটি অব্যাহত ছিল।

শতাব্দীর শুরুতে বাংলার অভ্যন্তরীণ বাজারে মুদ্রার সরবরাহ খুব কম। অর্থনীতির এক মূল সূত্র হল আর্থিক কাজকর্ম, লোক সংখ্যা, বাণিজ্যর পরিমাণ ইত্যাদির সঙ্গে সঙ্গতিপূর্ণ হবে বাজারে মুদ্রার যোগান, তা না হলে নানারকম বিপরীত প্রতিক্রিয়া দেখা দেবে। এ যুগে বাংলার কৃষির অবস্থা যথেষ্ট ভাল, শিল্প উৎপাদন আশাতিরিক্ত এবং বাণিজ্যের পরিমাণও মন্দ নয়। এগুলি যথাযথভাবে পরিচালনার জন্য যে পরিমাণ অর্থের প্রয়োজন বাংলার বাজারে তার সরবরাহ ছিল না। এর কারণ প্রধানত দুটি। ১৭৩৯ খ্রীষ্টাব্দ পর্যন্ত প্রতি বছর গড়ে এক কোটি টাকা বাংলা থেকে দিল্লীতে পাঠানো হত। ১৭২৮ খ্রীষ্টাব্দ পর্যন্ত এ রাজস্ব যেত বাংলার নিজস্ব রৌপ্য মুদ্রা সিক্কায়। দ্বিতীয়ত, মুর্শিদকুলী তাঁর সঞ্চিত টাকা মণি মুক্তায় রূপান্তরিত করে গোপন স্থানে রেখে দিতেন।[২] ফলে বংলার অভ্যন্তরীণ বাজারে টাকার যোগান খুব কম থাকত। আর্থিক লেনদেনের অসুবিধা হত। জিনিস পত্রের দাম কম থাকত। লোকের বেতন ও মজুরিও কম। কৃষক, শিল্পী, মজুর, কারিগর তাদের পরিশ্রমের ন্যায্য মূল্য পেত না, সঞ্চয় কম হত। পুঁজির অভাবে ব্যক্তিগত উদ্যোগে নতুন নতুন ব্যবসা, বাণিজ্য, কৃষি ও শিল্পের উন্নয়ন মূলক পরিকল্পনা করা সম্ভব হত না।

মুর্শিদকুলীর সময় বাজারে জিনিস পত্রের দাম খুব কম। সমকালীন ব্যক্তিদের বিবরণ থেকে জানা যায় বাজার ও দোকান জিনিসপত্রে পূর্ণ থাকত। প্রধান প্রধান শহর—বর্ধমান, মুর্শিদাবাদ, কলকাতা হুগলী ও ঢাকা ছাড়াও

১। গোবিন্দ রাম মিত্রের চিঠি ২০শে নভেম্বর, ১৭৫২। গোবিন্দরাম কলকাতার কোম্পানীর রাজস্বের ম্যানেজার ছিলেন। তিনি কলকাতা কাউন্সিলের প্রেসিডেন্টকে এ চিঠি লেখেন।

জেমস্ লঙ্ 'সিলেকশনস্ ফ্রম আনপাবলিশড্ রেকর্ডস্ অব দি গভর্ণমেন্ট, ১৭৪৮-১৭৬৭', রেকর্ড নং ৯৯, পৃঃ ৪৫-৪৮।

২। সলিমুল্লাহ 'তারিখ-ই-বাঙ্গালা', ইং অনুঃ ফ্রান্সিস্ গ্ল্যাডউইন, পৃঃ ৪৮।

বাংলার সর্বত্র হাট, গঞ্জ ও বাজার ছিল।[৩] ভারতচন্দ্র, রামপ্রসাদ ও হলওয়েল বর্ধমান বাজারের কথা উল্লেখ করেছেন। এখানে বহু বিদেশী বাণিজ্য করতে আসত। রামপ্রসাদের 'বিদ্যাসুন্দর' থেকে জানা যায় বহু সুন্দর সুন্দর-শৌখিন বিলাতি জিনিস বাজারে থাকলেও খরিদ্দারের অভাবে ওসব পড়ে থাকত। এ যুগে বাংলার মানুষের ক্রয় ক্ষমতা কম, আয় কম, যেটুকু আয় সেটুকু জীবন-ধারণের নিত্য প্রয়োজনীয় জিনিস কিনতে ব্যয় হয়, শৌখিন জিনিস কেনার টাকা থাকে না। মুর্শিদাবাদের কাছে ভগবানগোলা এ যুগের এক বিশাল বাজার, এখান থেকে বাংলা সরকার বার্ষিক তিন লক্ষ টাকা বাণিজ্য শুল্ক পেত। এখানে প্রধানত শস্য, তেল ও ঘি পাইকারি বিক্রি হত। হলওয়েল জানিয়েছেন নাটোর জমিদারিতে অনেকগুলি বাজার ছিল। এগুলি হল বোয়ানগঞ্জ, শিবগঞ্জ, স্বরূপগঞ্জ ও জামালগঞ্জ।[৪] নাম থেকে বোঝা যায় এগুলি সবই বাজারের নাম। কলকাতায় দশ এগারোটি বাজার ছিল। টাকার ক্রয় ক্ষমতা বেশি ; তাই বেতন ও মজুরি কম হলেও সাধারণ মানুষের জীবন ধারণে কোনো অসুবিধা হত না। মুর্শিদকুলীর সময় এক টাকায় চার পাঁচ মণ চাল পাওয়া যেত।[৫] তেমনি একজন দিন মজুর আয় করত ১ পণ ১২ গণ্ডা কড়ি। একজন কেরানী মাসিক ৪ টাকা ৬ আনা, পুলিশ দারোগা ৪ টাকা, তাঁতি ৫ টাকা এবং কুশলী কারিগর দৈনিক ১০ পয়সা রোজগার করত। এ যুগে একজন রাজস্ব আদায়কারী মাসে এক টাকা তেরো আনা, একজন পুলিশ কনেস্টবল এক টাকা আট আনা ও একজন রাজমিস্ত্রী দৈনিক দুপণ এক গণ্ডা কড়ি আয় করত। তেমনি এ যুগে সমস্ত নিত্য প্রয়োজনীয় জিনিসের দাম সস্তা। একমণ চিনির দাম চার টাকা, একমণ তেল দু টাকা, এবং একমণ মাখন সাড়ে চার টাকা। দু টাকায় একজন লোক তার স্ত্রী ও সন্তানকে নিয়ে স্বচ্ছন্দে মাস কাটাতে পারত। রিয়াজ-উস্-সালাতীন রচয়িতা জানিয়েছেন 'এ যুগে লোকে এক টাকা ব্যয় করে সারা মাস 'কালিয়া পোলাও' খেত। দ্রব্য মূল্য কম থাকার জন্য গরীবরা শান্তি ও স্বস্তিতে ছিল'।[৭] ১৭৩৭ খ্রীষ্টাব্দ পর্যন্ত বাংলার খাদ্য শস্য ও অন্যান্য জিনিসের দাম বেশ সস্তা। এ সময়ে দিল্লী ও গুজরাটের তুলনায় বাংলাদেশে খাদ্যশস্যের

৩। রেনেল, 'জার্নালস্' পৃঃ ৮৩।
৪। হলওয়েল, 'ইন্টারেস্টিং হিস্টোরিকাল ইভেন্টস্', পৃঃ ১৯৩।
৫। ১ নং তালিকা দেখুন।
৬। ৩ নং তালিকা দেখুন।
৭। গোলাম হোসেন সলিম, 'রিয়াজ', পৃঃ ২৮০-২৮১।

দাম কম। বাংলার সূতীবস্ত্র ও সিল্ক এশিয়ার বিভিন্ন দেশে সমমানের পণ্যের চেয়ে কম দামে সরবরাহ করা যেত। পারস্য ও চীনের সিল্ক কাপড়ের চেয়ে এ যুগে বাংলার সিল্ক কাপড় দামে সস্তা। জাভার চিনির চেয়ে কমদামে বাংলার চিনি ভারত ও এশিয়ার বাজারে সরবরাহ করা হত।

মুর্শিদকুলী রাজধানী মুর্শিদাবাদের বাজার, বাজার দর ও নিত্য প্রয়োজনীয় জিনিস পত্রের দাম সম্পর্কে সব সময় অবহিত থাকতেন, এদিকে তাঁর কড়া নজর ছিল। তিনি তাঁর কর্মচারীদের দিয়ে বাজারে বিক্রয়যোগ্য সমস্ত পণ্যের মূল্য তালিকা প্রস্তুত করাতেন। গরীব মানুষরা বাজারে কি দামে জিনিস পত্র কেনে সে সম্পর্কে খোঁজ খবর নিয়ে তিনি উভয় তালিকা মেলাতেন। যদি দেখা যেত গরীব খরিদ্দার এক 'দাম'ও[৮] বেশি দিয়ে কোনো জিনিস কিনতে বাধ্য হয়েছে তখনি তিনি দোকানী, মহলদার ও ওজনদারদের ডেকে পাঠাতেন। এদের জন্য ছিল কাঠোর শাস্তির ব্যবস্থা। গাধার পিঠে চাপিয়ে এদের সারা শহরে ঘোরানো হত।

বাংলাদেশের সর্বত্র এবং কলকাতায় বাজার, বাজার দর, বিক্রয় যোগ্য পণ্যের মান, ওজন ও মাপ দেখার জন্য নবাব, কোম্পানী ও জমিদারদের পক্ষ থেকে বিভিন্ন শ্রেণীর কর্মচারী থাকত। কলকাতায় কোতোয়াল, রাজধানী শহরে মহলদার এবং অন্যত্র জমিদারদের কর্মচারীরা বাজারগুলি দেখা শোনা করত। কলকাতায় এ বিষয়ে বেশ খানিকটা কড়াকড়ি ছিল। কোম্পানীর বাজার সম্পর্কিত নিয়ম রীতি ভঙ্গ করলে, বেশি দাম নিলে, খারাপ জিনিস বিক্রি করলে বা ওজনে কম দিলে অপরাধী শাস্তি পেত।[৯] রাজধানীতে বা বড় শহর গুলিতে এ ধরণের অপরাধ কিছুটা নিয়ন্ত্রণ করা যেত। বাংলার গ্রামাঞ্চলে এ অপরাধ বড় বেশি ছিল। একই বাজারে বিভিন্ন পণ্যের জন্য ছিল বিভিন্ন মাপ ও ওজন। পণ্য এক ওজনে কেনা হত অন্য ওজনে বিক্রি করা হত। দাঁড়িপাল্লা ও ওজন সবই খরিদ্দার ও উৎপাদকদের ঠকাত। সাধারণভাবে 'বিরাশি ওজন' ছিল ঠিক। তবে ব্যবসায়ীরা সব সময় এ ওজন মানত না। ওজনের ওপর সরকারী ছাপ মারার ব্যবস্থা ছিল না। খুচরা কেনা বেচার জন্য কড়ি ব্যবহার করা হত।

১৭৫৩ খ্রীষ্টাব্দের গ্রীষ্মকালে ঈষ্ট ইণ্ডিয়া কোম্পানীর গুদামবাবু চার্লস ম্যানিংহাম এবং উইলিয়ম ফ্রাঙ্ক ল্যাণ্ড বাংলাদেশে কোম্পানীর বাণিজ্য ও পণ্য

৮। ৪০ দামে এক টাকা।
৯। কোর্টের চিঠি, ১১ই ফেব্রুয়ারী, ১৭৫৬।

সংগ্রহ পদ্ধতি আলোচনাকালে দ্রব্যমূল্য বৃদ্ধির কথা উল্লেখ করেছিলেন। তারা বাংলাদেশে প্রতিটি খাদ্যবস্তু ও নিত্য প্রয়োজনীয় জিনিসের দাম বেড়েছে বলে জানিয়েছিলেন। তাদের মতে এদেশে দ্রব্যমূল্য বৃদ্ধির শুরু গত দশ কুড়ি বছরে। তারা লিখেছিলেন 'পণ্য উৎপাদন খরচ ও অন্যান্য অনেক জিনিসের দামের সঙ্গে খাদ্য বস্তুর দামের যোগ আছে।' ১৭৪০ খ্রীষ্টাব্দ থেকে বাংলাদেশে জিনিসের দুষ্প্রাপ্যতার সঙ্গে জিনিসের দামের উর্ধ্বগতির সম্পর্ক তারা লক্ষ্য করেছিলেন। এর মধ্যে অর্থনীতির চিরন্তন সত্যটি নিহিত। সুতীবস্ত্রের দাম বাড়ছে কারণ সুতোর ও খাদ্যবস্তুর দাম বাড়ছে। এগুলির দাম বাড়ার কারণ সরবরাহ কম। সরবরাহ কম হওয়ার কারণ মারাঠা আক্রমণ ঝড়, বন্যা ও ফসলের ক্ষতি। শুধু এ যুগের বাংলার অভ্যন্তরীণ বাজার দরের একটি দিক তারা বুঝতে পারেননি। বাজারে টাকার যোগানের সঙ্গে মূল্যস্তরের সম্পর্ক (Quantity

তালিকা ১

১৭৩৭ খ্রীষ্টাব্দের আগে দ্রব্যমূল্য

সময় ১৭০০-১৭২২

জিনিস	পরিমাণ মণ	সের	দাম টাকা	আনা	পয়সা
চাল (ভাল)	২	—	১		
চাল (মোটা)	৪/৫	—	১	—	—
চিনি	১ বেল=২ মণ	১০ সের	৯/১০	—	—
মাখন	১		৪/৫	—	—
তেল	১		১	১২/২ টাকা	
লম্বা লংকা	১		৪/৫		
লংকা	১		১২	১২	—
বাদাম	১		৫	১	—
কিসমিস	১		৩	৬	—
শুকনো আঙুর	১		৪	২	—
নভেম্বরবন্দ সিল্ক		১	৪	২	—
ব্রড ক্লথ (বিদেশী) (সাধারণ)	১ গজ		২	—	—
সোরা	১		৫	৩	—
সীসা	১		৪	২	—
সাদা সীসা	১		২০	—	—
চকমকি পাথর		১ পাউন্ড	—	৯	—
মাদেরা মদ	১ পাইপ		১২৬-১৭৮	৯	৯

সূত্র: ডায়েরি এন্ড কনসালটেশন বুক ১৭০৮—১৭২২; সিলেক্ট রিপোর্ট ১৭৮২, সংযোজন ১৫।

তালিকা ২

১৭৩৭ খ্রীষ্টাব্দের আগে দ্রব্য-মূল্য

সময় ১৭২৯

	পরিমাণ		দাম		
জিনিস	মণ	সের	টাকা	আনা	পয়সা
বাঁশফুল ভাল চাল ১ নং	১	১০	১		
চাল ২ নং	১	২৩	১		
চাল ৩ নং	১	৩৫	১		
দেশনা চাল (মোটা)	৪	১৫	১		
পূর্বী চাল (মোটা)	৪	২৫	১		
মুনসারা চাল (মোটা)	৫	২৫	১		
কুরকাশালী চাল (মোটা)	৭	২০	১		
গম ১ নং	৩	১	১		
গম ২ নং	৩	৩০	১		
যব	৮	৩৫	১		
ভেনট (ঘোড়ার খাদ্য)	৪		১		
তৈল ১ নং		২১	১		
তৈল ২ নং		২৪	১		
ঘি ১ নং		১০½	১		
ঘি ২ নং		১১¼	১		

সূত্র ঃ ডায়েরি এন্ড কনসালটেশন বুক ১৭০৮—১৭১২ ; সিলেক্ট রিপোর্ট ১৭৮২, সংযোজন ১৫।

তালিকা ৩

১৭৩৭ খ্রীষ্টাব্দের আগের বেতন/মজুরী তালিকা

সময় ১৭০০—১৭২২	বেতন ঃ মাসিক	দৈনিক	টাকা	আনা	পয়সা	কড়ি
কেরাণী	,,		৪	৬	—	—
পুলিশ দারোগা	,,		৪			
রাজস্ব আদায়কারী	,,		১	১৩	—	—
পুলিশ কনেস্টবল	,,		১	৮	—	—
তাঁতি	,,		৫	—	—	—
সাধারণ মজুরী/কুলি		,,				১ পণ ১২ গন্ডা কড়ি
[illegible]		,,				২ পণ ১ গন্ডা কড়ি
কুশলী কারিগর		,,				১০ পয়সা

সূত্র ঃ ডায়েরি এন্ড কনসালটেশন বুক ১৭০০—১৭২২। সি. আর, উইলসন, 'আরলি এ্যানালস্ অব দি ইংলিশ ইন বেগল' চার খন্ড।

theory of money)। ১৭২০ থেকে ১৭৬০ পর্যন্ত বাংলার কাঁচা রেশম ও সূতীবস্ত্রের দাম ক্রমাগত বেড়ে যায়। বাংলার আন্তর্জাতিক বাণিজ্যও এ সময় অসাধারণ বেড়ে যায় ইউরোপীয় কোম্পানীগুলি বিপুল পরিমাণ সোনা রূপো বাংলার টাঁকশালে নিয়ে এল। বাংলার বাজারে টাকার যোগান অনেকখানি বেড়ে গেল। এ যুগে বাংলার আর্থিক কাজকর্ম যে অনেক গুণ বেড়েছিল তাতে কোনো সন্দেহ নেই। ইউরোপীয় প্রতিদ্বন্দ্বীদের মধ্যে প্রতিযোগিতার জন্য রপ্তানিযোগ্য পণ্যগুলির দাম কিছুটা বেড়েছিল। ১৭৪৩ খ্রীষ্টাব্দ থেকে বাংলার চালের দাম হঠাৎ বাড়তে শুরু করে। ১৭৪৪ ও ১৭৫৩ খ্রীষ্টাব্দে চালের দাম সর্বোচ্চ সীমায় পৌঁছেছিল। তারপরে আবার কিছুটা নেমে এসে স্থিতিশীল হয়। ১৭৪০ খ্রীষ্টাব্দ থেকে বাংলার মূল্যস্তরে উধ্ব'গতির একটাই সম্ভাব্য ব্যাখ্যা। এশীয় ও ইউরোপীয় বাজারে বাংলার রপ্তানি যোগ্য পণ্যের চাহিদা বৃদ্ধি। বিদেশীরা নগদ টাকায় বাংলার বাজারে পণ্য কিনত। বাঙালীর হাতে বেশি টাকা আসায় অভ্যন্তরীণ বাজারে খাদ্য ও ভোগ্য পণ্যের চাহিদা বাড়ল। এর ফলে মূল্যস্তরের ওপর চাপ এবং দ্রব্যমূল্য বৃদ্ধি।[১০]

১৭৩৭ খ্রীষ্টাব্দ থেকে বাংলায় জিনিস পাত্রের দাম ক্রমশ বাড়তে থাকে। ১৭৫৭ খ্রীষ্টাব্দ নাগাদ এ বৃদ্ধির পরিমাণ দাঁড়ায় প্রায় শতকরা ৩০ ভাগ। কার্পাস, নীল এবং খাদ্য দ্রব্যের দাম বাড়ে চারগুণ।[১১] অন্য সমস্ত জিনিসের দাম আনুপাতিক হারে বেড়েছিল। ১৭৩৮ খ্রীষ্টাব্দ থেকে সমস্তরকম কাপড়ের দাম বেড়েছিল শতকরা ৩০ ভাগ। কোনো কোনো ক্ষেত্রে এ বৃদ্ধির হার তারও বেশি। যে চাল ছিল এক টাকায় চার থেকে পাঁচ মন তা বেড়ে গিয়ে দাঁড়াল টাকায় এক মণ তিরিশ সের। তেল একমণের দাম পাঁচ টাকা, ময়দা একমণ তিন টাকা, চিনি একমণ ষোল টাকা ও মাদ্রাজ লবণ এক মণ এক টাকা। দ্রব্য মূল্য বৃদ্ধির সঙ্গে সঙ্গতি রেখে সমস্ত শ্রেণীর কর্মচারী, শ্রমিক, মজুর, তাঁতি ও কারিগরের বেতন ও মজুরি বেড়েছিল। এ যুগে একজন শ্রমিক বা দিন মজুর দৈনিক দুপণ বারো গণ্ডা কড়ি রোজগার করত। পলাশী যুদ্ধের আগে একজন শ্রমিক বা কুলির মাসিক আয় দাঁড়ায় দু টাকা।[১২] এ যুগে একজন নৌকা মাঝির

১০। কে, এন, চোধুরী, 'দি ট্রেডিং ওয়ার্ল্ড' অব এশিয়া এন্ড দি ইংলিশ ঈস্ট ইন্ডিয়া কোম্পানী', পৃঃ ৯৯-১০৮।

১১। ৪ নং তালিকা দেখুন।

১২। ৬ নং তালিকা দেখুন।

মাসিক আয় তিন টাকা, পিওন ও দারোয়ান দু টাকা, মহিলা শ্রমিক এক টাকা, ইট মিস্ত্রী তিন টাকা। কলকাতায় বেতন হার বেশি। এখানে একজন রাঁধুনি মাসে বেতন পেত পাঁচ টাকা, একজন দাসী পাঁচ টাকা এবং একজন লস্করও পাঁচ টাকা। এ যুগে কেরানী ও অন্যান্য কর্মচারীদের বেতন আনুপাতিক হারে বেড়েছিল তবে তাঁতিদের বেতন তেমন বাড়েনি।

তালিকা ৪

১৭৩৭—১৭৫৭ খ্রীষ্টাব্দের মধ্যে দ্রব্যমূল্য

সময় ১৭৩৮	পরিমাণ		দাম		
জিনিস	মণ	সের	টাকা	আনা	পয়সা
চাল	২ — ২০ সের — ৩ মণ		১		
কার্পাস	১		২—২	৮	—
১৭৫১—১৭৫২					
চাল	১—৩২ সের—১—১৬ সের		১		
অন্যান্য শস্য	১—১—১২ সের		১		
গম	১—৩২ সের—১—৬ সের		১		
ময়দা	১—৩ সের—১ মণ		৩		
তেল	১		৫		
নীল	১		২২		
কার্পাস		২৫	১		
কাশিম বাজার সিল্ক		১	৫	৮	
সোরা	১		৪	৮	
জ্বালানী কাঠ	১০০		১০		
১৭৫৯					
লবঙ্গ		১	১৬		
জৈত্রী		১	১২	২	
জায়ফল		১	৬		
লংকা	১		২৫		
দারুচিনি		১	৫		
বাদাম	১		২৫		
শুষ্ক কিসমিস	১		৬০		
দড়ি	১		১২		
সাদা সীসা	১		৮		
মোম	১		৩২		
হিং	১		১০০		
চিনি	১		১৬		
পারদ		১	২	১২	
ইউরোপের লোহা	১		৯	৮	
ইসপাত	১		১৫		
মাদ্রাজ লবণ	১০০		১০০		

তালিকা ৪

১৭৩৭—১৭৫৭ খ্রীষ্টাব্দের মধ্যে দ্রব্যমূল্য

	পরিমাণ			দাম		
জিনিস	মণ		সের	টাকা	আনা	পয়সা
তামাক	১			১০		
টিন	১			২৪		
ইট		এক হাজার		৩	১০	
চূণ	১০০			৩৯		
মিষ্টি			১			১ কাহন কাড়ি
পান		দুপণ				২০ গণ্ডা কাড়ি

সূত্র : কনসালটেশন, ১১ই ডিসেম্বর, ১৭৫২, গোবিন্দরাম মিত্রের চিঠি, প্রসিডিংস্, ২৬ সেপ্টেম্বর, ১৭৫৭ এবং প্রসিডিংস্, ১৫ই জানুয়ারী, ১৭৫৯।

তালিকা ৫

বাজার দর : ১৭৪৯—১৭৫১

	পরিমাণ		দাম		
জিনিস	মণ	সের	টাকা	আনা	গণ্ডা
চাউল		১			৫
লংকা মরিচ		১			৫
গুড়		১			১০
লবণ		১			১০
রসুন, পিঁয়াজ		১			১০
কার্পাস		১			৫
কলাই		১			৫
মুশুরি		১			১০
মটর		১			১০
অড়হর		১		১	
মুগ		১		১	
তৈল		১		৩	
ঘৃত		১		৪	

[illegible]

মনহুর তার 'শমশের গাজীর গান' নামক কাব্যে এ তথ্য দিয়েছেন। দীনেশ চন্দ্র সেনের 'বৃহৎবঙ্গ' দ্বিতীয় খণ্ড, পৃ : ১০৪১—১০৪২ থেকে গৃহীত।

তালিকা ৬

১৭৩৭—১৭৫৯ খ্রীষ্টাব্দের মধ্যে বেতন/মজুরি

সময় ১৭৩৯	বেতন : মাসিক / দৈনিক	টাকা	আনা	পয়সা	কড়ি
ইটামিস্ত্রি	,,	৩	—	—	—
ছুতোর	,,	২	১৫	—	—
মহিলা শ্রমিক	,,	১	—	—	—
কুলি / মজুর	,,	২	—	—	—
নৌকা মাঝি	,,	৩	—	—	—
পিওন	,,	২	৮	—	—
দারোয়ান	,,	২	৮	—	—
ধোপা	,,	১০	—	—	—
নাপিত	,,	৩	—	—	—
মশালচি	,,	২	—	—	—
সময় ১৭৫৯					
চোপদার	,,	৫	—	—	—
প্রধান রাঁধুনী	,,	৫	—	—	—
কোচম্যান	,,	৫	—	—	—
প্রধান দাসী	,,	৫	—	—	—
জমাদার	,,	৪	—	—	—
খিতমতগার	,,	৩	—	—	—
রাঁধুনীর প্রধান সহায়ক	,,	৩	—	—	—
হেড বেয়ারা	,,	৩	—	—	—
দ্বিতীয় দাসী	,,	৩	—	—	—
পিওন	,,	২	—	—	—
পরিবারের ধোপা	,,	৩	—	—	—
এক জনের ধোপা	,,	১	৮	—	—
সহিস	,,	১	—	—	—
নাপিত	,,	১	৮	—	—
হেয়ার ড্রেসার	,,	১	৮	—	—
গৃহমালি	,,	২	—	—	—
ঘাসুড়ে	,,	১	৪	—	—
নার্স	,,	৪	—	—	—
সারেঙ্গ	,,	১০	—	—	—
ছুতোর	,,	৫	—	—	—

সূত্র : কাশিমবাজার ফ্যাক্টরি রেকর্ডস্, ৫ম খণ্ড, ১৭৩৯ ; ১৭৫৯ সনে কলকাতার জমিদার বীচার, ফ্রাঙ্কল্যান্ড ও হলওয়েল প্রেসিডেন্ট ও কাউন্সিলের কাছে ১৭৫৯ সালের বেতন হার সুপারিশ করেছিলেন।

১৭৩৭ খ্রীষ্টাব্দ পর্যন্ত বাংলার আর্থিক জীবনের উল্লেখযোগ্য বৈশিষ্ট্যগুলি হল বাজারে জিনিসের দাম কম, বেতন ও মজুরি কম, টাকা দুষ্প্রাপ্র, টাকার ক্রয় ক্ষমতা বেশি। এ ধরণের স্থিতিশীল, গতিহীন অর্থ নীতিতে মানুষ খেতে পায়, তবে আর্থিক অগ্রগতি ঘটে না। এ রকম আর্থিক অবস্থার একটি বড় রকমের অসুবিধা হল অনাবৃষ্টি, অতিবৃষ্টি, বন্যা, ফসলহানি ও দুর্ভিক্ষের সময় সঞ্চয়হীনতার জন্য দলে দলে সাধারণ মানুষ দারিদ্র ও মৃত্যুর সম্মুখীন হয়। এ রকমের আর্থিক অবস্থায় উৎপাদক তার ন্যায্য পারিশ্রমিক পায় না, কৃষক ফসলের দাম পায় না এবং কারিগর তার শ্রমের যথাযথ মূল্য পায় না। ফলে উৎপাদনে উৎসাহের অভাবে অর্থনীতিতে মন্দা আসে। এ যুগে দিল্লীর রাজস্ব পাঠানোর পর অভ্যন্তরীণ বাজারে টাকার অভাবে বাণিজ্যিক লেনদেনের কাজ প্রায় অচল হয়ে যেত। ইউরোপীয় জাহাজ এলে তবে এসব কাজকর্ম পুনরায় শুরু করা সম্ভব হত।

১৭৩৭ থেকে ১৭৫৭ খ্রীষ্টাব্দ পর্যন্ত বাংলার আর্থিক-জীবন অনেক বেশি গতিশীল। মূল্য ও মূল্যস্তর ক্রমবর্ধমান। বেতন ও মজুরি ঊর্ধ্বগতি। অভ্যন্তরীণ বাজারে টাকার যোগান অনেক বেশি। অভ্যন্তরীণ, আন্তঃপ্রাদেশিক ও আন্তর্জাতিক বাণিজ্য অনেক গুণ বেড়েছে। বাঙালীর ক্রয় ক্ষমতা বাড়ার সঙ্গে সঙ্গে অভ্যন্তরীণ বাজারে খাদ্য শস্য ও ভোগ্য পণ্যের চাহিদা বেড়েছে। বাংলার কৃষি ও শিল্পে নতুন করে উৎসাহের সৃষ্টি হয়েছে। এ যুগে বাংলার আর্থিক চিত্রের একটা ভাল দিক হল দেশে বেকার নেই। দেশে প্রচুর কাজ। প্রকৃত অভাব যথেষ্ট শ্রমিক ও কারিগরের। ১৭৫৭ খ্রীষ্টাব্দে কলকাতায় বর্তমান ফোর্ট উইলিয়ম দুর্গ নির্মাণের শুরুতে কোম্পানীর কর্তৃপক্ষের কাছে কাজের লোক যথেষ্ট সংখ্যায় পাওয়া একটা সমস্যা হয়ে দাঁড়িয়েছিল।[১৩] ১৭৫৩ খ্রীষ্টাব্দে কলকাতার কর্তৃপক্ষ ব্রহ্মদেশে ইস্ট ইণ্ডিয়া কোম্পানীর উপনিবেশ নেগ্রাইতে কিছু কুশলী কারিগরের প্রয়োজন হওয়ায় বাংলা থেকে সংগ্রহের চেষ্টা করেছিল। তাদের দরকার ছিল মিস্ত্রি, কর্মকার, ছুতোর, পাথর মিস্ত্রি, ইটমিস্ত্রি, কুলি প্রভৃতি। কর্মকার, ছুতোর, মিস্ত্রি নেগ্রাই যেতে রাজী হল না। ইটমিস্ত্রি, কুলি পাওয়া গেল। তবে তারা মজুরি চাইল দুগুণ এবং তার সঙ্গে দৈনিক চাল, ডাল, ঘি, লবণ ইত্যাদি।[১৪] এ থেকে বোঝা যায় এ যুগে বাংলাদেশে এ শ্রেণীর কর্মীদের কাজের অভাব হত না।

১৩। সি. আর. উইলসন. 'দি বিল্ডিং অব দি প্রেজেন্ট ফোর্ট উইলিয়ম' ক্যালকাটা রিভিয়্যু', সংখ্যা জুলাই, ১৯০৪, পৃঃ ৩৭৬।

১৪। বেঙ্গল পাবলিক কনসালটেশনস্, ৩রা জুলাই, ১৭৫৩। জে. লঙ্, ঐ, পৃঃ ৫৪—৫৫।

সপ্তম অধ্যায়

মুদ্রা, ব্যাঙ্কিং এবং বিনিময়

মুর্শিদকুলী খাঁ যখন বাংলার দেওয়ান হয়ে এলেন তখন এখানে রাজমহল ও ঢাকায় দুটি টাঁকশাল ছিল। ১৭০৮ খ্রীষ্টাব্দের পরে রাজমহলের টাঁকশাল তিনি মুর্শিদাবাদে নিয়ে এলেন। বাংলার টাঁকশালে এ যুগে তিন রকমের মুদ্রা তৈরি হত—সোনা, রূপো ও তামা। সোনার টাকা মোহর নামে পরিচিত। সোনার মোহরের (ওজন ১৯০ . ৭৭৩ গ্রেন) সঙ্গে রূপোর সিক্কা টাকার বিনিময় হার হল এক মোহর সমান চৌদ্দ বা ষোল সিক্কা টাকা। সোনার টাকা বাজারে লেনদেনের জন্য ব্যবহৃত হত না। এগুলি সম্রাটের প্রাপ্য রাজস্ব, উপঢৌকন, উপহার বা সঞ্চয়ের জন্য টঙ্কন করা হত। রূপোর টাকা সিক্কার ওজন ১৭২½ গ্রেন ; এতে ৯৮ থেকে ১০০ ভাগই খাঁটি রূপো থাকত। এ টাকা বাজারে লেনদেনে ব্যবহৃত হত। সিক্কা সরকারের স্বীকৃত বাংলার বাজারে বৈধ টাকা। তামার পয়সা 'দাম' খুচরো ক্রয় বিক্রয়ে লাগত। টাকার সঙ্গে এর বিনিময় হার হল এক টাকা সমান চল্লিশ দাম। শতাব্দীর শুরুতে বাংলাদেশের অভ্যন্তরীণ বাজার থেকে আস্তে আস্তে দাম উঠে যায় এবং এর স্থান গ্রহণ করে কড়ি। মানুচিচ জানিয়েছেন মালদ্বীপ থেকে বাংলায় প্রচুর কড়ি আসত এবং বাজারে খুচরো কেনা বেচায় কড়ি হল বৈধ মুদ্রা। অনেক সময় বড় বড় আর্থিক লেনদেনও কড়ির মাধ্যমে হত। টাকার সঙ্গে কড়ির বিনিময় হার হল এক টাকা সমান বত্রিশ পণ কড়ি (কুড়ি গণ্ডায় এক পণ)। এ যুগে বাংলার টাঁকশালে টঙ্কন করা মুদ্রাগুলি সবই আসল টাকা—প্রতীক মুদ্রা নয়।

এ যুগে সারা ভারতে টাঁকশাল এবং টাকা তৈরির ব্যবস্থা তেমন উন্নত ছিল না।[১] প্রতি বছরে মুদ্রিত টাকার মধ্যে গুণগত ও আকৃতিগত সমতা থাকত না। টাকার ওপর ছাপ মারার পদ্ধতি ও ত্রুটিপূর্ণ ছিল। টাঁকশালে যন্ত্র ব্যবহৃত হত না বলে এ রকম অসুবিধা দেখা দিত। টাকা সুগোল, পরিচ্ছন্ন বা চকচকে হত না। বেশির ভাগ টাকা জাল হত। এ যুগে বাংলার বাণিজ্যিক অবস্থা ভাল। দেশী বিদেশী বণিকরা বাংলার বাজার থেকে প্রচুর জিনিস কেনার ফলে

১। হরিশ চন্দ্র সিংহ, 'বাংলার ব্যাঙ্কিং', পৃঃ ৯-১০।

বাংলার বাজারে সারা ভারতের বহু রকমের টাকা আসত। আরঙ্গজেবের মৃত্যুর পর সারা ভারতে অনেকগুলি স্বাধীন রাজ্য স্থাপিত হয়েছিল। স্বাধীন রাজা বা সুলতানরা সকলেই নিজ নিজ মুদ্রা চালু করেছিলেন। ভারতে স্বাধীনতা ও সার্বভৌমত্বের প্রতীক হল নিজস্ব মুদ্রা ব্যবস্থা। এর ফলে ভারতে এ যুগে কয়েক শ মুদ্রা চালু হয়েছিল। বলা বাহুল্য, এগুলি নানান মাপের, দামের এবং ওজনের। মুঘল সম্রাটদের বিশুদ্ধ, উজ্জ্বল এবং পরিমাপে ঠিক টাকা বাজারে কম হয়ে গেল। মুঘলদের টাকাও ওজন ও আকৃতিতে ছোট হয়ে গেল। এ ছাড়া, বিদেশী ইংরাজ, ফরাসি ও ওলন্দাজরা দক্ষিণ ও পশ্চিম ভারতে নিজেদের টাঁকশালে টাকা তৈরি করত। এ যুগে বাংলার বাজারে আর্কটের 'প্যাগোডা', ইংরাজ, ফরাসি ও ওলন্দাজদের আর্কট, সুরাট ও বোম্বাই এবং কাশী ও অযোধ্যার টাকা চালু ছিল। সব মিলিয়ে বাংলার বাজারে প্রায় বত্রিশ রকমের মুদ্রার পরিচয় পাওয়া যায়। এদের আকৃতি, ওজন বা ধাতুগত মূল্য বিভিন্ন রকমের। অথচ আর্থিক লেনদেনের জন্য এগুলি বাংলায় আসত। সমকালীন ব্যক্তিদের বিবরণী থেকে জানা যায় এ যুগে আন্তঃপ্রাদেশিক ও আন্তর্জাতিক বাণিজ্যের লেনদেনের পর লাভের অঙ্কটা বাংলার পক্ষেই থাকত (favourable balance of trade)। সুতরাং বহু মুদ্রার আবির্ভাব বাংলার বাজারে।[২] বাংলার কেন্দ্রিয় ব্যাঙ্কিং পরিবার জগৎ শেঠরা এদের মধ্যে বিনিময় হার ঠিক করত। শুধু তাই নয়। মুঘলদের বিভিন্ন টাঁকশালে টঙ্কন করা মুদ্রাগুলিও সমান বলে গণ্য হত না। ঢাকা, পাটনা, কটকে মুদ্রিত টাকা মুর্শিদাবাদের টাকার সমান মর্যাদা পেত না। এদের মধ্যেও বিনিময় হার ছিল। সব মিলিয়ে মুদ্রা বিনিময়ের ব্যবসা এ যুগে বেশ লাভজনক হয়ে দাঁড়িয়েছিল। বাংলার অসংখ্য স্রফ ও পোদ্দার মুদ্রা বিনিময় ব্যবসায়ে নিযুক্ত ছিল। জগৎ শেঠ পরিবারের সঙ্গে সম্পর্কিত অনেকে টাকার বিনিময় ব্যবসা করত। এ থেকে লাভও হত ভাল।

এ যুগে বাংলার মুদ্রা ব্যবস্থায় অপর উল্লেখযোগ্য বৈশিষ্ট্য হল চালানি টাকা (current rupee)। কাল্পনিক চালানি টাকা কোনো টাকা নয়; সেজন্য স্থির, অচঞ্চল সমস্ত টাকার বিনিময় হার ঠিক হত এর মাধ্যমে। সমস্ত রকম ব্যবসায়ী কাজ কর্ম ও লেনদেনের হিসাব হত এ টাকাতে—যার ক্ষয় নেই, পরিবর্তন নেই।

২। সপ্তদশ শতাব্দীর প্রারম্ভে হল্যান্ডে এরূপ মুদ্রা সংকট দেখা দিয়েছিল। ১৬০৯ খ্রীষ্টাব্দে ব্যাঙ্ক অব আমস্টারডাম মুদ্রা নিয়ন্ত্রণ করে এবং ক্ষমতা নিজের হাতে নিয়ে এ সমস্যার সমাধান করেছিল।

আরো একটি আর্থিক কারণে এ রকম একটি কাল্পনিক মুদ্রার প্রয়োজন হয়েছিল বাংলার মুদ্রা ব্যবস্থার অন্যতম বৈশিষ্ট্য হল প্রতি তিন বছরে সিক্কা টাকা পুনরায় টঙ্কন করার ব্যবস্থা হত (triennial recoinage)। টাঁকশাল থেকে বেরুনোর পর সিক্কা টাকা একবছর পূর্ণদামে বাজারে চালু থাকত। দ্বিতীয় ও তৃতীয় বছরে এর নাম হত সোনাত।[৩] দামে কমে যেত। সিক্কা এক বছর পর তিন শতাংশ এবং দু বছর পর পাঁচ শতাংশ মূল্য হারাত। একটা উদাহরণ দিয়ে সিক্কা ও সোনাতের পার্থক্য আরো পরিস্কার করে বোঝান যেতে পারে। সিক্কার সঙ্গে চালানি টাকার বিনিময় হার হল ১০০ সিক্কা সমান ১১২½ চালানি টাকা। এটা অবশ্য সরকারি হার। বাজারে বেসরকারি হার হল ১১৮ চালানি টাকা। সিক্কা দ্বিতীয় ও তৃতীয় বছরে সোনাত হল (ক্ষয় হোক বা না হোক) এবং সোনাতের সঙ্গে চালানির বিনিময় হার হল ১০০ সোনাত সমান ১১১ চালানি টাকা। সুপরিকল্পিত ভাবে সিক্কা ও সোনাতের মধ্যে পার্থক্য করা হয়েছিল। এর মুখ্য উদ্দেশ্য হল সিক্কার শ্রেষ্ঠত্ব বজায় রাখা—সিক্কাকে বাজারে একমাত্র বৈধ টাকা হিসাবে চালু রাখা। তিন বছর পর সোনাত সিক্কায় রূপান্তরিত করার ব্যবস্থাও এজন্য। অন্যথায় সোনাত বাজার ছেয়ে ফেলত। এরকম মুদ্রা ব্যবস্থায় টাঁকশালের আয়ও ঠিক থাকে। সোনাত দামে কম বলে ব্যবসায়ীরা এ গুলি পুনরায় টঙ্কনের জন্য টাঁকশালে নিয়ে যেত। বাংলার স্রফ ও পোদ্দাররা তৃতীয় বছরের শেষে সোনাত নিয়ে টাঁকশালে হাজির হত। দু শতাংশ টাঁকশাল কর দিয়ে সোনাত সিক্কাতে রূপান্তরিত করে দু শতাংশ লাভ করত। তিন বছরের পর সোনাত আর বৈধ মুদ্রা হিসাবে স্বীকৃত হত না। তখন এর ধাতু মূল্য এর প্রকৃত মূল্য। চালানির সঙ্গে ইংরাজদের আর্কট টাকার বিনিময় হার হল একশ আর্কট সমান একশ নয় চালানি টাকা। আরঙ্গজেবের মৃত্যুর পর ১৭০৯ খ্রীষ্টাব্দ থেকে ভারতের রাজধানী যখন স্থায়ীভাবে উত্তর ভারতে চলে এল তখন চালানির সঙ্গে আর্কেটের বিনিময় হার আরো দু শতাংশ কমে গেল।[৪] অর্থাৎ ১০০ আর্কট সমান ১০৭ চালানি টাকা।

ইংরাজ, ফরাসি ও ওলন্দাজরা এ যুগে বিভিন্ন সময়ে বাংলাদেশের টাঁকশালে টঙ্কনের অধিকার পাওয়ার জন্য মুঘল সম্রাট এবং বাংলার নবাবদের কাছে আবেদন করেছিল। বাংলার নবাবরা এ আবেদনে সাড়া দেননি। জগৎ শেঠ পরিবার

৩। সোনাত হল আরবি শব্দ অর্থ বছর, সিক্কা মানে মুদ্রা তৈরীর ছাঁচ।

৪। ভারতের রাজধানী যতদিন দক্ষিণ ভারতে ছিল আর্কট টাকা বাংলার রাজস্ব পাঠানোর জন্য গ্রহণ করা হত। ১৭০৯ সনের পর রাজধানী দিল্লীতে চলে আসায় আর্কট টাকায় রাজস্ব পাঠানো বন্ধ হল।

বাংলার টাঁকশাল পরিচালনা করত। বাংলাদেশে বিদেশ থেকে যে সোনা রূপো আসত এরা ছিল তার একচেটিয়া ক্রেতা। এ ব্যবসায়ে তাদের লাভ হত প্রচুর। সেজন্য বিদেশীদের বাংলার টাঁকশাল ব্যবহারের অধিকার তারা দিতে চাইত না। ১৭১৭ খ্রীষ্টাব্দে ইংরাজরা মুঘল সম্রাট ফারুখসিয়ারের কাছ থেকে বাংলার টাঁকশাল সপ্তাহে তিনদিন বিনা খরচে ব্যবহার করার অনুমতি পেয়েছিল। মাদ্রাজ টাকার ওপর বাট্টা ধার্য্য না করার আদেশ ছিল। মুর্শিদকুলী ও জগৎ শেঠ ফতেচাঁদের বিরোধিতায় এ সুবিধা ও অধিকার কার্য্যকরী করা সম্ভব হয়নি। চালানি টাকা ও মাদ্রাজ টাকার মধ্যে বিনিময় হার বেড়ে যাওয়ায় ইংরাজ ইস্ট ইণ্ডিয়া কোম্পানীর আর্থিক ক্ষতি হচ্ছিল। এরা বাংলাদেশে রূপো এনে জগৎশেঠদের কাছে বিক্রি করত। তাতে ডলার (৮৯½ আউন্স) রূপোর ২৪০ সিক্কা ওজনের জন্য তারা পেত ২০১ থেকে ২০৬⅛ চালানি টাকা। অথচ মাদ্রাজে ঐ পরিমাণ রূপোর বিনিময়ে ২১৮ মাদ্রাজ টাকা এবং বাংলার টাঁকশালে টঙ্কন করলে টাঁকশাল কর ও বাট্টা দিয়ে ২৩৩ চালানি টাকা পেতে পারত। সেটা সম্ভব হল না জগৎশেঠদের বাধাদানের ফলে। ইংরাজরা রূপো আনা অনেক কমিয়ে দিয়ে বেশি করে মাদ্রাজ টাকা বাংলার বাজারে আনতে শুরু করল। এতে নবাব সুজাউদ্দিনের সময় মুদ্রা ব্যবস্থায় দু রকমের অসুবিধা দেখা দিল। টাঁক-শালের রাজস্ব কমে গেল এবং রূপোর অভাবে সিক্কা টাকা তৈরি করায় অসুবিধা হল। ১৭৩১ খ্রীষ্টাব্দে নবাব সুজাউদ্দিন এ সমস্যা সমাধান করার জন্য দুটি ব্যবস্থা নিয়েছিলেন। বাংলার বাইরের সমস্ত বিদেশী টাকা তিনি অবৈধ বলে ঘোষণা করলেন ; শুধু তাদের ধাতুগত মূল্য স্বীকার করা হল। আর চালানি টাকা ও মাদ্রাজ ও আর্কট টাকার মধ্যে বিনিময় বাট্টা বাড়িয়ে দিলেন। আগে এ বাট্টার হার ছিল ৩½ থেকে ৪½ শতাংশ যদিও তাদের মধ্যে ধাতুগত মূল্যে পার্থক্য মাত্র ০·৫৬ শতাংশ। সুজাউদ্দিন এ হার বাড়িয়ে করলেন ৭⅞ শতাংশ। ১৭৩৭ খ্রীষ্টাব্দে বাংলার ডেপুটি দেওয়ান আলমচাঁদ ইংরাজদের গত পাঁচ বছরে বাংলায় সোনা রূপো আনার হিসাব দাখিল করতে বললেন। ইংরাজরা এ হিসাব দাখিল করতে বাধ্য হয়েছিল। ইংরাজ, ফরাসি ও ওলন্দাজরা নতুন বিনিময় হারে আর্থিক অসুবিধায় পড়ল। বাংলার ব্যবসায়ী ও মহাজনরা মাদ্রাজ টাকা নিতে অস্বীকার করায় এর দাম আরো কমে গেল। এর ফলে ইংরাজরা আবার বেশি পরিমাণে বাংলায় সোনা রূপো আনতে বাধ্য হল। নতুন বিনিময় হারে মাদ্রাজ টাকা এনে লাভ নেই।

ইংরাজ ইস্ট ইণ্ডিয়া কোম্পানী বাংলাদেশে ব্যবসায়ের জন্য মূলধন হিসাবে যে সোনা ও রূপো নিয়ে আসত তা এদেশীয় টাকায় রূপান্তরিত করার তিনটি পথ তাদের সামনে খোলা ছিল।[৫] প্রথমত, সোনা ও রূপো এদেশীয় টাঁকশালে দিয়ে টাকায় রূপান্তরিত করা। এ পথে একটি প্রধান অন্তরায় হল বাংলার নবাবদের সঙ্গে সম্পর্ক তিক্ত হলে বা কোনো কারণে সংঘর্ষ বাধলে তাদের মূলধন নবাবদের হাতে আটক হবার সম্ভাবনা থেকে যায়। তাছাড়া টাকা মুদ্রণের জন্য অনেক সময় লাগে। প্রয়োজনমত টাকার যোগান পাওয়ার ব্যাপারে কিছুটা অনিশ্চয়তা থেকে যায়। এ যুগে বাংলার নবাবরা এবং টাঁকশাল ও মুদ্রা ব্যবস্থার নিয়ন্ত্রক জগৎ শেঠ পরিবার টাঁকশাল ও মুদ্রা ব্যবস্থায় বিদেশী অনুপ্রবেশ পছন্দ করত না। এদেশী বণিকরা টাঁকশাল কর দিয়ে এ অধিকার ভোগ করত। বিদেশীদের এ অধিকার দেওয়া হয়নি। দ্বিতীয় পদ্ধতি হল সোনা ও রূপো বাংলায় এনে জগৎ শেঠ পরিবারের কাছে তাদের নির্ধারিত দামে বিক্রী করে মূলধন সংগ্রহ করা। এটা অনেক সহজ পথ। তবে বিনিময় হার নির্ধারণ এদেশী ব্যাঙ্কারদের হাতে থাকায় ইংরাজ ও অন্যান্য বিদেশীরা ক্ষতিগ্রস্থ হত। এ ক্ষতির হাত থেকে বাঁচার জন্য তাদের তৃতীয় পথ হল দক্ষিণ ও পশ্চিম ভারতের টাঁকশালে মুদ্রিত টাকা মূলধন হিসাবে বাংলাদেশে আনা। কিন্তু এক্ষেত্রেও অসুবিধা হল মাদ্রাজ ও এদেশের চালানি টাকার বিনিময় হার এদেশী ব্যাঙ্কাররা নিয়ন্ত্রণ করত। ১৭০১ খ্রীষ্টাব্দ থেকে দ্বিতীয় দশকের শেষ পর্যন্ত ইংরাজরা দ্বৈত পদ্ধতি অনুসরণ করেছিল। অর্থাৎ সোনা, রূপো ও মাদ্রাজ টাকা বাংলাদেশে মূলধন হিসাবে আনত। ১৭৩০ খ্রীষ্টাব্দ থেকে তারা কিছুকাল সোনা রূপো আনা কমিয়ে মাদ্রাজ টাকার পরিমাণ বাড়িয়েছিল। তাতে সুজাউদ্দিনের সরকারের সঙ্গে বিরোধ। ১৭৩৭ থেকে ১৭৫৭ খ্রীষ্টাব্দ পর্যন্ত আবার দ্বৈত পদ্ধতি অনুসৃত হয়।

এ যুগে বাংলার মুদ্রা ব্যবস্থার আরো দুটি উল্লেখযোগ্য বৈশিষ্ট্য দেখা যায়। বাংলার নবাবরা, টাঁকশালে যে টাকা তৈরি হত তার গুণগত মান, আকৃতি, ওজন ইত্যাদি বজায় রাখতে চেষ্টা করতেন। এ যুগে ভারতের অন্যান্য অঞ্চলে তৈরি টাকার গুণগতমান, আকৃতি, ওজন অপেক্ষাকৃত নীচুমানের। অপর বৈশিষ্ট্যটি

৫। কে, এন, চৌধুরী, 'দি ট্রেডিং ওর্য়াল্ড অব এশিয়া এন্ড দি ইংলিশ ঈস্ট ইণ্ডিয়া কোম্পানী,' পৃঃ ১৮২-১৮৯।

হল বিভিন্ন টাকার মধ্যে বাট্টার ব্যবস্থা। এ ব্যবসায়ে স্রফ ও পোদ্দাররা বেশ লাভবান হত। ক্ষতিগ্রস্থ হত বাংলার কৃষক, মজুর ও কারিগর। স্রফ ও পোদ্দাররা বাংলার নিরক্ষর মানুষদের নানাভাবে ঠকাত। টাকার ওপর কোন্ বছরের ছাপ আছে এদের অধিকাংশই তা পড়তে পারত না। অথচ মুদ্রা বিনিময় ব্যবস্থায় মুদ্রার ওপর মুদ্রিত বছরের ছাপটিই আসল। এটাকে ধরে বিনিময় হত। বাংলার মহাজন, ব্যবসায়ী, ব্যাঙ্কার, স্রফ ও পোদ্দাররা এ সুযোগের পূর্ণ সদ্ব্যবহার করত।

১৭৫৩ খ্রীষ্টাব্দে ইংরাজরা আবার বাদশাহী ফারমান যোগাড় করে বাংলায় টাঁকশাল স্থাপনের চেষ্টা করেছিল। এবার জগৎ শেঠদের ভয়ে অত্যন্ত গোপনে অগ্রসর হয়েছিল। কিন্তু শেষ পর্যন্ত তাদের প্রচেষ্টা সফল হয়নি। ১৭৫৭ খ্রীষ্টাব্দের ৯ই ফেব্রুয়ারী আলিনগরের সন্ধিতে নবাব সিরাজুদ্দৌলা ইংরাজদের কলকাতায় টাঁকশাল স্থাপনের অধিকার দিয়েছিলেন। ঐ সময় তিনি চন্দন-নগরে ফরাসিদের নবাবের নামে টঙ্কনের অধিকার দিয়েছিলেন। ঐ বছর ১৯শে আগস্ট কলকাতার টাঁকশাল থেকে প্রথম টাকা মুদ্রিত হয়েছিল।

বাংলার রথস্‌চাইল্ড জগৎ শেঠ পরিবার এ যুগে বাংলাদেশে ব্যাঙ্কিং ব্যবস্থার মধ্যমণি। এ সময় ব্যবসা ও ব্যাঙ্কিং অচ্ছেদ্যভাবে জড়িত। ব্যবসাদার ও মহাজনরা ব্যাঙ্কিং এর সমস্ত রকম কাজকর্ম করত। এরা লোকের আমানত গ্রহণ করত, সুদে টাকা ধার দিত, বিভিন্ন টাকার বিনিময় করত (exchange), হুণ্ডি কাটত (bill of exchange) এবং নিজেরা নানা ব্যবসায়ে লিপ্ত থাকত। এ যুগে জগৎ শেঠরা ছাড়া, হুজুরিমল, জনার্দ্দন শেঠ, বানারসী শেঠ, রামকিষেণ শেঠ, আনন্দিরাম ও শ্রীকৃষ্ণ প্রভৃতি বণিকরা বাংলায় ব্যাঙ্কিং এর কাজ করত। অবশ্য ব্যাঙ্কিং-এর কাজকর্মে সবাইকে ছাড়িয়ে উঠেছিল জগৎ শেঠ পরিবার। এদের কতকগুলি সুবিধা ছিল যা অন্যদের ছিল না। রাজনৈতিক যোগাযোগ, বিশাল পুঁজির যোগান এবং বিস্তৃত ব্যবসায়ী সংগঠন এদের ব্যাঙ্কিং কাজকর্মকে স্বাতন্ত্র্য এনে দিয়েছিল। এডমাণ্ড বার্ক এদের কাজকর্মকে ব্যাঙ্ক অব ইংল্যাণ্ডের সঙ্গে তুলনা করেছিলেন।

এ সময়ে বাংলাদেশে সুদের হার কত এক কথায় বলা যাবে না। জগৎ শেঠরা সাধারণত ইউরোপীয় কোম্পানীগুলিকে বার্ষিক শতকরা নয় টাকা হারে ধার দিত। প্রাচ্য দেশের ঐতিহ্য অনুযায়ী বেশি সুদ নেবার ঝোঁক এদের

ছিল না। এ সময় ব্যাঙ্ক অব ইংল্যাণ্ডের সুদের হার পাঁচ থেকে ছয় শতাংশ।[৫ক] তবে অন্যান্য বাণিজ্য ঋণের ক্ষেত্রে তারা বেশি সুদ নিত। কোনো ব্যক্তিকে টাকা ধার দিলে সুদের হার নিশ্চয়ই বেশি ধার্য্য করা হত কারণ এ ক্ষেত্রে অনাদায়ের বা ক্ষতির সম্ভাবনাও বেশি। সাধারণভাবে এ যুগে বাংলার বণিক ও মহাজনদের কাছ থেকে বাণিজ্যিক পুঁজির জন্য ঋণ নিলে বার্ষিক ১০ থেকে ১২ শতাংশ হারে সুদ দিতে হত।[৬] বাণিজ্যিক পুঁজির সরবরাহের কোনো রকম অসুবিধা দেখা যায় না। এ যুগে গ্রামের মানুষের ঋণ গ্রস্থতা অসাধারণ। গ্রামে পুঁজির যোগানও অনেক কম। সেজন্য তাদের ক্ষেত্রে সুদের হারও অনেক বেশি। অনেক ক্ষেত্রে দেখা গেছে কৃষক মহাজনের কাছ থেকে ১৫০ শতাংশ হারে টাকা ধার নিয়েছে। জগৎ শেঠরা বাংলার জমিদারদের মাসিক ২ থেকে ৩½ শতাংশ হারে টাকা ধার দিত।

রাজস্থানে মাড়োয়ার রাজ্যের রাজধানী যোধপুরের কাছে নাগর জগৎ শেঠ পরিবারের আদি বাসস্থান। এরা অসওয়াল সম্প্রদায়ের লোক, ধর্মে জৈন। সপ্তদশ শতাব্দীর শেষে হীরানন্দ সাহুর পুত্র মানিক চাঁদ তৎকালীন বাংলার রাজধানী ও বাণিজ্য কেন্দ্র ঢাকাতে এসে 'কোঠী' স্থাপন করেছিলেন। বন্ধু মুর্শিদকুলী খাঁ মুর্শিদাবাদে চলে এলে ইনিও চলে আসেন এবং এখানে কোঠী স্থাপন করলেন। আস্তে আস্তে বাংলাদেশের সর্বত্র এবং বাংলার বাইরে বিভিন্ন শহরে এদের ব্যবসা কোঠী গড়ে উঠল। বাংলাদেশে মুর্শিদাবাদ, কলকাতা, ঢাকা ও হুগলীতে এদের কোঠী ছিল। বাংলার বাইরে পাটনা, কাশী ও দিল্লীতে এদের শাখা প্রতিষ্ঠিত হয়েছিল। সম্রাট ফারুখসিয়ার মাণিক চাঁদকে শেঠ উপাধি দিয়েছিলেন। ১৭২২ খ্রীষ্টাব্দে মুঘল সম্রাট মুহম্মদ শাহ এদের ব্যাঙ্কিং কাজ-কর্মের স্বীকৃতি স্বরূপ মাণিকচাঁদের দত্তকপুত্র ও উত্তরাধিকারী ফতেচাঁদকে 'জগৎ শেঠ' উপাধি দিলেন। ১৭১৭ খ্রীষ্টাব্দে মুর্শিদকুলীর টাঁকশাল কর্মচারী রঘুনন্দন মারা গেলে জগৎ শেঠ পরিবার বাংলার টাঁকশাল ও মুদ্রা ব্যবস্থা পরিচালনার দায়িত্ব পেয়েছিল। মুদ্রা ব্যবস্থার সঙ্গে যুক্ত মুদ্রা বিনিময় ব্যবস্থা।

৫ক। এন. কে. সিংহ জে. এইচ. লিটলের 'হাউস অব জগৎ শেঠে'র ভূমিকায় লিখেছেন ব্যাঙ্ক অব ইংল্যান্ডের সুদের হার আট শতাংশ। টি. এস. এ্যাসটনের 'ইণ্ডাস্ট্রিয়াল রেভলিউশানের' প্রথম অধ্যায়ে সুদের হার পাঁচ থেকে ছয় শতাংশ বলে উল্লেখ করা হয়েছে।

৬। পি. জে. মার্শাল, 'ইস্ট ইণ্ডিয়ান ফরচুনস', পৃঃ ৪২।

এ পরিবার বাংলাদেশে কেন্দ্রীয় বিনিময় ব্যাঙ্ক হিসাবে কাজ করত। বত্রিশ রকম বিদেশী মুদ্রার মধ্যে বিনিময় হার এরাই ঠিক করে দিত। বিনিময় ব্যবসা থেকে তারাও যথেষ্ট রোজগার করত। ল্যুক স্ক্র্যাফ্‌টনের হিসাব মত এর পরিমাণ হল বছরে সাত থেকে আট লক্ষ টাকা। এ যুগে বাংলাদেশে এত বিভিন্ন রকমের মুদ্রা চালু থাকা সত্ত্বেও বাজারে লেনদেনের ক্ষেত্রে কোনো অরাজকতা দেখা দেয় নি। এজন্য কেন্দ্রীয় ব্যাঙ্কিং পরিবার জগৎ শেঠদের প্রশংসা অবশ্যই প্রাপ্য। এ ছাড়া, ইউরোপীয়রা বাংলাদেশে যে সোনা ও রূপো নিয়ে আসত জগৎ শেঠ পরিবার ছিল তার একচেটিয়া ক্রেতা। অন্য কোনো ব্যবসাদার বা মহাজন এক টাকারও সোনা রূপো কিনতে পারত না। টাঁকশাল, টাকা, ও সোনা রূপোর বাজারের ওপর এ পরিবারের একাধিপত্য প্রতিষ্ঠিত হয়েছিল। এ আধিপত্য রক্ষায় বাংলার নবাবরা তাদের সাহায্য করতেন।

আজকের দিনে স্টেট ব্যাঙ্ক যে কাজগুলি করে সে যুগে জগৎশেঠ পরিবার বাংলা সরকারের জন্য সে কাজগুলি করত। আমিল ও জমিদাররা জগৎশেঠের গদিতে সরকারের প্রাপ্য রাজস্ব জমা দিত। তেমনি নবাবদের টাকার প্রয়োজন হলে তারা সরবরাহ করত। মারাঠা আক্রমণ ও আফগান বিদ্রোহকালে আলিবর্দী জগৎশেঠদের কাছ থেকে বিপুল পরিমাণ টাকা নিয়েছিলেন। জগৎ শেঠদের বিভিন্ন কোঠীতে সরকারের বিভিন্ন খাতে সংগৃহীত রাজস্ব গ্রহণ করা হত। বাংলার নবাবরা জগৎ শেঠদের সম্পদকে নিজেদের বলে মনে করতেন।[৭]

১৭০৬ খ্রীষ্টাব্দ থেকে জগৎ শেঠদের সঙ্গে ইংরাজদের ব্যবসায়িক সম্পর্ক ছিল। এরা গড়ে বার্ষিক চার লক্ষ টাকা ইংরাজদের ৯ শতাংশ হারে ধার দিত। ফরাসি ও ওলন্দাজদেরও এরা ব্যবসায়ের জন্য টাকা ধার দিত। অন্যান্য ব্যবসায়ী ও মহাজনদের সুদের হার বেশি। সেজন্য ছোটখাট, দেশী বিদেশী বণিক ও মহাজনরা এদের কোঠী থেকে টাকা ধার নিত। কলকাতা, ঢাকা ও পাটনা কোঠী থেকে এরা প্রতি বছর বহু টাকা দেশী ও বিদেশী ব্যবসাদারদের ধার দিত। বিদেশী কোম্পানীগুলির কর্মচারীদের ব্যক্তিগত ব্যবসায় এরা টাকা ধার দিত। এ যুগে

৭। কান্তু ঘটনা (১৭৩০) ও ফ্রান্সিস রাসেল ঘটনা (১৭৪৩) থেকে এটা পরিষ্কার হয়। জগৎ শেঠেরা কান্তু ও রাসেলের কাছে টাকা পেতেন। কোম্পানীর এজেণ্ট হিসাবে কান্তু এবং ব্যক্তিগত ব্যবসার জন্য রাসেল টাকা ধার করেছিলেন। ইংরাজরা এ টাকা শোধ দেওয়া নিয়ে টালবাহানা করেছিল। বাংলার নবাবরা জগৎ শেঠকে সমর্থন করেছিলেন। ইংরাজরা টাকা শোধ করতে বাধ্য হয়েছিল।

পূর্ব ভারতে এ পরিবার কৃষি, শিল্প ও বাণিজ্য ঋণের সবচেয়ে বড় প্রতিষ্ঠান। উত্তর ও পশ্চিম ভারতের ব্যবসায়ীরা পর্যন্ত এদের কাছ থেকে টাকা ধার করত। মধ্য এশিয়ার কয়েকজন ব্যবসায়ীর নাম পাওয়া গেছে যারা এদের কাছ থেকে মূলধন ধার করেছিল। সমসাময়িক ব্যক্তিদের বিবরণী থেকে এ ব্যাঙ্কিং পরিবারের উদার দৃষ্টিভঙ্গির কথা জানা যায়। এরা ক্ষুদ্র স্বার্থ দ্বারা পরিচালিত হত না। কখনো ঘুষ ও উৎকোচ গ্রহণ বা অবৈধ টাকা রোজগারের চেষ্টা করেনি।[৮] তৎকালীন বাংলার নৈতিক মানদণ্ডে এটা খুবই কৃতিত্বপূর্ণ সন্দেহ নেই। এদের মোট মূলধনের পরিমাণ কত সঠিক বলা যায় না। মারাঠারা এদের দুকোটি টাকা লুঠ করেছিল। তবুও পঞ্চাশের দশকের শেষে এদের মোট মূলধনের পরিমাণ সাত কোটি টাকার কম নয়।[৯] এ সময়ে এরা এক কোটি টাকার 'দর্শনী হুণ্ডি' কাটত।[১০] ব্যাঙ্কিং এর কাজ ছাড়াও জগৎ শেঠ পরিবার নানারকম ব্যবসা করত। শস্যের ব্যবসা তাদের বাধ্য হয়ে করতে হত। জমিদারদের বাকী খাজনার তারা জামিনদার হত।[১১] অনেক সময় জমিদাররা শস্য দিয়ে দেনা শোধ করত। বাংলার কৃষি ও শিল্পের উন্নতিতে এরা পুঁজির যোগান দিত। জমিদাররা জমিদারির উন্নতিতে—বাঁধ দেওয়া, জঙ্গল কাটা ও চাষ বাড়ানোর জন্য—এদের কাছ থেকে টাকা ধার নিত। তেমনি সূতীবস্ত্রের ব্যাবসায়ী, রেশম শিল্পের মহাজন এদের কাছ থেকে টাকা ধার নিয়ে ব্যবসা শুরু করত। জগৎ শেঠ পরিবার দেশী বিদেশী বণিকদের এজেণ্ট হিসাবে কাজ করত। বণিকদের পক্ষে নানা রকম বাণিজ্য পণ্য কেনা বেচা করে এরা কমিশন পেত।

জগৎ শেঠ ফতেচাঁদ ১৭৪৪ খ্রীষ্টাব্দে মারা যাবার পর তাঁর দুই পৌত্র জগৎ শেঠ মহাতাব রায় এবং মহারাজ স্বরূপ চাঁদ এ পরিবারের প্রধান হন। এদের সময় (১৭৪৪—১৭৬৩) এ পরিবারের আরো শ্রীবৃদ্ধি ঘটে। মঁশিয়ে ল লিখেছেন আলিবর্দ্দী জগৎ শেঠ ভ্রাতৃদ্বয়কে শ্রদ্ধা করতেন।[১২] জগৎ শেঠ পরিবারের কাজকর্মকে মোট চারভাগে ভাগ করা যায়। (১) এদের আয়ের প্রধান উৎস হল সরকারের পক্ষে সমস্ত রাজস্ব গ্রহণ করা এবং এর হিসাব রাখা। সংগৃহীত রাজস্বের

৮। জে. এইচ. লিটল, 'দি হাউস অব জগৎ শেঠ,' পৃঃ ৫৯।
৯। গোলাম হোসেন, 'সিয়ার', দ্বিতীয় খণ্ড, পৃঃ ৪৫৭-৪৫৮।
১০। হুণ্ডির মালিককে দেখা মাত্র হুণ্ডিতে উল্লিখিত টাকা শোধ করা।
১১। ইউসুফ আলি, ঐ, পৃঃ ৪৯-৫০।
১২। লিটল, ঐ. পৃঃ ১৫২।

শতকরা দশ ভাগ তারা কমিশন পেতেন বলে মনে করার কারণ আছে।[১৩] স্ক্র্যাফ্‌টনের মতে এ থেকে বছরে এ পরিবার প্রায় চল্লিশ লাখ টাকা আয় করত। (২) সরকারি রাজস্ব শুধু সিক্কাতে নেওয়া হত। তাই সোনাত ও অন্যান্য টাকা যা বংলাদেশে চালু ছিল তাদের বিনিময় চলত সব সময়। তাছাড়া টাঁকশালের আয়ও তাদের গদিতে জমা হত। বিনিময় ও টাঁকশালের আয় থেকে জগৎ শেঠ পরিবারের বার্ষিক আয় হত সাত থেকে আট লাখ টাকা। এ লাভজনক ব্যবসা বন্ধ হবে জেনেই তারা ইংরাজদের টাঁকশাল স্থাপনের প্রস্তাব বা মুর্শিদাবাদের টাঁকশাল ব্যবহার করার ব্যাপারে বারবার বাধা দিয়েছিল।[১৪] (৩) ইংরাজ, ফরাসি ও ওলন্দাজদের তারা মোটা টাকা সুদে ধার দিত। এত টাকা ধার দেবার ক্ষমতা এ যুগে বাংলাদেশে আর কোন মহাজনের ছিল না। আমরা দেখি ওলন্দাজরা মাসিক ৢ শতাংশ হারে চার লাখ টাকা ধার নিচ্ছেন। ১৭৫৭ খ্রীষ্টাব্দের মার্চ মাসে ফরাসিদের কাছে এদের পাওনা মোট পনেরো লাখ টাকা। সব সময় বিপুল অর্থের যোগান থাকাতে এদের মধ্যে এক চৌটিয়া ব্যাঙ্কিং এর ঝোঁক দেখা গিয়েছিল। (৪) জগৎ শেঠ পরিবার নিয়মিত ব্যবসা বাণিজ্য করত। নানা রকম পণ্যে টাকা বিনিয়োগ করত। কখনো কখনো সরকার এদের কাছ থেকে টাকা ধার নিয়ে কয়েকটি জেলার রাজস্ব এদের জন্য নির্দ্দিষ্ট করে দিত (assignments on the revenues of particular districts)। এ জেলাগুলির জমিদাররা সরাসরি এদের কোঠীতে রাজস্ব জমা দিত। এ টাকা তাদের পারিবারিক আয়ের হিসাবে জমা হত।

জগৎ শেঠ ও বাংলার অন্যান্য ব্যাঙ্কিং পরিবারগুলি হুণ্ডির কাজ করত। এই হুণ্ডি আধুনিক 'বিল অব এক্সচেঞ্জ'। বাংলার জমিদাররা হুণ্ডির মাধ্যমে রাজধানীতে টাকা পাঠাত। পথে চোর ডাকাতের ভয়। হুণ্ডিতে টাকা পাঠানো অনেক সহজ ও নিরাপদ। ইংরাজ, ফরাসী ও ওলন্দাজরা জেলায় জেলায় তাদের বাণিজ্য কুঠীগুলিতে আগাম দাদন ও সরাসরি মাল কেনার জন্য হুণ্ডির মাধ্যমে টাকা পাঠাত। বাংলার বাইরে কোথাও টাকা পাঠানোর দরকার হলে হুণ্ডির মাধ্যমে পাঠানো যেত। হুণ্ডির জন্য জগৎ শেঠ পরিবার ও অন্যান্য ব্যাঙ্কাররা ডিস্‌কাউণ্ট নিত। এই ডিস্‌কাউণ্টকে ওরা বলত বাট্টা। এযুগে

১৩। এস. সি. হিল, ঐ, দ্বিতীয় খণ্ড, পৃঃ ২৭৮।
১৪। উইলিয়ম ওয়াটস্‌, 'লেটার টু প্রেসিডেন্ট রজার ড্রেক', ৮ই ফেব্রুয়ারী, ১৭৫৩। লঙ্‌, ঐ, পৃঃ ৪৭।

হুণ্ডির বাট্টার হার শতকরা দুভাগ থেকে শতকরা আট ভাগ পর্যন্ত উঠে যেত। হুণ্ডি বাট্টার হার হুণ্ডির চাহিদা ও যোগানের ওপর নির্ভর করত। বছরের কোনো কোনো সময় হুণ্ডির চাহিদা বেশি থাকত। তখন হুণ্ডি বাট্টার হারও বেশি। আবার ইউরোপের জাহাজগুলি বাংলা ছেড়ে গেলে হুণ্ডি বাট্টার হারও নেমে যেত।

বাংলার নবাবদের সঙ্গে জগৎ শেঠ পরিবারের সম্পর্ক ছিল খুবই নিকট। মুর্শিদকুলী, সুজাউদ্দিন ও আলিবর্দী রাষ্ট্রপরিচালনায় অনেক সময় এদের পরামর্শ নিতেন। টাঁকশাল, মুদ্রা ও ব্যাঙ্কিং সম্পর্কিত সমস্ত ব্যাপারে জগৎ শেঠরা ছিল সর্বেসর্বা। এসমস্ত ব্যাপারে এরা যেসকল সিদ্ধান্ত নিত সাধারণত নবাবরা তা অনুমোদন করতেন। বিদেশীরা, বিশেষ করে ইংরাজরা, অনেক চেষ্টা করেও বাংলার নবাব ও জগৎ শেঠদের মধ্যে সম্পর্কে ফাটল ধরাতে পারেনি। তাদের স্বার্থবিরোধী কোনো কাজ নবাবদের দিয়ে করানো সম্ভব হয়নি।[১৫] 'সম্রাট পঞ্চম চার্লসের কাছে অগসবার্গের ফুগার পরিবার এবং মধ্যযুগে রোমের পোপদের কাছে ফ্লোরেন্সের মেদিচি পরিবার যা বাংলার নবাবদের কাছে জগৎ শেঠ পরিবার তাই ছিল'।[১৬] তুলনামূলকভাবে ফুগার বা মেদিচি পরিবারের চেয়ে বাংলার নবাবদের কাছে জগৎ শেঠ পরিবারের ভূমিকা অনেক বেশি গুরুত্বপূর্ণ ছিল বলে মনে হয়। সম্ভবত বাংলার নবাবরা জগৎ শেঠদের গদিতে টাকা লগ্নী করতেন। জগৎ শেঠদের আশ্চর্যজনক দ্রুত উন্নতি এজন্য সম্ভব হয়েছিল বলে মনে হয়। আবার এ সম্পর্ক ছিন্ন হবার ফলে অতিদ্রুত এই ব্যাঙ্কিং পরিবারের অবনতি ও পতন ঘটে।[১৭] শুধু নবাবরা নন এযুগে বাংলার শাসকশ্রেণী বড় বড় ব্যবসায়ী ও ব্যাঙ্কারদের গদিতে বার্ষিক সুদে টাকা বিনিয়োগ করত। বৃহৎ ব্যবসায়ীদের মূলধনের একটা বড় অংশ এ সূত্র থেকে সংগৃহীত হত। রাজনৈতিক যোগাযোগ ও শাসকশ্রেণীর পুঁজি এযুগে বাংলার ব্যাঙ্কিং পরিবারগুলির প্রতিষ্ঠা এবং উন্নতির অন্যতম কারণ বলে ধরে নেওয়া অসঙ্গত নয়।

১৫। লিটন, ঐ, পৃঃ ৪৩। ১৭১৭, ১৭২১ ও ১৭৫৩ খ্রীষ্টাব্দে ইংরেজরা মুর্শিদাবাদের টাঁকশাল ব্যবহারের চেষ্টা করেছিল। প্রতিবারই তাদের চেষ্টা বার্থ হয়।

১৬। এন. কে. সিংহ, ভূমিকা, লিটল, ঐ।

১৭। কে. এন. চৌধুরী, ঐ, পৃঃ ১৪৭।

অষ্টম অধ্যায়

শিক্ষা ও শিক্ষা প্রতিষ্ঠান

১৮৩৫ খ্রীষ্টাব্দের এ্যাডাম রিপোর্টে বাংলা ও বিহারে এক লক্ষেরও বেশি স্কুলের উল্লেখ আছে। ১৮০২ সনে বর্ধমানের ম্যাজিস্ট্রেট এক প্রতিবেদনে ঐ জেলার গ্রামগুলিতে স্কুল আছে বলে জানিয়েছিলেন। তার মতে ঐ সময়ে বর্ধমানে এমন কোনো উল্লেখযোগ্য গ্রাম নেই যেখানে স্কুল নেই।[১] পলাশী যুদ্ধের পয়তাল্লিশ বছরের মধ্যে এমন অবস্থা সৃষ্টি হওয়া সম্ভব নয়। ১৮১৩ খ্রীষ্টাব্দের চার্টার এ্যাক্টের আগে ইস্ট ইণ্ডিয়া কোম্পানীর শিক্ষাখাতে কোনো ব্যয় বরাদ্দ ছিল না। তার আগে কলকাতা ও কলকাতার আশেপাশে বেসরকারী উদ্যোগে যেসমস্ত প্রতিষ্ঠান গড়ে উঠেছিল তার সবই ইংরাজী শেখানোর স্কুল। বাংলাদেশে গ্রামীন পাঠশালা ব্যবস্থা নবাবী আমলে গড়ে উঠেছিল। প্রাক্-পলাশী যুগে বাংলার গ্রামগুলিতে স্কুল ছিল। গোলামহোসেন সলিম ও সৈয়দ গোলাম হোসেন উভয়েই মুর্শিদকুলী, সুজাউদ্দিন ও আলিবর্দীকে বিদ্যানু-রাগী এবং বিদ্বান, ধর্মজ্ঞ, চিকিৎসক ও পণ্ডিতব্যক্তিদের পৃষ্ঠপোষক বলে উল্লেখ করেছেন।[২] মুর্শিদকুলী খাঁ পয়গম্বর হজরত মোহাম্মদের পবিত্র জন্ম ও মৃত্যু-দিনে ভোজসভার আয়োজন করে পণ্ডিত ও বিদ্বান ব্যক্তিদের আমন্ত্রণ করে আপ্যায়িত করতেন। সুজাউদ্দিন তাঁর বার্ষিক ভোজসভায় রাষ্ট্রের বিদ্বান ব্যক্তিদের আমন্ত্রণ করে উৎসাহিত করতেন। ১৭৪৮ খ্রীষ্টাব্দে বিহারে আফগান বিদ্রোহ দমন করার পর আলিবর্দী পাটনাতে সমবেত পারস্যাগত সমুদয় বিদ্বান ব্যক্তিকে মুর্শিদাবাদে এসে বাস করার জন্য আমন্ত্রণ জানিয়েছিলেন। রাষ্ট্র থেকে এদের পেন্‌সন দেওয়ার ব্যবস্থা হয়েছিল। মুর্শিদাবাদ রাজধানী হিসাবে পুরোপুরি প্রতিষ্ঠিত হওয়ার আগে হুগলী একটি প্রধান শিয়া উপনিবেশ হিসাবে গড়ে উঠেছিল। এখানে শিয়া ধর্মশাস্ত্র, মুসলিম চিকিৎসাবিদ্যা ও পারসী সংস্কৃতির চর্চা হত। এখানে অনেক পারস্যবাসী অধ্যাপক, চিকিৎসক ও পণ্ডিত ব্যক্তির সমাবেশ হয়েছিল। শুধু হুগলীই সমৃদ্ধ বন্দর নয়, আশপাশের অঞ্চলও তখন বেশ

১। জে. সি. কে পিটারসন, 'বর্ধমান ডিস্ট্রিক গেজেটিয়ার (১৯১০)' পৃঃ ১৭২-১৭৪।
২। গোলাম হোসেন, 'রিয়াজ', পৃঃ ২৮১-২৯৯ ; সৈয়দ গোলাম হোসেন, 'সিয়ার' দ্বিতীয় খণ্ড, পৃঃ ৬৯-৭০।

সমৃদ্ধ। এ অঞ্চলে শিক্ষক ও চিকিৎসকের চাহিদা ছিল ভালই।[৩] ঐতিহাসিক আবুল হাসান গুলিস্তানি (নাদির শাহের ইতিহাসের স্রষ্টা) এখানে এসেছিলেন। তাঁর পিতৃব্যও এ সময় বাংলাদেশে।

এ যুগে বাংলার নবাব, অভিজাত এবং শক্তিশালী ধনী জমিদাররা দেশের শিক্ষা ও শিক্ষা প্রতিষ্ঠানের পৃষ্ঠপোষক। শিক্ষা প্রতিষ্ঠান, ছাত্র ও শিক্ষকদের জন্য এঁরা নিষ্কর ভূমি দান করতেন। তাছাড়া রাষ্ট্রের কোষাগার থেকে শিক্ষা প্রতিষ্ঠান-গুলিকে মাসিক বা বাৎসরিক স্টাইপেণ্ড ও খরচ দেওয়ার নিয়ম ছিল। নদীয়ার রাজা কৃষ্ণচন্দ্র এযুগে এমন একজন শিক্ষানুরাগী পৃষ্ঠপোষক। তাঁর শিক্ষা সম্পর্কিত উৎসাহ ও বদান্যতা তাঁর জমিদারির মধ্যে সীমাবদ্ধ ছিল না। নদীয়ার বাইরে সুদূর বিক্রমপুর ও বাক্‌লার পণ্ডিতরা তাঁর অর্থানুকূল্য লাভ করেছিলেন। তিনি তাঁর নিজের জমিদারির মধ্যে সংস্কৃত চতুষ্পাঠী ও টোল প্রতিষ্ঠা করেছিলেন। শিক্ষা প্রতিষ্ঠান, ছাত্র ও শিক্ষকদের জন্য তিনি নিষ্কর ভূসম্পত্তি দান করেছিলেন। এছাড়া তিনি প্রতি মাসে ভারতের অন্যান্য অঞ্চল থেকে নবদ্বীপে উচ্চ শিক্ষার উদ্দেশ্যে আগত বিদেশী ছাত্রদের জন্য অন্তত দু'শ টাকা মাসোহারা হিসাবে ব্যয় করতেন। বর্ধমানের রাজা কীর্তিচাঁদ ও তিলকচাঁদ, বীরভূমে আসাদুল্লাহ ও বদিউজ্জামান খানের পরিবার, নাটোরের রামকান্ত ও তাঁর স্ত্রী রাণী-ভবানী, বিষ্ণুপুরের মল্লরাজা গোপাল সিংহ ও চৈতন্যসিংহ এবং ঢাকার রাজনগরের রাজবল্লভ সেন বিদ্যানুরাগী ছিলেন। এঁরা সকলেই জমিদারির আয়ের একটা অংশ বিদ্বান, পণ্ডিতব্যক্তি, শিক্ষাপ্রতিষ্ঠান, ছাত্র ও শিক্ষকদের জন্য ব্যয় করতেন। বাংলার জমিদাররা শুধু টাকা ব্যয় করেই ক্ষান্ত হতেন না। এ প্রতিষ্ঠানগুলি ভালোভাবে পরিচালনার জন্য তারা ব্যক্তিগতভাবে আগ্রহ দেখাতেন। শিক্ষক ও ছাত্রদের শিক্ষাগত যোগ্যতা ও উন্নতির খোঁজ খবর নিতেন।[৪]

বলা বাহুল্য এযুগে বাংলাদেশে বিশ্ববিদ্যালয়ের অধীনে কোনো সুশৃঙ্খল, সুগঠিত শিক্ষা ব্যবস্থা ছিল না। ব্যক্তিগত ও সামাজিক উদ্যোগ, নবাব অভিজাত ও জমিদারদের উৎসাহ ও পৃষ্ঠ পোষকতার ওপর তৎকালীন শিক্ষা ব্যবস্থা গড়ে উঠেছিল। এ ব্যবস্থাকে তিনভাগে ভাগ করা যায়। (১) হিন্দু ও মুসলমান ছাত্রদের জন্য মিশ্র প্রাথমিক শিক্ষার ব্যবস্থা—পাঠশালা ও তোলবা-

৩। যদুনাথ সরকার সম্পা: 'হিস্ট্রি অব বেঙ্গল', দ্বিতীয়খণ্ড, অধ্যায় একুশ।

৪। কার্তিকের চন্দ্ররায়, 'ঐ, পৃ: ৩৯—৪৪। এ. পি. মল্লিক, 'হিস্ট্রি অব বিষ্ণুপুররাজ', পৃ: ১১৫-১১৭।

খানা। (২) মুসলমান ছাত্রদের জন্য শিক্ষা ব্যবস্থা—মক্তব ও মাদ্রাসা এবং (৩) হিন্দু ছাত্রদের জন্য সংস্কৃত শিক্ষার ব্যবস্থা—চতুষ্পাঠী ও টোল।

এসময়ে বাংলাদেশে হিন্দু ও মুসলমান ছাত্রদের প্রাথমিক শিক্ষার জন্য ছিল গ্রামের পাঠশালা ও তোলবাখানা। এধরণের প্রতিষ্ঠানগুলিতে হিন্দু ও মুসলমান বালকরা পড়াশোনা শুরু করত। শতকরা আশিভাগ বা ততোধিক ছাত্রের শিক্ষার সমাপ্তিও হত এখানে। সাধারণত পাঁচ বছর বয়সে গ্রাম্য পাঠশালায় গুরু মহাশয়ের অধীনে বাঙালী শিক্ষার্থীর পাঠ শুরু হত এবং দশ এগারো বছরে এ শিক্ষার সমাপ্তি ঘটত। হিন্দু কন্যারা গ্রাম্য পাঠশালায় এক বা দু বছর পড়াশোনা করত। আট বছর বয়স পূর্ণ হলে অভিভাবকরা আর ওদের পাঠ-শালায় পাঠাত না। মুসলমান বালিকারা এধরণের গ্রাম্য পাঠশালায় পড়তে আসত না। অভিজাত মুসলমানরা নিজেদের গৃহে গৃহশিক্ষকের কাছে এদের পাঠের ব্যবস্থা করতেন। তিন চার খানা পাশাপাশি গ্রামের ছাত্রদের নিয়ে এযুগে এক একটি গ্রামীণ পাঠশালা গড়ে উঠত। সাধারণত ব্রাহ্মণ বা কায়স্থ বর্ণের কোনো ব্যক্তি গ্রামের পাঠশালায় গুরুগিরির দায়িত্ব নিতেন।[৫] ছাত্ররা কড়ি দিয়ে গুরু মহাশয়ের বেতন দিত। আর ফসল ওঠার সময় গুরু মহাশয় দক্ষিণা হিসাবে ফসলের একটা সামান্য অংশ পেতেন।

জমিদারের চণ্ডীমণ্ডপ, নাটমন্দির বা গুরু মহাশয়ের কুটিরে পাঠশালা বসত। চাটাই বা মাদুরে ছাত্রদের বসার ব্যবস্থা হত। আবহাওয়া ভাল থাকলে গাছ তলায়ও পাঠশালা বসত। গুরু মহাশয় অন্যান্য বিষয়ের মধ্যে ছাত্রদের শেখাতেন সামান্য অঙ্ক। অঙ্ক না শিখলে কোনো কাজ চলে না। চাষ বাসের হিসাব, ব্যবসা-বাণিজ্য, জমিদারির আয় ব্যয় ও রাজস্বের হিসাব রাখতেই হয়। সামাজিক প্রয়োজনের দিকে লক্ষ্য রেখে প্রাথমিক অঙ্ক শেখানো হত। বাংলাদেশে মুখে মুখে অঙ্ক শেখানোর রীতি শুভঙ্করের (ভৃগুরাম দাস) আগে থেকেই চালু ছিল। শুভঙ্কর তাঁর অতি পরিচিত মানসাঙ্কের ছড়াগুলিতে এ রীতিকে আরো সুন্দরভাবে সুগঠিত রূপ দিলেন। এই মানসাঙ্কের ছড়াগুলি ছাত্রদের কণ্ঠস্থ করতে হত। এছাড়া আরো দুটি জিনিস পাঠশালায় ছাত্রদের সেখানো হত। অক্ষর পরিচিতি, পড়া ও লেখা। এ সময়ে, বলা বাহুল্য, পড়ার জন্য মুদ্রিত বই বা লেখার জন্য শ্লেট ছিল না। ছাত্ররা তাল বা কলার পাতা লেখার জন্য ব্যবহার করত। মাটিতে বালি ছড়িয়ে তার ওপর আঙ্গুল দিয়ে লেখার প্রথা ছিল, খড়ি দিয়ে মাটিতেও লেখা হত। ঠিক একই

৫। ক্রফার্ড, 'স্কেচেস অব দি হিন্দুস', দ্বিতীয় খণ্ড, পৃঃ ১২-১৩।

পদ্ধতিতে ছাত্রদের বর্ণ পরিচয় হত। পাঠশালায় কোনো বই পড়ানো হত না। দু চারটি ছড়া ও কবিতা মুখে মুখে শেখানো হত। অনেক সময় পাথরের নুড়ি ও ঝিনুক নিয়ে অঙ্ক শেখানো হত।[৬] অল্প পড়া, চিঠি লেখা ও অঙ্ক কষা এ তিনটি হল এ যুগে পাঠশালা শিক্ষার মূল উদ্দেশ্য। ছাত্ররা এগুলি আয়ত্ত্ব করতে পারলেই গুরু মহাশয় খুশী হতেন। এ যুগে বাংলা পাঠশালা ছাড়াও আরো এক ধরণের মিশ্র প্রাথমিক শিক্ষা প্রতিষ্ঠানের পরিচয় পাওয়া যায়। এর নাম তোলবাখানা।[৭] শমশের গাজীর পুঁথিতে এ রকম বিদ্যালয়ের উল্লেখ আছে। শমশের গাজী আরবী, ফারসী এবং বাংলা শেখানোর জন্য ১০০ ছাত্র রেখেছিলেন। তিনি ছাত্রদের পড়ানোর জন্য হিন্দুস্তান থেকে আরবী শিক্ষক, ঢাকার কাছে জগদিয়া থেকে বাংলা পণ্ডিত এবং ঢাকা থেকে ফারসী পড়ানোর জন্য মুন্সী এনেছিলেন। হিন্দু ও মুসলমান উভয় সম্প্রদায়ের বালকেরা তাঁর পাঠশালায় পড়ত। এভাবে পাঠশালা ও তোলবাখানার মাধ্যমে প্রাথমিক শিক্ষা ব্যবস্থা সারা বাংলা দেশে চালু ছিল। এখানে শিক্ষা নিয়ে বেশিরভাগ বাঙালী সন্তান তাদের শিক্ষা শেষ করত। জাগতিক কাজকর্ম সম্পাদনে এবং সহজ, সরল গ্রামীন জীবন-যাপনে তাতে কোনো অসুবিধা হত না! অবশ্য যেটুকু শিক্ষা তারা পাঠশালায় পেত তার চর্চা থাকত। বাড়িতে বাংলা রামায়ণ, মহাভারত ও ভাগবত পুরাণের বাংলা অনুবাদ পাঠ এবং কথকতা, পাঁচালী, পল্লীগাথা ও গীতিকাব্য শোনা এ যুগের বাঙালীর মননশীলতার অঙ্গ। এগুলির মধ্যদিয়ে বাঙালীর মন ও মানসিকতা গড়ে উঠত। একদল ভ্রাম্যমান শিক্ষক এর পুষ্টি যোগাত। এঁরা হলেন সুফী, দরবেশ, ফকির, ব্রাহ্মণ ঠাকুর, বৈষ্ণব সহজিয়া, আউল, বাউল, কর্তাভজা প্রভৃতি। এঁরা গ্রামে গ্রামে ঘুরে বংলার আপামর জনসাধারণকে ধর্ম, নৈতিকতা, ইহলোক-পরলোক সম্বন্ধে নানা রকম উপদেশ দিতেন। ধর্মশাস্ত্রের তত্ত্ব ও অনুশাসন সহজভাবে ব্যাখ্যা করতেন। একেশ্বরবাদ, বিশ্বজনীন ভ্রাতৃত্ব, সাম্য ও ন্যায়ের পক্ষে প্রচার চালাতেন। বাঙালীর মানসলোক গঠনে এদের প্রভাব অস্বীকার করা যায় না। নির্ভয়ে বলা যেতে পারে এ যুগে বেশির ভাগ বাঙালী নিরক্ষর ছিল কিন্তু অজ্ঞ ছিল না।

বাংলার নবাব, অভিজাত, আমির ও ধনী মুসলমানদের বদান্যতায় ও অর্থানুকূল্যে

৬। ক্রফার্ড, ঐ ; ওয়ার্ড, 'হিস্ট্রি অব দি হিন্দুস' (১৮১৮), প্রথম খণ্ড পৃঃ ১১৯।
৭। দীনেশ চন্দ্র সেন, 'টিপিক্যাল সিলেকশনস্ ফ্রম ওল্ড বেঙ্গলি লিটারেচার' দ্বিতীয় খণ্ড, পৃঃ ১৮৫৪।

মক্তব ও মাদ্রাসা ঘিরে মুসলিম শিক্ষা ব্যবস্থা গড়ে উঠেছিল। বাংলার মধ্য ও পূর্বাঞ্চল মুসলমান প্রধান; পশ্চিমাঞ্চল হিন্দুপ্রধান। কয়েকটি মুসলমান প্রধান গ্রাম নিয়ে মুসলমান বালকদের পঠন পাঠনের জন্য মক্তব পরিচালিত হত। এখানকার শিক্ষকরা 'আখুনজী' নামে পরিচিত হতেন। এদের কাজ হল বালকদের আরবী, উর্দু ও ফারসী বর্ণমালা শেখানো, লিখতে শেখানো, মুখে মুখে আরবী ও ফারসী সাহিত্য থেকে পড়োনো, প্রাথমিক অঙ্ক শেখানো এবং ইসলামী ধর্ম শাস্ত্রের সঙ্গে প্রাথমিক পরিচয় করে দেওয়া। মক্তবের বালকরা তাল ও কলাপাতা ছাড়াও লেখার জন্য দেশী কাগজ ব্যবহার করত। খাগ ও কঞ্চির কলম এবং দেশী কালি ব্যবহার করা হত। বেশির ভাগ ছাত্র পাঠশালা ও মক্তবে শিক্ষা শেষ করে চাষবাস ও পারিবারিক বৃত্তিতে যোগ দিত। এদের মধ্যে যারা মেধাবী ও উচ্চাকাঙ্ক্ষী তারা উচ্চতর শিক্ষার জন্য মাদ্রাসাগুলিতে গিয়ে হাজির হত। এ যুগের মাদ্রাসাগুলি সাধারণত মসৃজিদ ও ইমামবাড়ার সঙ্গে যুক্ত থাকত। রাজধানীতে, প্রধান শহরগুলিতে এবং জেলা শহরে মাদ্রাসা ছিল, সরকার এগুলির পঠন পাঠন ও রক্ষণাবেক্ষণের জন্য অকাতরে অর্থ ব্যয় করত। এগুলির জন্য অনেক নিষ্কর ভূমি নির্দ্দিষ্ট ছিল।[৮] তাছাড়া ছিল রাষ্ট্রের কোষাগার থেকে মাসিক বা বাৎসরিক অর্থ বরাদ্দ। ছাত্ররা এ মাদ্রাসাগুলিতে বিনা খরচায় আহার ও বাসস্থান পেত এবং বিনা বেতনে পড়াশোনা করত। মুসলিম শাস্ত্রের পণ্ডিত, মৌলভি এবং বিদ্বান ব্যক্তিরা এখানে শিক্ষকতা করতেন। এখান থেকে পাশ করার পর ছাত্ররা শিক্ষকতা করত বা বিচার বিভাগে চাকরি পেত। সম্রাট আরঙ্গজেব শিক্ষিত ব্যক্তিদের বিচার বিভাগে নিযুক্ত করার ব্যবস্থা করেছিলেন। মাদ্রাসাগুলিতে ছাত্রদের ইসলামীয় ধর্মশাস্ত্র (কোরাণ, হাদিস ইত্যাদি), আইন (সরাহ্) আরবী, ফারসী সাহিত্য, আরব দেশের বিজ্ঞান ও চিকিৎসাশাস্ত্র শেখানো হত।

বাংলার ধনী হিন্দু জমিদাররা এ যুগে বাংলাদেশে সংস্কৃত শিক্ষার ধারক ও বাহক। এঁরা সকলেই নিজেদের জমিদারিতে সংস্কৃত শিক্ষার জন্য চতুষ্পাঠী ও টোল স্থাপন করেছিলেন। চতুষ্পাঠী ও টোলগুলিতে ছাত্ররা শিক্ষকদের সঙ্গে থাকত। শিক্ষকরা ছাত্রদের আহার, বাসস্থান ও শিক্ষার ব্যবস্থা করত। জমিদারদের দানে ব্যয় নির্বাহ হত। শিক্ষকদের প্রয়োজনও খুব কম। বংলার ব্রাহ্মণ পণ্ডিতরা অধ্যয়ন, অধ্যাপনা, শাস্ত্রচর্চা ও গ্রন্থ রচনায় নিযুক্ত থাকতেন। এঁদের

৮। পঞ্চম অধ্যায় দেখুন।

মধ্যে অনেকেই ছিলেন জাগতিক সুখ দুঃখ ও অন্যান্য ব্যাপারে উদাসীন। হিন্দু বালকের পাঁচ বছর বয়সে চতুষ্পাঠীতে এক বিশেষ অনুষ্ঠানের মাধ্যমে শিক্ষারম্ভ হত। প্রথমে ছাত্রকে বর্ণ শিক্ষা দেওয়া হত। তারপর আস্তে আস্তে তাকে ব্যাকরণ, কাব্য, অলংকার, ন্যায়, স্মৃতি, জ্যোতিষ, দর্শনের বিভিন্ন শাখা, বেদান্ত ও বৈদিক ছন্দ শেখানো হত। এ যুগে বাংলা দেশের বহু শহর ও গ্রামে চতুষ্পাঠী ছিল। রামপ্রসাদ 'বিদ্যাসুন্দরে' বর্ধমানের একটি চতুষ্পাঠীর বর্ণনা দিয়েছেন। বর্ধমানে সংস্কৃত শিক্ষার জন্য দ্রাবিড়, উৎকল, কাশী ও মিথিলা থেকে ছাত্ররা আসত।[১]

চতুষ্পাঠীর শিক্ষান্তে মেধাবী ও উচ্চাভিলাষী ছাত্ররা সংস্কৃত শিক্ষার উচ্চতর প্রতিষ্ঠানে যেত। এযুগে সংস্কৃত শিক্ষার উচ্চতর প্রতিষ্ঠানগুলি হল টোল। বাংলার অক্সফোর্ড নবদ্বীপ ছাড়াও সংস্কৃত শিক্ষার টোল ছিল ২৪ পরগণার ভাটপাড়া, গুপ্তিপাড়া, বর্ধমান, ত্রিবেণী, হাওড়ার বালী, ঢাকার রাজনগর ও বিষ্ণুপুর প্রভৃতি স্থানে। এখানে ছাত্রদের উচ্চতর বিষয়ে পড়াশুনা করার সুযোগ থাকত। ছাত্ররা ন্যায়শাস্ত্র অধ্যয়ন করার জন্য নবদ্বীপ যেত। ষোড়শ শতাব্দীর নৈয়ায়িক পণ্ডিত রঘুনাথ শিরোমণি এ ঐতিহ্যের প্রতিষ্ঠাতা। বাংলার টোলগুলিতে ন্যায়-শাস্ত্র ছাড়াও পড়ানো হত ব্যাকরণ, স্মৃতি (আইন), কাব্য, দর্শন, জ্যোতিষ, বেদ, পুরাণ ও অভিধান। সাধারণত ছাত্ররা কোনো একটি বিষয় নিয়ে আট থেকে ষোলো বছর পড়াশুনা করত। বাংলাদেশে পাঠ শেষ করে অনেক ছাত্র দর্শন ও স্মৃতিতে উচ্চতর পাঠের জন্য মিথিলায় (দ্বারভাঙ্গা) যেত। তেমনি ব্যাকরণ, অলংকার এবং বেদে উচ্চতর জ্ঞানের জন্য কাশী যেত। উচ্চতম পাঠ শেষে এইসব ছাত্র নিজেদের গ্রাম বা শহরে ফিরে চতুষ্পাঠী ও টোল খুলে ছাত্রদের শিক্ষা দিত।

এযুগে স্ত্রীজাতির শিক্ষার জন্য কোনো প্রতিষ্ঠান ছিল না। হিন্দু বালিকারা আট বছর বয়স পর্যন্ত বালকদের সঙ্গে পাঠশালায় পড়ত। বাংলার মুসলিম সমাজ এ ব্যাপারে আরো গোঁড়া ও রক্ষণশীল। ধনীরা বাড়িতে গৃহ শিক্ষক রেখে কন্যাদের প্রাথমিক শিক্ষার ব্যবস্থা করতেন। দরিদ্র মুসলমান পরিবারের বালিকাদের লেখা পড়া শেখা হত না। ব্রাহ্মণ ও কায়স্থ মহিলাদের অনেকে বাড়িতে লেখা পড়া শিখে নিতেন। এযুগে মহিলাদের পড়াশোনাটা অনেকখানি ব্যক্তিগত উদ্যোগের ব্যাপার। রাষ্ট্রের বা জমিদারদের এ ব্যাপারে

১। রামপ্রসাদ সেন, 'গ্রন্থাবলী', বসুমতী সং, পৃঃ ৫০-৫১।

কোনো দায় দায়িত্ব ছিল না। নারীজাতির শিক্ষা সম্পর্কিত মনোভাব থেকে এযুগের মানুষের নারীজাতি সম্পর্কে দৃষ্টিভঙ্গিটাও পরিষ্কার হয়। সমাজ নেতারা চাননি মহিলারা প্রশাসনে, রাষ্ট্র পরিচালনায় বা বিচার বিভাগে উচ্চ পদ গ্রহণ করুক। তারা চেয়েছিলেন মহিলারা গৃহ কর্ত্রী হয়ে গৃহরক্ষা করুক। গৃহই তাদের প্রধান কর্মক্ষেত্র বলে বিবেচিত হত। সমাজ নেতাদের এরকম মনোভাব সত্ত্বেও এযুগে আমরা কয়েকজন অসাধারণ বিদুষী, ও বুদ্ধিমতী মহিলার সাক্ষাৎ পাই। ভারতচন্দ্র ও রামপ্রসাদের বিদ্যাসুন্দরের নায়িকা বিদ্যা অসাধারণ বিদূষী। 'হরিলীলার' কবি জয়নারায়ণ সেনের আত্মীয়া আনন্দময়ী, দয়াময়ী ও গঙ্গামণি সকলেই বিদূষী ও অল্পবিস্তর কবিখ্যাতি সম্পন্না। রাজবল্লভ বৈদ্যদের যজ্ঞোপবীত ধারণ উপলক্ষ্যে যে যজ্ঞের অনুষ্ঠান করেছিলেন আনন্দময়ী অথর্ববেদ ঘেঁটে সেই যজ্ঞের বেদি প্রস্তুত করে দেন। এ থেকে মনে হয় এযুগে উচ্চবংশীয় মহিলারা সংস্কৃত জানতেন।[১০] নাটোরের রাণী ভবানী বিদূষী ছিলেন। বিশাল জমিদারির হিসাবপত্র তিনি নিজে তদারকি করতেন। এযুগে বাংলার অভিজাত বংশীয় মুসলমান রমনীরা পিছিয়ে ছিলেন না। গোলাম হোসেন আলিবর্দ্দীর বেগমের ভূয়সী প্রশংসা করেছেন। মারাঠাদের সঙ্গে যুদ্ধের সময় তিনি স্বামীর পাশে পাশে থাকতেন। রাষ্ট্রনীতি ও সামরিক বিষয়ে তিনি স্বামীকে সুপরামর্শ দিতেন। তিনি আলিবর্দ্দীকে কখনো অন্যায় কাজ করতে পরামর্শ দেননি। আলিবর্দ্দী তাঁর মতামতকে যথেষ্ট গুরুত্ব দিতেন। মুর্শিদকুলীর বেগমও একজন মহীয়সী মহিলা ছিলেন। এই মহিলা একক চেষ্টায় জামাতা সুজাউদ্দিন ও দৌহিত্র সরফরাজ খানের মধ্যে বিরোধ মিটিয়ে গৃহযুদ্ধের হাত থেকে বাংলাদেশকে বাঁচিয়েছিলেন। সুজাউদ্দিনের কন্যা দরদানা বেগম (দ্বিতীয় মুর্শিদকুলীর স্ত্রী), সরফরাজ খানের মাতা জিন্নাতুন্নেসা বেগম, ভগ্নি নাফিসা বেগম এ যুগের মুসলিম অভিজাত মহিলাদের মধ্যে বিদূষী ও বুদ্ধিমতী বলে খ্যাতি অর্জন করেছিলেন।[১১]

ফারসী এযুগে দরবারি ভাষা। হিন্দু ও মুসলমান অভিজাত ও জমিদাররা সকলেই ফারসী শিখতেন। তাছাড়া শিক্ষিত বাঙালীরা সকলেই রাজকার্য্য পাওয়ার আশায় ফারসী শিখতেন। এযুগে সবচেয়ে বড় দুজন বাঙালী কবি ভারত

১০। দীনেশ চন্দ্র সেন, 'বৃহৎ বঙ্গ', দ্বিতীয় খণ্ড, পৃ: ৯১০-৯১২।

১১। ব্রজেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়, 'বেগমস্ অব বেঙ্গল'।

চন্দ্র ও রামপ্রসাদ—ফারসী শিখেছিলেন। ওয়ারেন হেস্টিংসের ফারসী শিক্ষক রাজা নবকৃষ্ণ এবং ধর্ম মঙ্গলের কবি নরসিংহ বসু ভাল ফারসী জানতেন। বিহারের ডেপুটি গভর্ণর রামনারায়ণ ফারসী ও উর্দু'তে কবিতা লিখতেন। গোলাম হোসেন আলম চাঁদের পুত্র কাইরেত চাঁদের ফারসী জ্ঞানের প্রশংসা করেছেন। এযুগে বাংলার নবাবরা বাঙালী হিন্দুদের প্রশাসনিক কাজকর্মে বিপুল সংখ্যায় নিযুক্ত করেছিলেন। স্বাভাবিক ভাবে প্রশাসনিক ভাষা তাদের শিখতে হয়েছিল। প্রয়োজন ছাড়াও এযুগের পণ্ডিত ও বিদ্বান বাঙালী ফারসী শিখতেন। ফারসী এযুগের বঙ্গসংস্কৃতির অঙ্গ। এযুগে উচ্চ শ্রেণীর মুসলমানদের শিক্ষার স্বরূপ সম্পর্কে ল্যুক স্ক্র্যাফটনের গ্রন্থে আভাস মেলে।[১২] এদের শিক্ষার তিনটি উল্লেখযোগ্য বৈশিষ্ট্য হল : (১) আরবী ও ফারসী লিখতে ও পড়তে শেখা, (২) গাম্ভীর্য ও বিচক্ষণতা অর্জন করা ; সেই সঙ্গে আবেগ ও অধৈর্য্যভাব দমন করা, (৩) অশ্বারোহন ও অস্ত্রচালনা শিক্ষা করা। হিন্দু অভিজাত ও জমিদারদের শিক্ষার ধরণটিও অনেকটা এরকম। এরা সকলেই কম বেশি ফারসী শিখতেন, বাংলা পড়তে ও লিখতে শিখতেন, আর তার সঙ্গে জমিদারি পরিচালনার জন্য সামান্য অঙ্কের জ্ঞান দরকার হত। বাংলার হিন্দু জমিদাররা সকলেই অশ্বারোহন এবং অস্ত্রচালনা শিখতেন। অনেকেই এবিষয়ে কৃতবিদ্য হয়েছিলেন। কৃষ্ণচন্দ্রের পিতা রঘুরাম ধনুর্বিদ্যা ও অস্ত্র চালনায় বিশেষ পারদর্শিতা অর্জন করেছিলেন।

গোলাম হোসেন তাঁর গ্রন্থে আলিবর্দ্দীর দরবারের বিদগ্ধ ব্যক্তিদের এক তালিকা দিয়েছেন। এ'রা হলেন ইসলামী শাস্ত্রে সুপণ্ডিত মৌলভি নাসের, দাউদ আলি খাঁ (ইনি জাহির হোসেন খাঁ নামে অধিক পরিচিত), কবি মির্জা মোয়েজ মুসেবি খাঁয়ের শিষ্য মির মাহমেদ আলিম, ইসলামী শাস্ত্রজ্ঞ মৌলভি মোহাম্মদ আরিফ, মির রুস্তম আলি, কোরাণে সুপণ্ডিত শাহ মাহমেদ আমিন, শাহ্ আধেম, হায়াত বেগ, বিখ্যাত ধর্মজ্ঞ শাহ্ খিজির, গুণী ও ধর্মপ্রাণ সৈয়দ মীর মাহমেদ সাজ্জাদ, ইতিহাসবিদ্ গোলাম হোসেনের পিতামহ সৈয়দ আলিমুল্লাহ এবং শাহ্ হায়দারি। আলিবর্দ্দী পাটনার বিখ্যাত পণ্ডিত কাজী গোলাম মজফ্ফরকে মুর্শিদাবাদের প্রধান বিচারকের পদে নিযুক্ত করেছিলেন।[১৩] সুজাউদ্দিনের সময় হাদি আলি খাঁ দরবারের চিকিৎসক নিযুক্ত হন। ইনি এবং এর পরিবার

১২। ল্যুক স্ক্র্যাফটন, 'রিফ্লেকশনস্', পৃঃ ১৯।

১৩। গোলাম হোসেন, 'সিয়ার' দ্বিতীয় খণ্ড, পৃঃ ১৬৫-১৭৫।

চিকিৎসা বিদ্যা, পাণ্ডিত্য ও শাস্ত্র জ্ঞানের জন্য, এযুগের মুর্শিদাবাদ সুপরিচিত। আলিবর্দী হাদি আলিকে বার্ষিক ১৪,০০০ টাকা বেতন দিতেন। এর জ্যেষ্ঠ-পুত্র মোহাম্মদ হোসেন খাঁও একজন সুপণ্ডিত ও সুচিকিৎসক ছিলেন। হাদি আলির ভাই নাকি আলি খাঁ সম্রাট মহম্মদ শাহের ব্যক্তিগত চিকিৎসক ছিলেন।[১৪]

এযুগে কৃষ্ণচন্দ্রের নদীয়া বাংলার হিন্দু শিক্ষা ও সংস্কৃতির সবচেয়ে বড় কেন্দ্র। অপর দুটি কেন্দ্র হল বর্ধমান ও রাজনগর (ঢাকা)। কৃষ্ণচন্দ্রের সময়ে (১৭১০-১৭৮২) নদীয়াতে বিবিধ বিদ্যাবিশারদ ব্যক্তির আবির্ভাব হয়েছিল। এযুগে নবদ্বীপে ন্যায়শাস্ত্রে পণ্ডিতদের মধ্যে ছিলেন হরিরাম তর্ক সিদ্ধান্ত, কৃষ্ণানন্দ বাচস্পতি, রামগোপাল সার্বভৌম এবং প্রাণনাথ ন্যায়পঞ্চানন। ধর্মশাস্ত্রে পণ্ডিতদের মধ্যে ছিলেন গোপাল ন্যায়ালঙ্কার, রামানন্দ বাচস্পতি এবং বীরেশ্বর ন্যায়পঞ্চানন। দর্শনশাস্ত্রে খ্যাতিলাভ করেছিলেন শিবরাম বাচস্পতি, রমাবল্লভ বিদ্যাবাগীশ, রুদ্ররাম তর্কবাগীশ, শরণ তর্কালঙ্কার, মধুসূদন ন্যায়ালঙ্কার, কান্ত বিদ্যালঙ্কার এবং শঙ্কর তর্কবাগীশ। গুপ্তিপাড়া গ্রামে ছিলেন প্রসিদ্ধ কবি বাণেশ্বর বিদ্যালঙ্কার, ত্রিবেণীতে পণ্ডিত জগন্নাথ তর্ক পঞ্চানন এবং শান্তিপুরে পণ্ডিত রাধামোহন গোস্বামী ভট্টাচার্য্য। জ্যোতিষশাস্ত্রে রামরুদ্র বিদ্যানিধি এবং বাংলা কাব্যে ভারতচন্দ্র এবং রামপ্রসাদ। এদের মধ্যে কেউ কেউ রাজার কাছেই থাকতেন ; অন্যদের কৃষ্ণচন্দ্র ডাকলেই উপস্থিত হতেন। নানাবিধ শাস্ত্রালোচনা হত। কবি বাণেশ্বর প্রায়ই রাজার কাছে থাকতেন।[১৫] পশ্চিম বাংলায় যেমন কৃষ্ণচন্দ্র পূর্ব বাংলায় তেমনি রাজবল্লভ, হিন্দুদের শিক্ষা ও সংস্কৃতির নেতৃত্ব দিয়েছিলেন। তিনি রাজনগরে চতুষ্পাঠী, টোল, মক্তব এবং পাঠশালা স্থাপন করে শিক্ষার প্রসারে যত্নবান হন। রাজনগরের মেধাবী ছাত্রদের তিনি নবদ্বীপে উচ্চতর সংস্কৃত শিক্ষার জন্য পাঠিয়েছিলেন। এদের মধ্যে তিনজন নীলকণ্ঠ সার্বভৌম, কৃষ্ণদেব বিদ্যাবাগীশ এবং কৃষ্ণকান্ত সিদ্ধান্ত কৃতী হয়ে রাজনগরে সংস্কৃত শিক্ষাদানের জন্য টোল খুলেছিলেন। পণ্ডিত হিসাবে তৎকালীন বাংলাদেশে এ'রা খ্যাতিলাভ করেছিলেন।

এযুগে বাংলা রাজকাজে ব্যবহৃত হত না। ত্রিপুরা, কুচবিহার ও আসামে

১৪। আবদুল মাজিদ খাঁ, 'দি ট্রানজিশন ইন বেঙ্গল', পৃঃ ১৭-১৮। এ পরিবারে মোহাম্মদ রেজা খাঁ জন্ম গ্রহণ করেছিলেন। রেজা খাঁ হাদি আলির তৃতীয় পুত্র।

১৫। কার্তিকেয় চন্দ্র রায়, ঐ, পৃঃ ১৪৬-১৪৭।

বাংলা রাজভাষা ছিল। দলিল, দস্তাবেজ ও চিঠিতে বাংলা গদ্য লেখা হত। বৈষ্ণব সহজিয়ারা বাংলা গদ্যে তাদের ধর্মপুস্তিকা লিখতেন। স্মৃতিগুলি বাংলা গদ্যে অনূদিত হয়েছিল। ভাষা সরল, বাক্যগুলি জটিল নয়। অল্প কথায় ভাবপ্রকাশ করা হয়েছে। এসব সত্ত্বেও বলা যায় এসময়ে বাংলা গদ্য সাহিত্যের বাহন বা উচ্চ ভাব প্রকাশের ক্ষমতা পায়নি।[১৬] এযুগে কবিরা সবাই ছন্দে বাংলাকাব্য, বিশেষ করে মঙ্গলকাব্য, পাঁচালী, গাথা লিখেছেন। অজস্র পল্লীকবি—হায়াত মাহমুদ ও শেখ মনহর থেকে ফকিররাম ও ঘনরাম—বাংলার মানুষের কাব্য পিপাসা মিটিয়েছেন। এযুগে বাঙালীর কথা-বার্তায় বা লেখায় বিশুদ্ধ বাংলার ব্যবহার কম। বাংলার মধ্যে অজস্র আরবী ফারসী, হিন্দী ও উর্দু শব্দ। এমনকি এযুগে বিদ্বান ব্যক্তিরা পর্যন্ত মিশ্র ভাষা ব্যবহার করতেন। এপ্রসঙ্গে ভারতচন্দ্রের 'অন্নদামঙ্গলের' একটি পঙ্‌ক্তি স্মরণ করা যেতে পারে: 'অতএব কহি ভাষা যাবনী মিশাল'।[১৭] এযুগে অভিজাত মুসলমানরা বাংলায় কথা বলতেন না। বাংলার সংস্কৃত পণ্ডিতরা বাংলাকে অবজ্ঞার চোখে দেখতেন। তারা একপ্রকার সংস্কৃত ও বাংলার মিশ্র রীতিতে লিখতেন। এতে সংস্কৃতই বেশি থাকত, বাংলা কম। বাংলার হিন্দু জমিদাররা সংস্কৃত শিক্ষার পৃষ্ঠপোষকতা করতেন। মাতৃভাষার উন্নতিতে তাদের তেমন নজর ছিল না। এযুগে গুরুমহাশয়ের পাঠশালা হল বাংলা শিক্ষার একমাত্র প্রতিষ্ঠান। বাংলার অগ্রগতি মন্থর; সংস্কৃতের অগ্রগতি অপেক্ষাকৃত দ্রুত।

প্রাক্-পলাশী যুগে কলকাতায় এদেশে ইংরাজী শিক্ষার সূত্রপাত হয়েছিল। খ্রীষ্টান মিশনারীরা এর উদ্যোক্তা। কলকাতার ভবঘুরে ও অনাথ বালকদের ইংরাজী শিক্ষার প্রথম মিশনারী প্রতিষ্ঠান হল 'ওল্ড চ্যারিটি সকুল।' ১৭৪২ খ্রীষ্টাব্দে এর প্রতিষ্ঠা। ১৭৫৪ খ্রীষ্টাব্দে মিশনারী ম্যাপলটফ্‌ট (Mopletoft) ইংরাজী শিক্ষা প্রসারের জন্য কলকাতা কাউন্সিলের কাছে আর্থিক সাহায্যের আবেদন করেছিলেন। ঐ আবেদনে তিনি ইংরাজী শিক্ষার দুটি সম্ভাব্য সুফলের কথা উল্লেখ করতে ভোলেননি। প্রথমত, বালকরা ইংরাজী ও হিসাব শিখলে কোম্পানীর কর্মচারী সংগ্রহের সুবিধা হবে। দ্বিতীয়ত, কলকাতার ভদ্রলোকরাও ইংরাজী শিক্ষার ফলে নানাভাবে উপকৃত হবেন।[১৮] পরবর্তীকালে ইংরাজী

১৬। দীনেশ চন্দ্র সেন, 'বৃহৎ বঙ্গ', দ্বিতীয় খণ্ড, পৃঃ ১১১১-১০১২।
১৭। ভারতচন্দ্রের গ্রন্থাবলী, বসুমতী সং, মানসিংহ, পৃঃ ১২১।
১৮। রেজা: জে. লঙ্, ঐ, পৃঃ ৪৮-৪৯।

শিক্ষা বিস্তারে প্রাথমিক ভাবনার আভাস পাওয়া যাচ্ছে। মিশনারী কিয়েরনানভার এবং তার সহযোগী সিলভেষ্টার এদেশীয়দের ইংরাজী শিক্ষাদানের জন্য উদ্যোগী হয়েছিলেন। ১৭৫৮ খ্রীষ্টাব্দে তাঁর স্কুলে ১৭৫ জন ছাত্র ছিল। এর মধ্যে ৭৮ জন 'সোসাইটি ফর দি প্রমোশন অব ক্রিশ্চিয়ান নলেজের' টাকায় শিক্ষা পেত। সিলভেস্টার এসময় খৃষ্টধর্মের প্রশ্নোত্তরমূলক প্রচার পুস্তিকা ও প্রার্থনা বই বাংলায় অনুবাদের চেষ্টা করেছিলেন।[১৯] খ্রীস্টান মিশনারী ও ধর্মযাজকদের আগ্রহ সত্ত্বেও এযুগে বাংলা দেশে ইংরাজী বা অন্য কোনো ইউরোপীয় ভাষা ও জ্ঞান বিজ্ঞান শেখার আগ্রহ দেখা যায় না। এডওয়ার্ড ইভস্ লিখেছেন 'যদিও বালকদের শিক্ষার জন্য অনেক স্কুল আছে তবুও এরা মাতৃভাষা ছাড়া আর কোনো ভাষা শেখে না। বাংলাদেশে অনেক ইংরাজ থাকেন এবং দুই গোষ্ঠীর মধ্যে প্রতিনিয়ত আদান প্রদান ও মেলামেশা আছে তবুও আশ্চর্যের বিষয় এদের ইংরাজীতে আলাপ করার ক্ষমতা মাদাগাস্কারের সমুদ্র বন্দরগুলির লোকদের মত ভাল নয়'।[২০]

১৯। জে. লঙের প্রবন্ধ 'ক্যালকাটা ইন দি ওল্ডেন টাইম'।
২০। এডওয়ার্ড ইভস্, 'ভয়েজ', পৃঃ ২৯।

নবম অধ্যায়

ধর্ম, ধর্মীয় জীবন ও নৈতিক মান

প্রাক্-পলাশী বংলার ধর্ম ও ধর্মীয় জীবনকে প্রধানত দুভাগে ভাগ করা যায়—হিন্দু ও ইসলাম। এযুগের হিন্দু ধর্ম ও ধর্মীয় জীবন সম্পর্কে একজন বিদেশী ইতিহাসবিদ্ গুরুত্বপূর্ণ মন্তব্য করেছেন ঃ 'বহুকাল বিদেশী আক্রমণের সঙ্গে পরিচয় এবং বিদেশী সমাজের সঙ্গে বাস করার ফলে হিন্দুরা পৃথিবীর সবচেয়ে পরমত-সহিষ্ণু জাতি। যে কোনো বিদেশীকে সে সহজেই গ্রহণ করে যদি না তার সামাজিক জীবনে অনুপ্রবেশ ঘটে। নিজের বদ্ধ আবেষ্টনীতে সে অন্যের হস্তক্ষেপ পছন্দ করে না ; তবে অন্যমত ও ধর্ম সম্পর্কে সহনশীল। আত্মরক্ষামূলক অতিক্ষুদ্র বর্ণে বিভক্ত সমাজে life was their religion, and religion their life'.[১] জীবনই হিন্দুদের ধর্ম এবং ধর্মই জীবন। পৃথিবীর সব জাতির জীবনে অল্পবিস্তর ধর্মের প্রভাব দেখা যায়, কিন্তু ধর্ম ও জীবনের মধ্যে এমন নিবিড় যোগ—ধর্ম ভিত্তিক, ধর্মশাসিত এবং জন্ম থেকে মৃত্যু পর্যন্ত এমন ধর্মনিয়ন্ত্রিত জীবন খুব কম দেখা যায়, এযুগের হিন্দুধর্ম ও জীবনকে life of religion, by religion and for religion বললে খুব একটা অত্যুক্তি হয় না। হিন্দু ধর্মজীবনের মত মুসলিম ধর্মীয় জীবনও অনেকখানি বদ্ধ ব্যবস্থা (closed system)। এর বাইরে যারা সবাই হীন ও বিধর্মী। হিন্দু ও ইসলামের এক সাধারণ বৈশিষ্ট্য হল ধর্ম ও সংস্কৃতি এক ও অচ্ছেদ্য। অষ্টাদশ শতাব্দীর ইউরোপীয়দের মত ধর্মীয় ও পার্থিব জীবন স্বতন্ত্র নয়। ধর্মীয় অনুশাসনের বাইরে কোনো যুক্তি, দৃষ্টি, মূল্য বিচার পদ্ধতি, নৈতিকমান বা মূল্যবোধ নেই।

হিন্দু ধর্ম ও ধর্মীয় জীবনকে তিনভাগে ভাগ করা যায়। বৈষ্ণব, শাক্ত ও শৈব। আদিবাসী ও সাঁওতালরা একটি স্বতন্ত্র গোষ্ঠী। এ যুগে বাংলাদেশে হিন্দুদের এক তৃতীয়াংশ বৈষ্ণব। ষোড়শ শতাব্দীর প্রথমার্ধে চৈতন্যদেব (১৪৮৬-১৫৩৩) যে শক্তিশালী সামাজিক ও ধর্মীয় আন্দোলন সৃষ্টি করেছিলেন এ সময়েও তা যথেষ্ট শক্তিশালী। চৈতন্যদেবের প্রচারিত ধর্ম খুব সহজ ও সরল। কৃষ্ণে ভক্তি ও প্রেম, কৃষ্ণনাম জপ, নাম সংকীর্তন, শুদ্ধ, পবিত্র, অহিংস জীবন যাপন এবং নিরামিষ ভোজন। এ হল বৈষ্ণব ধর্মীয় জীবনের মূল কথা। চৈতন্যদেব

১। পি. স্পীয়ার, 'দি নাবোবস্', পৃঃ ১২৬।

বর্ণাশ্রম ধর্মের বিরুদ্ধে বিদ্রোহ করেছিলেন। তাঁর মৃত্যুর পর বর্ণভেদ প্রথা আবার বৈষ্ণবদের মধ্যে মাথা তুলে দাঁড়াল, আধ্যাত্মিকতার উচ্চস্তরে উঠেছিল গৌড়ীয় বৈষ্ণব ধর্ম ; আস্তে আস্তে তার অবনমন শুরু হল। রামানন্দ, কবীর, নানক ও দাদু উত্তর ভারতে যে ধর্মান্দোলন গড়ে তুলেছিলেন তার মূলে ছিল একেশ্বরবাদ সর্বজনীন ভ্রাতৃত্ব সহিষ্ণুতা এবং সকলের জন্য প্রেম। এদের তিরোধানের পর অষ্টাদশ শতাব্দীর প্রথমে গরীবদাস (১৭১৭—১৭৭৮), শিবনারায়ণ (১৭১০), বুল্লেশাহ (১৭০৩), রামচরণ (১৭১৫) এবং প্রাণনাথ (১৭১০—১৭৫০) এ ধারাটি অক্ষুণ্ণ রেখেছিলেন।[২] বাংলার বৈষ্ণব সহজিয়াদের ওপর এদের প্রভাব পড়েছিল। অনেকের মতে বৌদ্ধ প্রভাব, তান্ত্রিকমত এবং সহজিয়া মত ও পথ বাংলায় বৈষ্ণব ধর্মের বৈপ্লবিক শক্তিকে ধ্বংস করেছিল।

চৈতন্যোত্তর বাংলা বৈষ্ণব ধর্মের পরিবর্তনের মূলে সহজিয়া মতের প্রাধান্য। সহজিয়ারা আউল, বাউল, সাঁই, কর্তাভজা প্রভৃতি গোষ্ঠীতে বিভক্ত। এদের ধর্ম-জীবনের তিনটি প্রধান বৈশিষ্ট হল গুরুবাদ, নারীপুরুষের অবাধ মেলামেশা এবং পরকীয়া প্রেমের শ্রেষ্ঠত্ব স্বীকার। অষ্টাদশ শতাব্দীর প্রথম ভাগে লেখা কয়েকটি সহজিয়া পুঁথিতে তন্ত্রশাস্ত্র, অথর্বসংহিতা এবং ছান্দোগ্য উপনিষদ থেকে উদ্ধৃতি দিয়ে পরকীয়া প্রেমকে সমর্থন করা হয়েছে। ১৭৩১ খ্রীষ্টাব্দে জয়পুরের মহারাজা বংলার বৈষ্ণবদের পরকীয়া প্রেমের পথ থেকে নিবৃত্ত করার জন্য বাংলাদেশে কয়েকজন পণ্ডিত পাঠিয়েছিলেন। জয়পুরের পণ্ডিত সমাজ স্বকীয়া প্রেমের শ্রেষ্ঠত্বে বিশ্বাসী। বাংলার পণ্ডিতদের সঙ্গে জয়পুরের পণ্ডিতদের স্বকীয়া ও পরকীয়া প্রেমনিয়ে দীর্ঘ ছয়মাস কাল বিতর্ক চলল। অবশেষে গৌড়ীয় পণ্ডিতরা বিজয়ী হলেন। পরকীয়া প্রেম আধ্যাত্মিক উন্নতি ও মুক্তির পথ বলে স্বীকৃতি পেল।[৩]

গৌড়ীয় বৈষ্ণব ধর্মের এই অবনমন সত্ত্বেও বৈষ্ণব ধর্ম ও জীবন এ যুগে বাংলাদেশে এক অতি শক্তিশালী ধর্ম আন্দোলন। এ সময়ে বাংলার অনেক বিখ্যাত ব্যক্তি বৈষ্ণব ধর্মাবলম্বী। বিষ্ণুপুরের মল্লরাজারা বৈষ্ণব ছিলেন। রাজা গোপাল সিংহ (১৭১২—১৭৪৮) এবং তাঁর পুত্র চৈতন্য সিংহ বৈষ্ণব ধর্মের উৎসাহী প্রচারক। গোপাল সিংহ তাঁর রাজ্যে হিন্দু প্রজাদের কৃষ্ণনাম জপ করা বাধ্যতামূলক করেছিলেন। প্রজারা এর নাম দিয়েছিল 'গোপাল সিংহীর

২। ক্ষিতিমোহন সেন, 'ভারতীয় মধ্যযুগে সাধনার ধারা', পৃঃ ১১২-১২০।
৩। রমেশচন্দ্র মজুমদার 'বাংলাদেশের ইতিহাস', দ্বিতীয় খণ্ড, পৃঃ ২৬৪।

বেগার'।[৪] ত্রিপুরার রাজা কৃষ্ণমাণিক্য এবং মহারাজা নন্দকুমার বৈষ্ণব ছিলেন। এসময় থেকেই ত্রিপুরা রাজ্যে বৈষ্ণব ধর্মের দ্রুত অগ্রগতি সম্ভব হয়েছিল। ত্রিপুরার রাজপরিবার এ ধর্মের উৎসাহী সমর্থক। এ ছাড়া বাংলাদেশের বহু জমিদার ও ধনী ব্যক্তি বৈষ্ণব ধর্ম পালন এবং বৈষ্ণব ধর্মের পৃষ্ঠ পোষকতা করতেন।

বাংলার প্রায় দুই তৃতীয়াংশ হিন্দু শাক্ত ও শৈব। বাংলার হিন্দুরা প্রধানত পঞ্চ দেবতার উপাসক। এ পঞ্চ দেবতা হলেন বিষ্ণু, শিব, শক্তি, সূর্য ও গণপতি। সূর্য ও গণপতি দৈনন্দিন ও আনুষ্ঠানিক পূজাৰ্চ্চনায় স্বীকৃত হতেন। এদের উপাসকের সংখ্যা খুব কম। এদের নিয়ে তাই কোনো পৃথক ধর্ম সম্প্রদায় সৃষ্টি হয়নি। বাংলার হিন্দুদের ধর্মীয় জীবনের প্রধান বৈশিষ্ট্য পাঁচটি, মূর্তিপূজা ও আনুসঙ্গিক অনুষ্ঠান বেদ, পুরাণ, স্মৃতি ও ধর্মশাস্ত্রে বিশ্বাস, ব্রাহ্মণ পুরোহিতের মাধ্যমে পূজাৰ্চ্চনা, মৃত্যুর পর অন্তেষ্টি ও শ্রাদ্ধ এবং ঈশ্বর, পরলোক ও পুণর্জন্মে বিশ্বাস। তাছাড়া, স্বর্গ-নরক, কর্মফল, ঈশ্বর ও ব্রাহ্মণে ভক্তি, ভাগ্যের ওপর নির্ভরতা বাংলার হিন্দু ধর্ম জীবনের অন্য দিক। এ সময়ে বাংলার হিন্দুদের ধর্মীয় জীবন, রীতিনীতি, অনুষ্ঠান, পূজাপার্বন, বিবাহ সমস্ত কিছুই স্মৃতিকার রঘুনন্দনের অষ্ট-বিংশতি তত্ত্বের (অষ্টাবিংশতি তত্ত্বানি) দ্বারা নিয়ন্ত্রিত হত। ষোড়শ শতাব্দীর নবদ্বীপের বিখ্যাত স্মৃতিকার (আইনপ্রণেতা) পণ্ডিত রঘুনন্দন বাংলার হিন্দুদের জন্য তাঁর তত্ত্বগুলি লিপিবদ্ধ করে যান। এর মধ্যে উল্লেখযোগ্য তত্ত্বগুলি হল শুদ্ধিতত্ব, উদ্বাহতত্ব, তিথিতত্ব, মলমাসতত্ব, সংস্কার তত্ব, দায়তত্ব, একাদশী তত্ব প্রভৃতি। এ যুগে বংলার হিন্দুদের জীবনে রঘুনন্দনের তত্বগুলি কঠোরভাবে প্রয়োগ করা হত।

বাংলার শাক্তরা প্রকৃতিকে সমস্ত শক্তি ও সৃষ্টির মূল কারণ বলে মনে করে। প্রকৃতি বা শক্তিই সব। এজন্য দেবী পূজা, 'দেবী পুরাণ', 'বৃহদ্ধর্ম পুরাণ', 'দেবীভাগবত' এবং 'মহাভাগবত পুরাণে' দেবী পূজার বিস্তৃত বিবরণ পাওয়া যায়। শাক্তদের দেবীপূজা পদ্ধতি ও আচার অনুষ্ঠানের অনেক কিছুই এ পুরাণগুলি থেকে নেওয়া হয়েছে। শাক্ত হিন্দুদের ওপর তান্ত্রিক মত ও পথের প্রভাব অপরিসীম। তান্ত্রিক মণ্ডল, যন্ত্র এবং মুদ্রা দেবী বা শক্তি পূজায় ব্যবহৃত হয়। তন্ত্রের প্রভাবে পুরাণ ও স্মৃতিকাররা স্ত্রীলোক ও শূদ্রদের দেবীপূজায়

৪। এ. পি. মল্লিক, 'হিস্ট্রি অব বিষ্ণুপুর রাজ', পৃঃ ৫১-৫২।

অধিকার দিয়েছিলেন। 'দেবীপুরাণে' শূদ্রদের দেবীদুর্গা পূজার অধিকার দেওয়া হয়েছে। তান্ত্রিকমতে গুরুবাদ ও স্ত্রীপুরুষের অবাধ মিলন স্বীকৃত। এযুগে তান্ত্রিকদের মধ্যে সীমাহীন যৌনাচারের উল্লেখ দেখা যায়। 'বামমার্গ সাধন পদ্ধতি' বা 'কুলাচার' পূর্ব বাংলা, গৌড় এবং দক্ষিণ রাঢ়ে ব্যাপকভাবে প্রচলিত ছিল।[৫] 'দিক্ষণাচন্দ্রিকাতে' এ সাধনার বিশদ বিবরণ আছে। গ্রন্থখানি এ সময়ের রচনা বলে পণ্ডিতরা মনে করেন। এগ্রন্থে বামাচার পদ্ধতি, কুলাচার এবং এ পথের গুরু ও শিষ্যদের আধ্যাত্মিক চিন্তা এবং পরমজ্ঞান লাভের উল্লেখ আছে।

শক্তির প্রতীক দুর্গা ও কালী এ যুগে পূজিতা হতেন। এ উপলক্ষ্যে ছাগ ও মহিষ বলি দেওয়া হত। হিন্দু জনসাধারণ বিপুল সংখ্যায় এ পূজাগুলিতে অংশ গ্রহণ করত। ভারতচন্দ্র দুর্গা পূজার উল্লেখ করেছেনঃ 'আশ্বিনে এদেশে দুর্গা প্রতিমা প্রচার'।[৬] দুর্গাপূজা বাংলার হিন্দুদের জাতীয় উৎসবে পরিণত হয়েছিল। দুর্গাপূজার সময় নানারকম গান বাজনা ও আমোদ-প্রমোদের ব্যবস্থা হত। ভারতচন্দ্র থেকে আবার উদ্ধৃতি দেওয়া যেতে পারেঃ 'নদে শান্তিপুর থেকে খেঁড়ু আনাইব। নূতন নূতন ঠাটে খেঁড়ু শুনাইব॥'' গঙ্গারাম মারাঠা দলপতি ভাস্কর পণ্ডিতের বাংলাদেশে দুর্গাপূজা অনুষ্ঠানের কথা উল্লেখ করেছেন। বাংলার হিন্দু জমিদাররা এ সময় দুর্গা ও কালীপূজা শুরু করেন। এ যুগেই রাজা কৃষ্ণচন্দ্র কালীপূজার অনুষ্ঠান করেছিলেন। রামপ্রসাদের কালীকীর্তন ও শাক্ত পদাবলীতে কালীপূজা পদ্ধতির উল্লেখ আছে। এতে কালীপ্রতিমা, পূজাপদ্ধতি, উপকরণ সম্পর্কে বিস্তৃত তথ্য পাওয়া যায়। ইংরাজ কোম্পানীর এ যুগের কাগজ পত্রে দুর্গাপূজার উল্লেখ আছে।

এ যুগে বংলার হিন্দুদের এক বিরাট অংশ শিবের উপাসক। বাংলার নীচু তলার হিন্দুরা বেশিরভাগই শিবের ভক্ত। পশ্চিম অপেক্ষা পূর্ব বাংলায় শিব আরো বেশি জনপ্রিয়। দুর্দিনে এসব মানুষ শিবের শরণাপন্ন হতেন। বাংলার লৌকিক দেবতার সঙ্গে এশিব একাত্ম। এ শিব আর্য্য বা ব্রাহ্মণ্য ধর্মের শিব নন। ভূত প্রেত এর সঙ্গী ; থাকেন শ্মশানে ছাই ভস্ম মেখে। এ যুগে মহাধুমধামের সঙ্গে শিবের পূজা হত। ফাল্গুন মাসে শিবরাত্রির দিনে বা চৈত্র মাসে গাজন ও শিব পূজার সময় মহা আড়ম্বর হত। পূর্ব বংলায় হিন্দুদের শিব পূজা, গাজন,

৫। তপন রায়চৌধুরী 'বেঙ্গল আন্ডার আকবর এন্ড জাহাংগীর', পৃঃ ১৩২।

৬। ভারতচন্দ্র, 'অন্নদামঙ্গল, 'বিদ্যাসুন্দর', পৃঃ ১১৩।

চড়ক জাতীয় উৎসবে পরিণত হয়েছিল।[৭] পূর্ব বাংলার হিন্দুদের ধর্ম বিশ্বাসের আর একটি দিক হল গৃহদেবতার পূজা। সম্ভবত আদিবাসীদের গৃহদেবতাপূজা থেকে পূর্ব বাংলার হিন্দুরা এ প্রথা গ্রহণ করেছিল।[৮] গৃহদেবতার সঙ্গে পূর্ব-বাংলায় গ্রাম দেবতাও পূজা পেতেন।

বাংলার হিন্দুদের একটা বড় অংশ আদিবাসী ও সাঁওতাল। আদিবাসীদের মধ্যে বাগদী, বাউরি, হাড়ি, ডোম প্রভৃতি বর্ণের লোকেরা যে ধর্মীয় জীবন যাপন করত তার সঙ্গে উচ্চবর্ণের হিন্দুদের ধর্ম জীবনের মিল নেই। সাধারণভাবে এদের গোঁড়া হিন্দু (সনাতন) ধর্মজীবনের মধ্যে গণ্য করা হয় না। বাগদী, বাউরি, হাড়ি, ডোমরা প্রধানত শিব, বিষ্ণু ও ধর্মরাজের পূজা করে। দেবী দুর্গাও এদের পূজা পেতেন। সাঁওতালদের অনেক দেবতা এদের পূজ্য। উল্লেখযোগ্য হল গোঁসাইরা ও বড় পাহাড়ি। এদের প্রিয় দেবী মনসা, ভাদু, মানসিংহ, বড় পাহাড়ি, ধর্মরাজ ও কুদ্রসিনী এদের পূজা পেতেন। সাঁওতালদের ধর্ম জীবনের প্রধান দিক হল গৃহ ও গ্রাম দেবতার পূজা। গ্রামদেবতার বাসস্থান গাছ, গৃহদেবতার গৃহকোণ। সাঁওতালরা পূর্বপুরুষদের আত্মার পূজায় বিশ্বাসী। ভূত প্রেত ও শয়তানে বিশ্বাস এদের ধর্মজীবনের অপর দিক। দেবতার পূজাপলক্ষ্যে মুরগী, ছাগল এমনকি গরুও বলি দেওয়ার রেওয়াজ ছিল। পূজার পর নাচ্‌গান, বলিপ্রদত্ত পশুর মাংস খাওয়া এবং মদ্যপান চলত। এদের ওঝা 'জান' ভূতপ্রেত তাড়িয়ে রোগমুক্তি ঘটিয়ে সমাজে প্রাধান্য পেতেন। বাংলার পশ্চিমাঞ্চলে আদিবাসী সাঁওতাল, হাড়ি ডোম, বাউরি, বাগদী শ্রেণীর লোক অধিক সংখ্যায় বাস করত। পূর্ব ও উত্তরাঞ্চলে এদের সংখ্যা কম।

সামগ্রিকভাবে এযুগের বাংলার হিন্দুদের ধর্মজীবন বিশ্লেষণ করলে কয়েকটি সাধারণ বৈশিষ্ট্য সহজে চোখে ধরা পড়ে। এক, আচার অনুষ্ঠানের প্রাধান্য। নানারকম রীতি নীতি, নিয়ম, সংস্কার দেশাচার, লোকাচার বাংলার ধর্মীয় জীবনকে আষ্টে পৃষ্ঠে বেঁধেছিল। দুই, গুরুবাদের প্রাধান্য। গুরুর প্রতি আনুগত্য, বিশ্বস্ততা, বিনাদ্বিধায় গুরুর আদেশ মান্য করার মানসিক প্রবণতা গড়ে উঠেছিল। তিন, ইন্দ্রিয় পরায়ণতা. নারী পুরুষের অবাধ মেলামেশা, আত্মিক উন্নতি এবং ঈশ্বর প্রাপ্তির অন্যতম প্রকৃষ্ট পথ বলে মনে করা হত। চার, ভক্তি, প্রেম ও ত্যাগ, সরল, অনাড়ম্বর পবিত্র ধর্মীয় জীবন আধ্যাত্মিক উন্নতি ও মুক্তির পথ বলে

৭। হান্টার, 'এ্যানালস্...', প্রথম খন্ড, পৃঃ ৯৯-১৩৩।
৮। ঐ, পৃঃ ২৯।

মনে করা হত না। যারা এযুগে এপথ ধরেছিলেন তাদের সংখ্যা নগণ্য। এরা নিঃসন্দেহে সংখ্যালঘু। পাঁচ, পীর, সাধু ও সন্ন্যাসীর ওপর বিশ্বাস। রোগ নিরাময়, কামনা বাসনা পূরণ বা দুর্দৈব থেকে মুক্তির জন্য এযুগের মানুষ পীরের দরগায় বা সাধু মোহান্তের শরণাপন্ন হতেন। সত্যপীর, মাণিকপীর, পীর বদর ঘোড়াপীর, কুম্ভীর পীর এবং মাদারি পীর (মাছ ও কচ্ছপের পীর) হিন্দুদের পূজা ও মানত পেত। ছয়, হিন্দু ধর্মজীবনের অপর উল্লেখযোগ্য দিক হল তীর্থস্থান ভ্রমণ। বাংলা বিহার ও উড়িষ্যার প্রধান প্রধান হিন্দু তীর্থস্থানগুলি (পুরীর জগন্নাথ মন্দির, দেওঘরের শিবমন্দির ইত্যাদি), কাশী, মথুরা, বৃন্দাবন এবং বাংলার শাক্ত পীঠগুলি তীর্থ যাত্রীদের আকর্ষণ করত।

বলাবাহুল্য এ যুগে বাংলার অপর প্রধান ধর্ম হল ইসলাম। মুসলমানদের ধর্মীয় জীবন কোরাণ ও হাদিস দ্বারা নিয়ন্ত্রিত। মুসলিম ধর্মজীবনের পাঁচটি প্রধান দিক হল ইমান, নামাজ, রোজা, হজ ও যাকাত। ইমানের অর্থ হল এক অদ্বিতীয়, সর্বশক্তিমান আল্লাহতালার ওপর বিশ্বাস, পয়গম্বর হজরত মোহাম্মদকে তাঁর শেষ প্রতিনিধি মনে করা এবং কোরাণকে আল্লাহতালার প্রেরিত বাণী বলে মেনে নেওয়া। এযুগে বাংলার সমস্ত শ্রেণীর মুসলমানের মধ্যে এ তিনটি বিশ্বাস ছিল বলে জানা যায়। ইসলাম ধর্মের দ্বিতীয় বৈশিষ্ট্য হল নামাজ। দৈনিক প'াচবার আল্লাহতালার কাছে প্রার্থনা করা ইসলাম ধর্মের অঙ্গ। সমসাময়িক ব্যক্তিদের বিবরণে জানা যায় এযুগে বাংলাদেশে মুসলমানদের প্রার্থনার জন্য বহু মসজিদ ছিল। মুর্শিদকুলী, সুজাউদ্দিন ও আলিবর্দ্দী সকলেই নতুন মস্‌জিদ বানিয়েছিলেন। এক মুর্শিদাবাদ শহরে সাতশ মসজিদের হিসাব আছে।[১] প্রতিদিন পাঁচবার মস্‌জিদের মিনার থেকে সাত'শ মুয়াজ্জিন বিশ্বাসীদের প্রার্থনায় যোগ দেওয়ার জন্য আহ্বান জানাত। সাত'শ কণ্ঠের সেই গম্ভীর আজানধ্বনি শহরের সর্বত্র প্রতিধ্বনিত হত। রোজা রাখা বা উপবাস করা ইসলাম ধর্মের আর একটি প্রধান বৈশিষ্ট্য। রমজান মাসে এবং মহরমের সময় ধর্মপ্রাণ মুসলমানরা রোজা রাখতেন বা উপবাস করতেন। সমকালীন ব্যক্তিদের বিবরণীতে এর উল্লেখ আছে। তবে সকল মুসলমান রোজা রাখতেন একথা বলা যায় না। কৃষক ও শ্রমিকদের পক্ষে রোজা রাখা কষ্টকর। রোজার শেষে অর্থাৎ রমজান মাসের শেষে ঈদল ফিতর বা ঈদ উৎসব। এসময় গরীব দুঃখীদের

১। পি. সি. মজুমদার, 'মস্‌নদ অব মুর্শিদাবাদ', পৃঃ ৮।

আহার দেওয়া, দানকরা বা শুভেচ্ছা বিনিময় মুসলমানদের ধর্মজীবনের অঙ্গ। মক্কা ও মদিনার তীর্থস্থানগুলি পরিদর্শন করা ইসলাম ধর্মাবলম্বীর পালনীয় কর্তব্য। বাংলার মুসলমানদের মধ্যে কেবল ধনী, ওমরাহ ও অভিজাতরা এ সুযোগ পেতেন। এযুগে রাস্তা ঘাট ভাল ছিল না। জলপথে জলদস্যুদের উৎপাত; প্রায়ই হজ যাত্রীদের ওপর আক্রমণ হত। ইউরোপীয়দের একাংশ এদেশীয় রাজশক্তির ওপর প্রতিহিংসাপরায়ণ হয়ে বা প্রতিশোধ গ্রহণ মানসে সমধর্মীদের ওপর হামলা করত। শতাব্দীর শুরুতে (১৭০২) হজযাত্রীদের ওপর আক্রমণে ও লুণ্ঠনে বিরক্ত হয়ে ধর্মপ্রাণ আরঙ্গজেব ভারতবর্ষে ইউরোপীয়দের ব্যবসা বন্ধ করার নির্দেশ জারী করেছিলেন। অবশ্য কিছুকাল পরেই তিনি এ আদেশ প্রত্যাহার করেন। এযুগে বাংলার মুসলমানদের পক্ষে সুদূর মক্কা ও মদিনায় হজ বা তীর্থ করা সহজ হত না। শুধু ধনী ও দুঃসাহসীরাই এ সুযোগ পেত। ইসলামের অন্য বৈশিষ্ট্য হল যাকাত অর্থাৎ আয়ের এক দশমাংশ গরীব দুঃখীদের দান করা। ধনী মুসলমানদের কেউ কেউ অবশ্যই এ ধর্মীয় নির্দেশ পালন করতেন। যাকাত নিয়ে শিয়া ও সুন্নীদের মধ্যে বিতর্কের কথা গোলাম হোসেন উল্লেখ করেছেন। মানার ব্যাপার না থাকলে এ নিয়ে বিতর্ক দেখা দিত না। তবে সকলেই এ ধর্মীয় বিধান মানতেন একথাও বলা যায় না।

এযুগে বাংলার মুসলমান সম্প্রদায় প্রধানত দুভাগে বিভক্ত। শিয়া ও সুন্নী। 'সিয়ার মুতাক্ষরীণের' ইংরাজী অনুবাদক ম'শিয়ে রেমণ্ড (ইনি ইসলামধর্ম গ্রহণ করে নাম নিয়েছিলেন হাজি মুস্তাফা) জানিয়েছেন এ যুগে বাংলাদেশে শিয়াদের প্রাধান্য।[১০] মুর্শিদকুলী ছাড়া বাংলার নবাবরা সকলেই শিয়াদের পৃষ্ঠপোষক। রেমণ্ড আরো জানিয়েছেন এসময়ে নবাবরা ছাড়াও বাংলার প্রভাবশালী ও ধনী মুসলমানরা অনেকেই শিয়া মতাবলম্বী। হুগলী তখন কার্যত শিয়া উপনিবেশ। ধনী শিয়াদের অনেকে মহরম উৎসব পালনের জন্য বাড়িতে ইমামবাড়া বানিয়েছিলেন। শিয়া ও সুন্নীদের মধ্যে কতকগুলি ব্যাপারে পার্থক্য স্পষ্ট। শিয়ারা পয়গম্বর হজরত মোহাম্মদের জামাতা হজরত আলিকে ধর্ম জীবনে প্রাধান্য দিতেন। নামাজ, রোজা ও হজ্জ পালনেও উভয় মতাবলম্বীদের মধ্যে পার্থক্য লক্ষ্য করা যায়। সমকালীন ব্যক্তিদের বিবরণে জানা যায় শিয়াদের অনেকে এ সময় পবিত্র কারবালার একখণ্ড মাটি সামনে রেখে নামাজ পড়তেন। সুন্নীরা রবিউল আওয়াল

১০। 'সিয়ার', দ্বিতীয় খণ্ড, পৃঃ ১৮০। পাদ টীকা। সুন্নীরা সংখ্যাগুরু, তবে প্রভাব শিয়াদের বেশি।

মাসে পয়গম্বর হজরত মোহাম্মদের পবিত্র জন্ম ও মৃত্যুদিন উৎসাহ ও আড়ম্বরের সঙ্গে পালন করত। শিয়ারা মহরমকে সবচেয়ে বড় উৎসব বলে মনে করত। এ সময় উপবাস করে শোক পালন, কারবালা যুদ্ধস্মরণ করে যুদ্ধের অভিনয়, তাজিয়া দিয়ে শোভাযাত্রা, ইমামবাড়ায় আলোকসজ্জা, বাজি পোড়ানো প্রভৃতি শিয়াদের ধর্মজীবনের অঙ্গ। রেমণ্ডের পাদটীকা থেকে জানা যায় মহরম রাজধানী মুর্শিদাবাদের সবচেয়ে বড় উৎসব। আলো ও কাঁচ দিয়ে মুর্শিদাবাদ ইমামবাড়া এমন সুন্দর করে সাজানো হত এবং সারা রাজধানী শহরে এমন উৎসবের ঢেউ উঠত যে মহরম উৎসবের দশদিন মহিলাদেরও ঘরে ধরে রাখা যেত না।[১১] শিয়া সুন্নী উভয়েই উৎসাহের সঙ্গে বকর ঈদ পালন করত। শিয়া ও সুন্নীদের মধ্যে পার্থক্য যাই হোক না কেন সমকালীন ব্যক্তিদের বিবরণে এদের মধ্যে সংঘর্ষ বা অসম্প্রীতির কোনো উল্লেখ নেই।[১২]

এ যুগে মুসলমানদের ধর্ম জীবনের আর একটি উল্লেখযোগ্য দিক হল যাজক শ্রেণীর প্রাধান্য। হিন্দুদের মত মুসলমানদের ধর্মজীবন, প্রাত্যহিক ও সামাজিক কাজকর্ম মৌলভি ও মোল্লাদের দ্বারা পারিচালিত হত। হিন্দুদের মত এ যুগের মুসলমানরা পঞ্চ পীরের কাছে মানত করত। পীরের দরগায় শিরনি দেওয়ার প্রথা বাংলার উচ্চ নীচ সকল শ্রেণীর মুসলমানের মধ্যে প্রচলিত ছিল। মুর্শিদাবাদের আশে পাশে এবং সারা বাংলাদেশে অসংখ্য পীরের দরগার উল্লেখ দেখা যায়। সুতীতে মূর্তজা ফকির, চুণাখালিতে মসনদে আউলিয়া এবং মুর্শিদাবাদে ফকির শাহ ফারুদের দরগাতে মুসলমানদের মানত এবং প্রার্থনার বিবরণ পাওয়া যায়। ১৭৪০ খ্রীষ্টাব্দে গিরিয়া যুদ্ধের প্রাক্কালে সরফরাজ খাঁর প্রধান সেনাপতি গওস খাঁ সুতীতে (গিরিয়ার কাছে) মুর্তজা ফকিরের দরগায় জয়লাভ প্রার্থনা করে শিরনি দিয়েছিলেন। একটি স্থানীয় ছড়া এর সাক্ষ্য দিচ্ছে ঃ

'জলদি করে হুকুম দেবে নবাব জলদি করে,
ঘোড়া চড়ে যাব আমি সুতীর দরগাতে।
সওয়া সের আটার মোয়া পাওয়া ভর ঘী,
একা লবে গোয়াস খাঁ সকলের জী॥'[১৩]

১১। 'সিয়ার', দ্বিতীয় খন্ড, পৃঃ ২৭৩, ৪৪৩ পাদটীকা।

১২। গোলাম হোসেন সম্রাট ফারুখশিয়ারের রাজত্বকালে আহমেদাবাদে শিয়া ও সুন্নীদের মধ্যে সংঘর্ষের কথা উল্লেখ করেছেন। বাংলাদেশের ক্ষেত্রে তিনি নীরব।

১৩। সুপ্রসন্ন বন্দ্যোপাধ্যায়, 'ইতিহাসাশ্রিত বাংলা কবিতা', পৃঃ ৬৭। ওয়ালশ, 'এ হিস্টি অব মুর্শিদাবাদ', পৃঃ ৬৩-৬৯।

শুধু মৃত পীররা নন, জীবিত পীর, দরবেশ ও সুফীরা মুসলমান সমাজে শ্রদ্ধা পেতেন। তাঁদের কাছে দলে দলে লোকজন যেত এবং আশীর্বাদ বা দোওয়া চাইত।

হিন্দু ও ইসলাম ধর্মাবলম্বীবা দীর্ঘকাল একই দেশে পাশাপাশি বাস করার ফলে নিঃসন্দেহে একে অন্যের ধর্মজীবনের ওপর প্রভাব বিস্তার করেছিল। সম্রাট আরঙ্গজেবের পৌত্র বাংলার গভর্ণর আজিমুশশান (১৬৯৭-১৭১২) বাংলাদেশে থাকাকালীন গেরুয়া পরা এবং দোল বা হোলি উৎসবে অংশ গ্রহণ করা শুরু করেছিলেন। আলিবর্দ্দীর জামাতা নওয়াজেস মুহম্মদ, সৈয়দ আহমদ এবং দৌহিত্র সিরাজ হোলি উৎসবে যোগ দিতেন। করম আলির 'মুজাফ্ফর নামায়' রাজধানীর দোল উৎসবের বর্ণনা আছে। রাজধানীতে সাতদিন ধরে এ উৎসব পালিত হত। প্রতিদিন ভোরে পাঁচ'শ পরীরমত সুন্দরী রমনী নাচের মধ্য দিয়ে উৎসব শুরু করত। প্রমোদ কাননের ঝরণাগুলি দিয়ে রঙীন জল ঝরত। আর আবীর নিয়ে খেলা হত।[১৪] হিন্দুরা রাজধানীর মহরম উৎসবে যোগ দিত, বাংলার হিন্দু জমিদাররা অনেকে মহরম উৎসবের পৃষ্ঠপোষকতা করতেন। বিষ্ণুপুরের মল্লরাজারা মহরমের সবচেয়ে ভাল তাজিয়াকে পুরষ্কৃত করতেন। মুর্শিদাবাদে প্রতি বছর ভাদ্র মাসের শেষ বৃহস্পতিবারে বেরা উৎসব হত। খাজা খিজিরের নামে এ উৎসব। খাজা খিজির মূলে ছিলেন নাবিকদের পীর। পরে তিনি রাজধানী মুর্শিদাবাদের পীর হয়ে যান। আপদে, বিপদে, রোগে শোকে রাজধানীর হিন্দু মুসলমান উভয়েই এ পীরের নামে মানত করত। রাজধানীর মানুষ সুখে ও সমৃদ্ধিতেও এ'কে ভুলত না। সকলে ঐ দিনে কাগজের নৌকা, প্রদীপ ও মিষ্টি ভেলা করে গঙ্গায় ভাসাত। এ উপলক্ষ্যে প্রচুর আলোকসজ্জা ও বাজী পোড়ানো হত।[১৫] হিন্দুরা এ যুগে মুস্‌লিম পীরদের পূজো ও শিরনি দিত। এদের কাছে মানত করত। মুসলমান ধর্মজীবনে হিন্দু ধর্মের প্রভাব আরো নানাভাবে দেখা গিয়েছিল। মুসলমানরা হিন্দুদের মত যাজক শ্রেণীকে গ্রহণ করল ধর্মীয় কাজকর্মের জন্য। হিন্দুদের মত পীর, দরবেশ ও সুফীদের ভক্তি ও আরাধনা শুরু করল। পীরের দরগায় মানত করা বা শিরনি দেওয়া হিন্দু ধর্ম-জীবনের প্রত্যক্ষ প্রভাব বলে ধরে নেওয়া যায়। তদুপরি সামাজিক কাজকর্ম,

১৪। করম আলি, 'মুজাফ্ফর নামা', বেঙ্গল নবাবস্, পৃঃ ৪৯-৫০।

১৫। ওয়ালশ, ঐ, পৃঃ ৬৩-৬৯।

বিবাহ ইত্যাদিতে হিন্দুদের আচার আচরণ কিছু কিছু এসে গেল। গোঁড়া ও রক্ষণশীল মুসলমানরা ছাড়া মুসলমানদের একাংশ হিন্দুদের দেখাদেখি গান বাজনায় অংশ নিত। অভিজাত মহলে নাচেরও কদর হয়েছিল। বাংলার হিন্দু মুসলমানের এ সংস্কৃতি সমন্বয় এ যুগের সামাজিক ইতিহাসের সবচেয়ে উল্লেখযোগ্য ঘটনা। 'আমীর হামজা' ও 'ইউসুফ জোলেখার' কবি গরীবুল্লাহ আল্লার কাছে মিলিত হিন্দু মুসলমানের জন্য দোওয়া চাইছেনঃ 'আসরে বসিয়া যত হিন্দু মুসলমান সবাকার তরে আল্লা হও নেঘাবান।'[১৬] বৈষ্ণবদাসের 'পদকল্পতরুতে' এগারো জন মুসলিম কবির রচিত পদ আছে। বাংলার অজস্র পল্লী গীতিতে, গাথা ও ছড়ায় এ মানসিকতার অসংখ্য প্রমাণ ছড়িয়ে আছে। এ যুগে বাংলার নবাবরা পরমতসহিষ্ণুতা দেখিয়েছেন। আর্থিক স্বাচ্ছন্দ্য থাকায় সংঘাত ছিল না। রাষ্ট্র নিরপেক্ষ থাকায় ধর্মদ্বন্দ্বের উল্লেখ এ যুগে দেখা যায় না।

এ যুগে বাঙালীর নৈতিক মান ইতিহাসবিদের জিজ্ঞাসার বিষয়। 'সিয়ারের' ইংরাজী অনুবাদক হাজী মুস্তাফা জানিয়েছেন যে এযুগে সারা ভারতবর্ষে কাশ্মীরী এবং বাঙালীদের খুব দুর্নাম। এদের মধ্যে বিশ্বাসহীনতা, দুষ্কার্য এবং ঔদ্ধত্য খুব বেশি। তিনি আরো লিখেছেন যে হিন্দুস্তানে এদের নিয়ে প্রচলিত প্রবাদ হল 'কাশ্মীরী বি-পীরি, বেঙ্গলী জেঞ্জালি'। অর্থাৎ কাশ্মীরীরা ঈশ্বরে আস্থাহীন নিরীশ্বরবাদী, আর বাঙালীরা হল এমন এক ঝঞ্ঝাটে জাত যে তাদের হাতে একবার পড়লে আর নস্কা নেই।[১৭] গোলাম হোসেন অন্য এক প্রসঙ্গে মন্তব্য করেছেন যে এদেশে মানুষের মধ্যে দুরকমের ব্যবহার। মুখে এক মনে আর এক। এরূপ নৈতিক মানসিকতা উচ্চ শ্রেণীর মানুষের মধ্যে খুব বেশি দেখা যায়।[১৮] সমস্ত সমসাময়িক ইতিহাসবিদ ও পর্যটক বাঙালী হিন্দুদের[১৯] ধূর্ততার কথা উল্লেখ করেছেন। কেউ কেউ তাদের তীক্ষ্ণ বুদ্ধি এবং হিসাবশাস্ত্রে জ্ঞানের কথা বলেছেন। অনেকে এ জাতির মধ্যে বিশ্বস্ততা এবং কৃতজ্ঞতা বোধের অভাব লক্ষ্য করেছেন। ১৭৫৯ খ্রীষ্টাব্দের ৭ই জানুয়ারী উইলিয়াম পিটের কাছে লিখিত এক

১৬। গরীবুল্লাহ হুগলী ও হাওড়া জেলার সীমান্তে বালিয়া হাফেজপুরের লোক। মধ্য অষ্টাদশ শতাব্দীতে তাঁর কাব্যগুলি লেখেন। সুকুমার সেন 'বাংলা সাহিত্যের ইতিহাস', প্রথম খণ্ড, অপরার্ধ, পৃঃ ৫৫০-৫৫২। চট্টগ্রামের হামিদুল্লাহর 'বেহুলাসুন্দরী' ও আপতাবুদ্দিনের জামিল দিলারাম (১৭৫০) কাব্যে এ মানসিকতার প্রমাণ আছে।

১৭। 'সিয়ার', দ্বিতীয় খণ্ড, পৃঃ ১৮০, পাদটীকা।

১৮। ঐ ঐ পৃঃ ৫২০।

১৯। বিদেশীদের কাছে বাঙালী হিন্দুরা জেন্টু নামে পরিচিত ছিল।

চিঠিতে ক্লাইভ মুসলমানদের কৃতজ্ঞতাবোধের অভাবের কথা উল্লেখ করেছিলেন। ঐ চিঠিতে তিনি লিখেছিলেন নবাব মীরজাফর নিজের সুবিধামত আমাদের সঙ্গে সম্পর্ক ছিন্ন করবেন। তবে বাঙালীর চরিত্র ও নৈতিকতা সম্পর্কে বিদেশীদের লেখায় ভাল কথাও আছে। মেজর জেমস্ রেনেল তাঁর ডায়েরিতে' লিখেছেন : 'ইউরোপীয়দের তুলনায় বাঙালীরা অনেক মহৎ দার্শনিকতা নিয়ে কষ্ট ও দুর্ভাগ্য বরণ করে।'[২০] ক্লাইভ অপর একটি চিঠিতে হিন্দু মুসলমান উভয় শ্রেণীর বাঙালীকে 'অলস, বিলাসী, অজ্ঞ এবং কাপুরুষ' বলে উল্লেখ করেছেন।[২১] জাফানিয়া হলওয়েল বলেছেন হিন্দুরা হীন ধূর্ত, কুসংস্কারাচ্ছন্ন এবং শয়তান। ক্লাইভের মতে মুসলমানরা স্বভাবে হীন, নীচ এবং নীচ ধারণার অধিকারী। তারা এদেশে এমন এক রাজনৈতিক সংগঠন গড়ে তুলেছে যেখানে উদ্দেশ্যসাধনে শক্তির চেয়ে বিশ্বাসঘাতকতায় তাদের আস্থা বেশি।

নবাবের দরবার সম্পর্কে ম'শিয়ে ল তাঁর স্মৃতি কথায় লিখেছেন : 'এখানে সত্য ও ন্যায়নীতির কোনো স্থান নেই। অসত্যের পাল্লায় কিছু না দিয়ে এখানে কেউ সাফল্য লাভ করে না।'[২২] ভারতীয় মনের দুটি প্রধান প্রবৃত্তি হল ভয় এবং লোভ। ল আরো লিখেছেন মুসনমান অভিজাতরা ইউরোপীয়দের সঙ্গে কোনো যোগাযোগ রাখে না। তাদের মানসিক গণ্ডী খুব সংকীর্ণ। বাংলার হিন্দু বণিক ও ব্যাঙ্কাররা ইউরোপীয়দের সম্পর্কে অনেক খোঁজখবর রাখত। বাংলার বাইরে কোথায় কি ঘটছে এরা তার খবর আনত। এযুগের বাঙালী অতিমাত্রায় ভাগ্যের ওপর নির্ভরশীল। হিন্দু মুসলমান উভয় সম্প্রদায়ের লোক জ্যোতিষে বিশ্বাস করত। কোনো গুরুত্বপূর্ণ সিদ্ধান্ত নেওয়ার আগে বা কোথাও যেতে হলে এরা শুভক্ষণ ও শুভদিন জানার চেষ্টা করত। জ্যোতিষীদের কাছে ভাগ্য ও ভবিষ্যত জানার চেষ্টা দেখা যায়। অভিজাতদের মধ্যে এ মানসিকতা আরো বেশিমাত্রায় বর্তমান ছিল বলে প্রমাণ আছে। সরফরাজ, আলিবর্দী ও মীরকাশিম জ্যোতিষে বিশ্বাসী ছিলেন। মীরকাশিম জ্যোতিষশাস্ত্র চর্চা করতেন। এরকম মানসিকতা নিঃসন্দেহে মানুষের উপলব্ধি, চিন্তা ও ভাবনাকে প্রভাবিত করে।

ল্যূক স্ক্র্যাফটন লিখেছেন 'আনুগত্য ও দেশপ্রেম বাঙালীর অজানা। অথচ এ দুটি গুণই মানুষের যা কিছু মহৎ এবং শ্রেষ্ঠ সৃষ্টির পেছনে অনুপ্রেরণা হিসাবে

২০। জে. রেনেল, 'ডায়েরি', ২০শে জানুয়ারী, ১৭৬৮।
২১। ক্লাইভ, ৩০শে ডিসেম্বর, ১৭৫৮, ফরেস্ট, 'লাইফ অব ক্লাইভ', দ্বিতীয় খণ্ড, পৃঃ ১২০।
২২। ম'শিয়ে ল, 'মেমোয়ার', পৃঃ ৮৬ ; হিল, ঐ, পৃঃ ৮৭।

কাজ করে। বাঙালীরা অনুগত থাকে ততক্ষণ যতক্ষণ তাদের মনে ভয় থাকে ; ভয়ের সঙ্গে আনুগত্যও উবে যায়। টাকা এখানে শক্তির উৎস, কারণ সৈন্যরা টাকা ছাড়া আর কোনো বন্ধন স্বীকার করে না। সুতরাং যার যত টাকা সে তত শক্তিশালী।'[২৩] নবাবের দরবারে উচ্চ কর্মচারী ও সামরিক বাহিনীর অফিসারদের মধ্যে আনুগত্য ও কৃতজ্ঞতা সমার্থক। অর্থাৎ টাকা পেলে তারা কৃতজ্ঞ এবং অনুগত। টাকা ছাড়া অন্য কোনো বন্ধন বা অনুভূতি নেই। গোলাম হোসেনের মতে বাংলার জমিদাররা খুবই প্রভাবশালী ও ধনী। এরা সর্বদাই অস্থির, চঞ্চল ও বিদ্রোহপ্রবণ। এযুগে রাষ্ট্রবিপ্লব সাধারণ মানুষকে একেবারেই স্পর্শ করত না। তারা এব্যাপারে সম্পূর্ণ উদাসীন। কে ক্ষমতা পেলেন, কে ক্ষমতাচ্যুত হলেন এসব নিয়ে বাংলার কৃষক, শ্রমিক, ব্যবসায়ী, কারিগর, তাঁতি জোলা মাথা ঘামাত না। গোলাম হোসেন লিখেছেন 'এরা নেহাতই ভীতু, নিরীহ, কাপুরুষ ও গোবেচারা ; ভয়ে আনতভাবে জীবন কাটায়। যে টাকা দেয় তারই কাছে আত্মসমর্পন করে।'[২৪] বাঙালীর প্রধান আনুগত্য তাঁর গৃহ ও চাষ জমির প্রতি। এগুলি তারা প্রাণ দিয়ে আঁকড়ে ধরে থাকে। বহু কষ্ট স্বীকার করেও এগুলি রক্ষা করার চেষ্টা করে। নিতান্ত বাধ্য হয়ে কেবল এগুলি ত্যাগ করে।

বাঙালীর মধ্যে জাতীয়তার বন্ধন নেই। এমণ কোনো সাধারণ আদর্শ নেই যার ভিত্তিতে তারা ঐক্যবদ্ধ হতে পারে। ওয়ারেন হেস্টিংস্ তাঁর স্মৃতি কথায় লিখেছেন 'সারা উত্তর ও দক্ষিণভারতে একমাত্র মারাঠাদের মধ্যে ঐক্যের বন্ধন আছে। অন্য কোনো জাতির নেই।'[২৫] এযুগে বাংলাদেশে ইউরোপীয়দেরও নৈতিক মান তেমন উঁচু ছিল না। এরা একে অপরকে প্রতারণা করত। বিশেষ করে রাজনীতিতে নৈতিকতার ধার কেউ ধারত না। এযুগের রাজনীতিতে অন্যায় এবং অবিশ্বস্ততার নজির যেমন আলিবর্দ্দী ও আলমচাঁদ তেমনি বিশ্বস্ততা ও ন্যায় নীতির উদাহরণ হলেন এ্যাডমিরাল ওয়াটসন এবং সীতার রায়। এই আলিবর্দ্দী আবার পরাজিত শত্রুপক্ষের সঙ্গে যে ব্যবহার করেছেন তা ন্যায় নীতি ও নৈতিকতার উচ্চ আদর্শ হতে পারে। ১৭৪৮ খ্রীষ্টাব্দে বিহারে আফগান বিদ্রোহ দমনের পর তিনি বিদ্রোহী আফগান দলপতি সমরেশ খাঁ ও সরদার খাঁর পরিবারের সসম্মানে বাঁচার ব্যবস্থা করেছিলেন। ১৭৪০ সনে গিরিয়া যুদ্ধের পরও তিনি পরাজিত

২৩। ল্যুক স্ক্র্যাফটন, 'রিফ্লেকশনস্', পৃঃ ৩০।
২৪। 'সিয়ার', দ্বিতীয় খণ্ড, পৃঃ ৭।
২৫। ওয়ারেন হেস্টিংস, 'মেমোয়ার্স' (১৭৮৬), পৃঃ ৮৯।

ও নিহত নবাব সরফরাজ খাঁর পরিবার বর্গের সঙ্গে ভাল ব্যবহার করেছিলেন। যুদ্ধ ক্ষেত্রে পরাজিত শত্রুর সঙ্গে ইংরাজরা ভাল ব্যবহার করত। তাদের বিরোচিত ব্যবহার ও মানবিক আচার গোলাম হোসেনকে মুগ্ধ করেছিল।[২৬]

কাশিমবাজারে ফরাসি কুঠীর অধ্যক্ষ মঁশিয়ে ল এদেশীয় সিপাই সম্পর্কে বিরূপ মন্তব্য করেছেন। তাঁর মতে এদেশীয় সিপাই লালজামা ও বন্দুক হাতে পেলে নিজেকে অন্য মানুষ মনে করে। সে নিজেকে ইউরোপীয় সৈনিকের সমকক্ষ-ভাবে, নিজের দেশবাসীকে ঘৃণা করতে শুরু করে। এদের কাফের বা হতভাগ্য নিগ্রোজ্ঞানে দুর্ব্যবহার করে, যদিও সে নিজেও এদের মত কালা আদমি। এদেশের মানুষ ইউরোপীয় সৈনিকের কাছে যে ব্যবহার পায় তা এদেশীয় সিপাইদের ব্যবহার থেকে অনেক ভাল। এমনকি বিশৃঙ্খল অবস্থায়ও ইউরোপীয় সৈন্য অনেক সময় দয়া ও মহত্ব দেখায় যা এদেশীয় সিপাইদের কছে কখনো আশা করা যায় না।[২৭]

সমকালীন ব্যক্তিদের বিবরণী থেকে এযুগের বাঙালীর নৈতিকমান সম্পর্কে একটা ধারণা করা কঠিন নয়। আধুনিক মাপকাঠিতে এমান তেমন উঁচু স্তরের নয়। সমসাময়িক ইউরোপীয়দের সঙ্গে তুলনায় বাঙালীর নৈতিক মান কিছুটা নীচু বলেই ধরতে হবে। এযুগে বাঙালীর নৈতিক অবক্ষয় অস্বীকার করার উপায় নেই। অকৃতজ্ঞতা, বিশ্বাসঘাতকতা, অসত্যভাষণ এবং উৎকোচ গ্রহণ প্রভৃতি বাঙালীর চরিত্রগত বৈশিষ্ট্য হয়ে দাঁড়িয়েছিল। 'ক্রয় বিক্রয় এবং কোনো চুক্তির ক্ষেত্রে, বিশেষ করে সমস্ত জাগতিক ব্যাপারে, বাঙালীর মত জাত সারা পৃথিবীতে মেলা ভার। এ সমস্ত বিষয়ে বাঙালীর দুষ্কার্য, দুমুখো ব্যবহার, বদমায়েশি ও বজ্জাতি তুলনাহীন। বাঙালী ঋণ শোধ করার কথা ভাবেনা। একদিনে যে কাজ করবে বলে প্রতিশ্রুতি দেয়, সারা বছরে তা করে না।'[২৮] রিয়াজের লেখকের মন্তব্য এটি। এ যুগের বাঙালী দেশ বা রাষ্ট্রের কথা ভাবেনি। এযুগের দুজন সেরা নবাব—মুর্শিদকুলী ও আলিবর্দী—দেশবাসীর ভালবাসা বা আনুগত্য পাননি। বাঙালী নিজেকে নিয়ে বড়ই বিব্রত—আত্মোন্নতি সমস্ত জাগতিক রাজকর্মের লক্ষ্য।[২৯] এরকম সর্বাত্মক নৈতিক

২৬। 'সিয়ার', দ্বিতীয় খণ্ড, পৃ: ৪০২-৪০৩
২৭। মঁশিয়ে ল 'মেমোয়ার', এস. সি. হিল, 'থ্রি ফ্রেঞ্চমেন', পৃঃ ১১৪-১১৫।
২৮। 'রিয়াজ', পৃ: ২৩-২৪।
২৯। 'রিয়াজ', পৃঃ ৩৭৬-৩৭৭ এবং পাদটীকা।

অবক্ষয় অলক্ষ্যে পলাশীযুদ্ধের পটভূমিকা রচনা করেছিল। ষড়যন্ত্র, বিশৃঙ্খলা এবং আনুগত্যের অভাবে সৈন্য বাহিনী দুর্বল ; সৈন্যাধ্যক্ষরা ব্যক্তিগত উচ্চাকাঙ্ক্ষা পূরণের জন্য দেশ এবং নবাববংশের স্বার্থ জলাঞ্জলি দিতে প্রস্তুত। শাসক শ্রেণীর মধ্যে চরিত্র, ব্যক্তিত্ব ও সততার অভাব। ব্যক্তিস্বার্থ ও আত্মোন্নতির জন্য এ সামাজিক গোষ্ঠী সর্বদাই সচেষ্ট। সাধারণ মানুষ রাজনীতি ও রাজনৈতিক ভাগ্য সম্পর্কে নিস্পৃহ। এরূপ মানসিক ও নৈতিক অবস্থায় একটাই সম্ভাব্য ফল তার নাম পলাশী।

দশম অধ্যায়

দৈনন্দিন জীবন, সামাজিক জীবন ও নারীজাতির অবস্থা

এ যুগে বাঙালীর জীবনধারা সমাজ বিজ্ঞানীর কৌতূহলের বিষয়। সমগ্র জীবনধারাকে, আলোচনার সুবিধার্থে, দুভাগে ভাগ করা যায়—দৈনিক জীবন ও সামাজিক জীবন। সমগ্র বাঙালী জাতির জীবনধারা বা জীবন যাপনের ভঙ্গি এক রকমের নয়। এযুগের শহর ও নগর কেন্দ্রিক অভিজাত জীবন এক ধরণের; আর গ্রাম বাংলার সাধারণ কৃষক, শ্রমিক, কারিগর ও বৃত্তিধারী মানুষের জীবনচর্যা অন্যানকম। বাংলার হিন্দু মুসলমান অভিজাতরা যে জীবন যাপন করত তার সঙ্গে অনেকটা মিল দিল্লী—আগ্রা—মুঘল—রাজপুত জীবন-চর্যার। এর মধ্যে বহু সংস্কৃতির সমন্বয়। এ জীবনধারা অনেকখানি আন্তর্জাতিক শহরমুখী চকচকে, আড়ম্বরপূর্ণ—অনেকটা বিদেশী। এর ঝোঁকটা বহিরাগত পারস্য সংস্কৃতির দিকে। এককথায় বলাযায় আগ্রা ও দিল্লীর দরবারি জীবনের সঙ্গে এর অনেকখানি মিল। বাংলার হিন্দু জমিদার, অভিজাত মুস্লিম ওমরাহ ও নবাবরা এ জীবন যাপন করত। রাজা রাজবল্লভ, রাজা কৃষ্ণচন্দ্র, রাজা দুর্ল্লভরাম, রামনারায়ণ সীতাবরায় এবং আরো অনেকে এ ধরণের জীবনে অভ্যস্ত হয়ে পড়েছিলেন। মুসলিম অভিজাত জীবনের অনুকরণে এরা একাধিক পত্নী গ্রহণ করেছিলেন; মহিলাদের জন্য অন্দরমহল এবং পর্দা চালু করেছিলেন।

এরা ছাড়া বাংলার হিন্দু মুসলমান আপামর জনসাধারণ মূলত এবং প্রধানত গ্রাম্য জীবন যাপন করত। হিন্দুদের ক্ষেত্রে এ জীবনচর্যার মূল হল পুরাণ, হিন্দু দর্শন ও হিন্দু বিজ্ঞান; সংস্কৃতাশ্রিত ব্রাহ্মণ পণ্ডিত এ জীবনের পরিচর্যা করত। অপর দিকে গ্রাম বাংলার মুসলমান জীবন পরিচালিত হত কোরাণ, হাদিস, শরিয়ত, সরাহ্ এবং ইসলামীয় বিজ্ঞানের আদর্শে। মৌলভি তার আরবী পারসী সংস্কৃতি নিয়ে বাংলার গ্রামবাসী মুসলমানদের সহজ, সরল জীবন পরিচালনা করত। এই দুই জীবনস্তরের মধ্যে এক সাধারণ ঐক্যসূত্র আবার অনেকে লক্ষ্য করেছেন।[১] এটা হল বাঙালীর একেবারে নিজস্ব বাঙালীয়ানা।

১। বিনয় কুমার সরকার, "বেঙ্গলিসিজম ভার্সাস এ রিয়ানাইজেশন, ইসলাম এণ্ড ইউর—এ্যামেরিকা', কৃষ্ণনগর কলেজ শতবার্ষিক সংখ্যা, ১৯৪৮, পৃঃ ১৭-২৪।

এ বাঙালীয়ানার উৎস হল প্রাক্-হিন্দু এবং প্রাক্-মুস্লিম যুগের বাংলার জীবন দর্শন, রীতি-নীতি, সংস্কার, জীবন যাপন পদ্ধতি, উৎসব এবং নানারকম লৌকিক আচার অনুষ্ঠান। বিনয় সরকারের মতে 'পাখি, কাক ও পায়রার' দেশের পারিয়াদের প্রাচীন বাংলায় যে নিজস্ব সংস্কৃতি ছিল সেটাই পরবর্তী-কালে বাঙালী হিন্দু ও মুসলমানের জীবন চর্যায় ঐক্য এবং নানা বিষয়ে মিল সৃষ্টি করেছে। বাঙালী হিন্দুর ধর্মান্তর গ্রহণের ফলে এ ঐক্য সৃষ্টি হয়নি। এর মূল প্রাচীন বাংলার নিজস্ব সংস্কৃতি এবং সেটাই বাঙালীয়ানার উৎস।

বাঙালীর জীবিকা বিভিন্ন ধরণের। বহু মুখী কাজকর্মে নিযুক্ত এযুগের বাঙালী। কৃষিকাজ, নানারকম পণ্য উৎপাদন, ব্যবসাবানিজ্য ও পরিবহন এর মধ্যে প্রধান। বাংলার বেশিরভাগ লোকের জীবন অনাড়ম্বর, সহজ এবং সরল। রবার্ট ওরমে বাঙালীর দৈহিক শক্তি ও মানসিক প্রবণতা সম্পর্কে গুরুত্বপূর্ণ মত প্রকাশ করেছেন। তিনি লিখেছেন 'বাঙালীর শরীর খর্বাকৃতি--মানসিক ও শারীরিক শক্তি কম। বাঙালীর সাহস ও সহ্য করার ক্ষমতা নেই বললেই চলে। সাধারণ শ্রমিকও তেমন উৎসাহের সঙ্গে কাজ করে না। যান্ত্রিক পদ্ধতি প্রয়োগে যে কৌশল ও বুদ্ধির দরকার তা তাদের নেই। কিন্তু তাদের ধৈর্য ও একাগ্রতা আছে। এরা স্বাচ্ছন্দ্য, শান্তি ও আরাম পছন্দ করে। বিপদের ঝুঁকি নিতে বাঙালী ভয় পায়। শারীরিক ক্লান্তিকর কাজও এদের পছন্দ নয়।'[২]

দুখানি সমসাময়িক গ্রন্থে বাঙালীর খাদ্যাভ্যাসের বর্ণনা আছে। 'খুলাসাতে' ভাত ও মাছকে বাঙালীর প্রধান খাদ্য বলে উল্লেখ করা হয়েছে। 'খুলাসাত' ও 'রিয়াজ' উভয় গ্রন্থেই মন্তব্য করা হয়েছে বাঙালী গম, যব এবং এরকম ধরণের খাদ্যশস্য মোটেই পছন্দ করে না।[৩] এরকম খাদ্যশস্যকে তারা অস্বাস্থ্যকর মনে করে। বাঙালী রুটি খায় না। তার প্রধান খাদ্য হল ভাত, মাছ, মাংস, শাক-সব্জি, ফল, দুধ, ঘি, সরিষার তৈল, দই এবং মিষ্টি। 'রিয়াজের' লেখক' গোলাম হোসেন সলিমের মতে এ খাদ্য তালিকা বাংলার হিন্দু-মুসলিম, উচ্চ-নীচ, সকল শ্রেণীর মানুষের। 'রিয়াজ' থেকে আরো' জানা যায় বাঙালী প্রচুর পরিমাণে লাল লংকা এবং লবণ খেতে ভালবাসে। এ যুগের বাঙালী মাংস খেতে পছন্দ করত না। 'খুলাসাত' রচয়িতা সুজন রায় ভাণ্ডারী বাঙালীর এক অদ্ভুত প্রিয় খাদ্যের কথা উল্লেখ করেছেন। 'বেগুন, উদ্ভিজ্জ, শাক-সবজি এবং লেবু একসঙ্গে

২। রবার্ট ওরমে, ঐ, দ্বিতীয় খণ্ড, পৃঃ ৪-৫।

৩। 'রিয়াজ', পৃঃ ২০-২২, 'খুলাসাত' ইণ্ডিয়া অব আরঙ্গজেব, পৃঃ ৫৫-৫৬।

ফুটিয়ে ঠাণ্ডা জলে ডুবিয়ে রেখে পরদিন লবণ দিয়ে খাওয়া হত।' বাংলাদেশে নাকি এ খাবার সুস্বাদু বলে পরিগণিত হত।[৪] খাদ্যের মত বাঙালীর পোশাকও খুব সাধারণ। দরবারের পোশাক আলাদা—ইজের, সার্ট ও পাগড়ি। সাধারণ বাঙালী একমাত্র বস্ত্র পরিধান করত লজ্জা নিবারণের জন্য। বিদেশী পর্যটকরা এ যুগে বাঙালীর বস্ত্রাভাবের কথা উল্লেখ করেছেন। শীতে ও বর্ষায় সাধারণ বাঙালী বস্ত্রাভাবে কষ্ট পেত।[৫] এ সময় বাঙালীদের মধ্যে পাগড়ি ব্যবহারের নিয়ম ছিল। অবশ্য বাঙালীর পাগড়ি একটু স্বতন্ত্র ধরণের। বাঙালী পাগড়ি পরার পরও তার চুলও মস্তক শীর্ষে দেখা যেত। বাঙালী মহিলার একমাত্র পরিধান শাড়ি। এই একমাত্র পরিধানেই সারা শরীর আবৃত করত। সাধারণ বাঙালী মহিলার মাথায় ঘোমটা বা অন্য কোনোরকম কাপড় ব্যবহার করার রেওয়াজ দেখা যায় না। এ যুগে বাঙালীর জুতো মোজার বালাই ছিল না। শুধু অভিজাতরা জুতো পরত। প্রতিদিন গায়ে সরষের তেল মেখে নদী ও পুষ্করণীতে স্নানের নিয়ম চালু ছিল।[৬] বাংলার হিন্দু মুসলমান অভিজাতরা ছাড়া আর কেউ পর্দা মানত না। মহিলারা স্বচ্ছন্দেই বাইরে যেত।

বাঙালীর খাদ্য ও পরিধানের মত তার বাসস্থান ও আসবাব পত্র সরল ও অনাড়ম্বর। সাধারণত গ্রাম বাংলার মানুষ খড় ও বাঁশ দিয়ে বাসস্থান নির্মাণ করত।[৭] বাংলার জলবায়ু আদ্র ; মাটি ভেজা ও স্যাঁতসেতে। বর্ষাকালে প্রচুর বৃষ্টিপাতের জন্য বাংলার মাটি প্রায়ই ভিজে থাকে। বাংলার ধনী লোকেরা সেজন্য ইট ও চুণ দিয়ে দোতলা বাড়ি বানাত। বাংলার পূর্বাঞ্চলে এই স্যাঁতসেতে ভিজে ভাবটা আরো বেশি। সেজন্য এ অঞ্চলের দোতলা বাড়ির নীচের ঘর বর্ষাকালে ব্যবহারের অযোগ্য হয়ে পড়ত। নীচের ঘর ব্যবহার করলে নানারকম অসুখ হত। বাংলা-দেশে বর্ষাকালে নানা প্রকার রোগ দেখা দিত। বর্ষার শেষ দিকে অসুখে বহু লোক ও পশু মারা পড়ত। এ যুগে বাঙালীর তৈজস ও আসবাবপত্র খুব সাদাসিধা। গ্রামের মানুষ সাধারণত মাটির বাসনপত্র ব্যবহার করত। বিত্তবানরা পিতল ও কাঁসার বাসনপত্র রাখত। কিছু কিছু তামার বাসনের উল্লেখ সমকালীন সাহিত্যে দেখা যায়। হিন্দু ও মুসলমানের আসবাবপত্র একই রকমের। অভিজাত

৪। 'খুলাসাত', ঐ, পৃঃ ৫৪-৫৫।
৫। আলেকজান্ডার ডাও, প্রথম খন্ড, পৃঃ ১১৯।
৬। 'রিয়াজ', পৃঃ ২২।
৭। ঐ, পৃঃ ২২।

মুসলমানরা বাংলাদেশে কাঠের সোফা, কার্পেট ও লেপ চালু করেছিল। সাধারণ বাঙালীর শয্যার জন্য ছিল নানা ধরণের পাটি, শীতল পাটি, মাদুর প্রভৃতি। উভয় সম্প্রদায়ের নীচু তলার লোকদের প্রধান আসবাব হল একটি ছুরি, মাদুর, এক টুকরো চট, হুকা, মাটির হাড়ি, কলসি এবং অন্যান্য পাত্র।[৮] স্থল পথে ভ্রমণের জন্য পালকি, জোবালা, গরুর গাড়ি ও হাতি। ঘোড়ার খরচ খুব বেশি পড়ত। সেজন্য সাধারণ বাঙালী ঘোড়া ব্যবহার করত না। নদীতে যাতায়াতের জন্য ছিল নানারকমের নৌকা।

এযুগে দৈনন্দিন জীবনে এবং সামাজিক অনুষ্ঠানে পানের বহুল ব্যবহার লক্ষ্য করা যায়। গোলাম হোসেন পান দেওয়া ও নেওয়ায় কুড়ি রকমের সামাজিক তাৎপর্য লক্ষ্য করেছিলেন। পানের একটি 'বিড়ি' অতিথিকে দেওয়া মানে সম্মান জানান, দুটো দেওয়া মানে পক্ষপাতিত্ব। গোটা 'পানদান' অতিথিকে দেওয়া শ্রদ্ধা জাননোর সামিল। অতিথির সামনে পানদান রাখা মানে তাকে সমান হিসাবে স্বীকার করা।[৯] তামাক খাওয়া বাঙালীর এক প্রিয় নেশা। হুকা ও গড়গড়াতে তামাক খাওয়ার প্রথা ছিল। এছাড়া আফিম, গাঁজা, সিদ্ধি, ভাঙ্, দেশী তাড়ি এবং মদ তৎকালীন বাংলাদেশে প্রচলিত নেশা। শ্রমিক ও কৃষক শ্রেণীর লোকেরা মাঝে মাঝে বা সামাজিক উৎসবে দেশী তাল ও খেজুরের রসে প্রস্তুত তাড়ি খেত। উচ্চ শ্রেণীর লোকেরা মদ, আফিম ও ভাঙ্ খেত। এযুগে সিদ্ধি খাওয়া তেমন দোষাবহ বলে গণ্য হত না। বাঙালীর খেলাধূলার মধ্যে উল্লেখযোগ্য হল হা-ডুডু, ডাণ্ডাগুলি,[১০] ঘুড়ি ওড়ানো, নৌকা দৌড়, তাস, দাবা, পাশা ও জুয়াখেলা। এযুগে কৃষ্ণকান্ত নন্দী ও তাঁর পিতা রাধাকৃষ্ণ নন্দী, মীরজাফরের পুত্র মীরণ ঘুড়ি ওড়ানোয় ওস্তাদ ছিলেন। ঘুড়ি ওড়ানোর ওস্তাদরা খলিফা আখ্যা পেত। এছাড়া গল্প, কথকতা, যাত্রা, পল্লী-গীতির আসরে গান শোনা বাঙালীর প্রিয় অবসর বিনোদনের উপায়। আলিবর্দ্দী গল্প শুনতে ভালবাসতেন। ভারতচন্দ্রের 'অন্নদামঙ্গল' যাত্রা করে অভিনীত হয়েছিল। আলাউলের 'পদ্মাবতী' গ্রামবাংলার সমবেত মানুষের সামনে গাওয়া হত।[১১]

৮। আলেকজাণ্ডার ডাও, ঐ, প্রথম খণ্ড, পৃঃ ১১৯।
৯। 'সিয়ার', দ্বিতীয় খণ্ড; পৃঃ ৪৫২ পাদটীকাসহ।
১০। রামপ্রসাদের পদ 'মন খেলাও রে ডাণ্ডাগুলি', 'শ্যামা মা উড়াচ্ছেন ঘুড়ি' সেযুগে গ্রাম-বাংলার প্রচলিত জনপ্রিয় খেলাধুলার কথা স্মরণ করিয়ে দেয়।
১১। দীনেশচন্দ্র সেন 'প্রাচীন বাংলা সাহিত্যে মুসলমানের অবদান', পৃঃ ৫৭।

হিন্দু ও মুস্লিম উভয় সম্প্রদায়ের মধ্যে শিশু-বিবাহ প্রথা চালু ছিল। পুত্র-কন্যার অল্প বয়সে বিবাহ দেওয়া এসময়কার সামাজিক রীতি। বাংলার হিন্দু-সমাজে শিশু-বিবাহ প্রথা বিদেশীদেরও দৃষ্টি আকর্ষণ করেছিল। স্ক্যাফটন লিখেছেনঃ 'শিশুকালে তাদের বিয়ে হয়। বালকের চোদ্দ এবং বালিকার দশ বা এগারো বছর বয়সে দাম্পত্য জীবনের শুরু। বারো বছর বয়স্কা মায়ের কোলে শিশু অতি সাধারণ দৃশ্য। যদিও তাদের মধ্যে বন্ধ্যা নারী বিরল, তবুও তাদের সন্তান-সন্ততির সংখ্যা কম। আঠারো বছরে মহিলাদের সৌন্দর্য হ্রাস-পেতে শুরু করে; পঁচিশে বয়সের পরিষ্কার ছাপ পড়ে।' মুসলমান-সমাজে পুরুষের একাধিক পত্নী গ্রহণের প্রথা ছিল। বিবাহ বিচ্ছেদও সহজে হত। হিন্দুদের মধ্যে অভিজাত ও উচ্চবর্ণের কুলীনরা ছাড়া এক পত্নী গ্রহণের প্রথা দেখা যায়, যদিও এ ব্যাপারে কোনো শাস্ত্রীয় বিধিনিষেধ ছিল না। হিন্দুদের মধ্যে বিবাহ-বিচ্ছেদ দেখা যায় না। বিধবা বিবাহ এবং নিকট আত্মীয়ের মধ্যে বিবাহ হিন্দু-সমাজে নিষিদ্ধ। মুসলমান-সমাজে নিকট আত্মীয়ের মধ্যে বিবাহ শাস্ত্রসম্মত। রামপ্রসাদ, ভারতচন্দ্র এবং বিদেশীরা সাক্ষ্য দিচ্ছেন সতীদাহ প্রথা চালু ছিল। ১৭৪৩ খ্রীষ্টাব্দে ইংরাজদের কাশিমবাজার কুঠীর সামনে এক মারাঠা ব্রাহ্মণের বিধবা পত্নী সতী হয়েছিলেন।[১২] বাঙালীর জীবন চর্চায় শান্ত, ধীর, স্থির ভাবটি বিদেশীরা লক্ষ্য করেছিল। 'বাঙালী ধনী হয় নিঃশব্দে; যে দরিদ্র্য সে নীরবে দারিদ্র্য বহন করে। বাঙালীর আবেগ সংযত; বিক্ষোভ দীর্ঘস্থায়ী, কিন্তু নীরব। তার কৃতজ্ঞতা বংশপরম্পরায় প্রবাহিত। পারিবারিক ও ব্যক্তিগত জীবনের গোপনতা রক্ষায় বাঙালী ক্লান্তিহীন। যে-কোনো মূল্যে এ গোপনতা সে রক্ষা করে।'[১৩]

মুর্শিদকুলী থেকে মারাঠা আক্রমণের সময় পর্যন্ত বাংলাদেশে শান্তি ছিল। মারাঠা আক্রমণের সময় থেকে এ শান্তি ক্ষুন্ন হয়। আলিবর্দীর সময় থেকে বাংলাদেশে ফকির ও সন্ন্যাসীদের উপদ্রব শুরু হয়। আস্তে আস্তে এ উপদ্রব সারা বাংলাদেশে ছড়িয়ে পড়ে। সন্ন্যাসী ও ফকিররা সশস্ত্র হয়ে বাংলাদেশে দস্যুবৃত্তি করে বেড়াত। অনেক সময় গ্রামের ঘর বাড়ি জ্বালিয়ে দিয়ে লুণ্ঠন করত।[১৪] গ্রাম বাংলায় জমিদাররা এবং শহরে কাজীরা এ যুগে বাংলার বিচার ব্যবস্থা

১২। ভারতচন্দ্র, 'গ্রন্থাবলী', পৃঃ ২৪।
১৩। হাণ্টার, ঐ, প্রথম খণ্ড, পৃঃ ২৫-২৬।
১৪। সুধীর কুমার মিত্র, ঐ, প্রথম খণ্ড, পৃঃ ৩০১।

পরিচালনা করতেন। দাঙ্গা হলে বা বড় রকমের বিশৃঙ্খলা দেখা দিলে বা শান্তিভঙ্গ হলে এরা অপরাধীদের শাস্তি দিতেন। জমিদার কাজী ও ফৌজদার আইন ও শান্তির রক্ষক। এরা নিজেদের খুশিমত সোজাসুজি বিচার করতেন। আসামী বা ফরিয়াদীর পক্ষ সমর্থনের জন্য আইনজীবীর ব্যবস্থা ছিল না। গুরুতর অপরাধ যেমন হত্যাকাণ্ড, দস্যুবৃত্তি প্রভৃতির ক্ষেত্রে মুস্‌লিম ফৌজদারি আইন সরাহ্ প্রয়োগ করা হত। দেওয়ানী মামলার ক্ষেত্রে মুসলমানদের জন্য মুসলিম আইন এবং হিন্দুদের ক্ষেত্রে হিন্দু আইন ব্যবহৃত হত।

চিকিৎসার ক্ষেত্রে হিন্দু বৈদ্য আয়ুর্বেদ শাস্ত্রের বিধান অনুযায়ী হিন্দুদের চিকিৎসা করত। মুস্‌লিম হাকিম য়ুনানী পদ্ধতি অনুযায়ী মুসলমানদের চিকিৎসার ভার নিত। এরা ছাড়া অসংখ্য ওঝা, গুনিন্, সাধু, ফকির মন্ত্র ও ঝাড় ফুঁকের সাহায্যে রোগ সারানো ও শয়তান তাড়ানোর ব্যবস্থা করত। এগুলি ব্যর্থ হলে বাংলার মানুষ প্রার্থনা, উপবাস ও মানত করত। অনেক ক্ষেত্রে চিকিৎসা ও প্রার্থনা একই সঙ্গে চলত। নবাব, ওমরাহ্ এবং ধনী জমিদারদের এক অতি ক্ষুদ্র অংশ ইউরোপীয় চিকিৎসকদের সাহায্য পেত।[১৫]

রবার্ট ওরমে এ যুগে বাঙালীর সামাজিক জীবনের অপর এক বৈশিষ্ট্যের দিকে আমাদের দৃষ্টি আকর্ষণ করেছেন। পৃথিবীর অনেক দেশের চমকপ্রদ অতিথিপরায়ণতার কথা আমরা জানি। আরব বেদুইন রাস্তায় পথিকের সর্বস্ব লুণ্ঠন করে। সেই পথিক তার তাঁবুতে আশ্রয় প্রার্থনা করলে নির্দ্বিধায় সে তাকে আশ্রয় দেয়। প্রয়োজন হলে প্রাণ দিয়ে অতিথিকে রক্ষা করে। আগন্তুক অতিথি সম্পর্কে বাঙালীর সামাজিক ব্যবহার এর ঠিক বিপরীত। বাঙালী তার স্বদেশবাসী অপরিচিত অতিথিকে আশ্রয় দেয় না। এর একটি সম্ভাব্য কারণ হল জাতধর্ম খোয়ানোর ভয়। তার অতিথিপরায়ণতা, দান ধ্যান সবই তার পরিচিত জন, স্বজন ও স্বজাতির মধ্যে সীমাবদ্ধ। মারাঠা আক্রমণকালে (১৭৪২-১৭৫১) বাঙালীর এ সামাজিক আচরণ খুব প্রকট হয়ে ধরা পড়েছিল। পশ্চিম বাংলার মানুষ একস্থান থেকে অন্যস্থানে পালিয়ে চলে আসে। অনেকে গঙ্গা পেরিয়ে নিরাপদ স্থান কলকাতায় আশ্রয় নেয়। এ সময় বাসস্থান ও খাদ্যের অভাবে অনেককে প্রাণ দিতে হয়। বাঙালী রাষ্ট্র বিপ্লবে বিধ্বস্ত আগন্তুক স্বদেশবাসীকে আশ্রয় বা আহার দেয়নি।

১৫। আলেকজান্ডার ডাও, ঐ, প্রথম খন্ড, পৃঃ ১১৯।

বাঙালীর সামাজিক জীবনের এক উল্লেখযোগ্য দিক হল নৃত্য ও সঙ্গীতের প্রতি অনুরাগ। বাংলার নবাবদের মধ্যে মুর্শিদকুলী ও আলিবর্দ্দী নৃত্য ও সঙ্গীতের পৃষ্ঠপোষকতা করেননি। তবে আলিবর্দ্দীর ভ্রাতুষ্পুত্রেরা সকলেই নৃত্য ও সঙ্গীতের সমজদার ছিলেন। এ যুগে বাংলার হিন্দু ও মুসলমান অভিজাতরা নৃত্য ও সঙ্গীতের পৃষ্ঠপোষকতা করেছেন। এজন্য এরা প্রচুর খরচও করতেন। বাংলার হিন্দু জমিদারদের মধ্যে নদীয়ার রাজা, বর্ধমানের রাজারা এবং বিষ্ণুপুরের মল্লরাজারা সঙ্গীত ও নৃত্যের উৎসাহী সমর্থক। এ সময়ে বাংলাদেশে উত্তর ভারতের ক্ল্যাসিকাল সঙ্গীতের কদর। কৃষ্ণচন্দ্রের শিক্ষক বিসরাম খাঁ তাঁকে হিন্দুস্তানী সঙ্গীত শেখাতেন। হিন্দুস্তানী ধ্রুপদ ও খেয়ালের সঙ্গে এ যুগের বাংলার আত্মিক বন্ধন তৈরি হয়েছিল। মল্লরাজাদের রাজধানী বিষ্ণুপুরে তানসেন পরিবারের এক গায়ক এসে বিষ্ণুপুর ঘরানার সৃষ্টি করলেন। এ'র বংশধরেরা অনেকেই ছিলেন কণ্ঠ ও যন্ত্র সঙ্গীতের বিখ্যাত ওস্তাদ। এ ঘরানার মধ্য দিয়ে হিন্দুস্তানী ক্ল্যাসিকাল সঙ্গীতের সঙ্গে বাংলার যোগসূত্র স্থাপিত হল। বাংলার অভিজাত সম্প্রদায় নৃত্যেরও বড় সমজদার। 'সিয়ার' থেকে জানা যায় পুরুষদের নৃত্য সামাজিক নিন্দার কারণ হত। কৃষ্ণচন্দ্রের দরবারে নৃত্যের শিক্ষক ছিলেন শের মাহমুদ। তিনি উত্তর ভারতীয় নৃত্য কত্থক শেখাতেন। ষ্ট্যাভোরিনাস ও এডওয়ার্ড ইভ্স উভয়েই পেশাদার নর্ত্তকীদের কথা উল্লেখ করেছেন। উৎসবে বা বিশেষ অনুষ্ঠানে এরা নৃত্য গীত পরিবেশন করে জনসাধারণকে আনন্দ দিত।[১৬]

নানারকম উৎসব, পূজা ও পার্বন, বিভিন্ন ধরণের মেলার অনুষ্ঠান এ যুগে বাঙালীর সামাজিক জীবনের অপর দিক। ধর্মীয় উৎসবগুলি[১৭] ছাড়া এ যুগে দুটি ধর্ম সম্পর্কহীন সামাজিক উৎসবের পরিচয় পাওয়া যায়। সিরাজুদ্দৌলার সময়ে 'নবারা' বা রাষ্ট্রীয় নৌ উৎসব পালিত হত। সাধারণত বর্ষাকালে রাষ্ট্রীয় নৌবহরের বিভিন্ন ধরণের নৌকা যেমন গড়ামরদান, হাতিমরদান, ময়ূরপঙ্খী, মৎসমুখী, মকর মুখী প্রভৃতি সমবেত করে রাষ্ট্রীয় দরবার বসানো হত। রাজধানী মুর্শিদাবাদের গঙ্গাবক্ষে এ নৌ উৎসব পালিত হত। বৈশাখ মাসের প্রথম দিন পালিত হত নববর্ষ উৎসব। এ দিন নবাব ও জমিদারদের নজরানা দেওয়ার প্রথা ছিল। আত্মীয় ও বন্ধুদের মধ্যে মিষ্টি বিতরণ ও শুভেচ্ছা বিনিময় হত। অনেক সময় ঐ দিন জমিদারদের পুন্যাহ বা রাজস্বের বাৎসরিক হিসাব নিকাশ হত।

১৬। ষ্ট্যাভোরিনাস 'ভয়েজ', প্রথম খন্ড, পৃঃ ৪৩৮।
১৭। ধর্মীয় উৎসবের জন্য 'নবম অধ্যায়' দেখুন।

বাংলার সামাজিক জীবনের আর একটি উল্লেখযোগ্য দিক হল বিভিন্ন ধরণের মেলার অনুষ্ঠান। এ যুগে চড়কের মেলা, রথের মেলা, বারুনীর মেলা এবং বীরভূমে কেন্দুলির মেলা বিশেষ উল্লেখযোগ্য। চড়ক ও রথের মেলা সারা বাংলাদেশে হত। অবশ্য পূর্ববঙ্গে চড়কের মেলা এবং পশ্চিমবঙ্গে রথের মেলার সংখ্যা বেশি। নবদ্বীপ ও শান্তিপুরে রাসমেলা। বাংলার আদিবাসী ও সাঁওতালদের মধ্যে বহু উৎসব ও মেলার উল্লেখ দেখা যায়। জার্মানীতে এক সময় এ রকম অসংখ্য মেলা ছিল ; সেগুলির বাণিজ্যিক ও আর্থিক তাৎপর্য অসাধারণ। বাংলার জমিদাররা এ মেলাগুলির পৃষ্ঠপোষকতা করতেন। বাংলার সমাজ জীবনে এগুলির প্রভাব খুব গুরুত্বপূর্ণ। মেলাতে নানারকম আমোদ প্রমোদের ব্যবস্থা মানুষের দৈনন্দিন জীবনের ক্লান্তি ও অবসাদ দূর করে নতুন প্রাণশক্তির যোগান দেয়। স্থানীয় পণ্য মেলায় বিক্রি করা যায় ; এতে স্থানীয় কারিগররা উৎসাহ পায়। গ্রামের মানুষ সারা বছরের প্রয়োজনীয় আসবাব ও তৈজসপত্র মেলায় কিনতে পারে। ব্যবসায়ী ও মহাজনরা বাণিজ্যিক কাজ কর্মের জন্য লাভবান হন। বাংলার মেলাগুলি বাঙালীর এ সকল আর্থ-সামাজিক প্রয়োজন মেটাত।

নারী জাতির প্রতি দৃষ্টিভঙ্গি ও ব্যবহার যে কোনো জাতির সভ্যতার মাপকাঠি হতে পারে। এ যুগের বাঙালী নারী জাতির সঙ্গে ভাল ব্যবহার করত বলে প্রমাণ নেই। গোলাম হোসেন লিখেছেন এ যুগে বাঙালী নারী জাতি সম্পর্কে শ্রদ্ধা ও সম্ভ্রমপূর্ণ মনোভাব পোষণ করত না। পলাশী যুদ্ধের পর মীরজাফর ক্লাইভকে খুশী করার জন্য দশজন সুন্দরী মহিলা উপহার দিয়েছিলেন।[১৮] ভেরেলস্টও ঘটনার উল্লেখ করে জানিয়েছেন মহিলারা সকলেই ছিলেন সিরাজুদ্দৌলার হারেমের। তিনি আরো লিখেছেন প্রাচ্য দেশে পুরুষরা স্ত্রীলোকদের ওপর কর্তৃত্ব করে এবং অপরাধের শাস্তি দেয়।[১৯] তিনি হিন্দু ও মুসলিম উভয় শ্রেণীর মহিলাদের জন্য পর্দা ও অন্দরমহলের ব্যবস্থা দেখেছিলেন। অভিজাত সম্প্রদায়ের মহিলাদের জন্য এ রকম ব্যবস্থা ছিল। ওপরের দুটো উদ্ধৃতি থেকে একটা জিনিস পরিষ্কার বোঝা যায়। নারীজাতির স্বাধীন অস্তিত্ব স্বীকার করা হত না। তাদের মতামতের কোনো মূল্য ছিল না। ক্রীতদাসের মত তাদের এক প্রভুর কাছ থেকে অন্য প্রভুর কাছে চালান করা হত। হিন্দুরা স্ত্রীলোকের অধিকার স্বীকার করত না। হিন্দু নারীদের পিতা বা স্বামীর সম্পত্তিতে

১৮। 'সিয়ার', দ্বিতীয় খন্ড, পৃঃ ১৯১ পাদটীকাসহ।
১৯। ভেরেলস্ট, 'ভিউ', পৃঃ ১৩৮।

অধিকার ছিল না। শিশুকালে বিবাহ; স্বামী মারা গেলে পুনর্বিবাহের অধিকার নেই। এ যুগে সতীদাহের ঘটনা কদাচিৎ ঘটত। এ প্রথার ব্যাপকতা কমে এসেছিল। সরকারি কড়াকড়ি ছিল।[২০] শাস্ত্রীয় বিধানে শিশুর জননী ও অন্তঃস্বত্তা নারীর সহমরণে অধিকার ছিল না। ফলে হিন্দু বিধবাদের সংখ্যা বেড়ে চলেছিল। শাস্ত্রের বিধানে ও সরকারি নিয়মে চিতাগ্নি থেকে যারা রক্ষা পেত তাদের জীবন হত কঠোর ও দুঃখের। তৎকালীন হিন্দু সমাজ এদের কথা ভাবেনি। সসম্মানে জীবন ধারণের পথ এদের সামনে খোলা থাকত না।

ভারতচন্দ্র লিখেছেন একজন সতীনারীর পৃথিবীতে একমাত্র অবলম্বন তার পতি। বাংলার নারীজাতির জীবন বড় দুঃখের বলে কবি উল্লেখ করেছেন। নারীজাতি সর্বদাই অন্যের ওপর নির্ভরশীল। কিন্তু সংসারের বহু মানুষ ও বহু কাজের ভার তাদের বইতে হত।[২১] বাংলার হিন্দু গৃহবধূদের তিনি উত্তমা, মধ্যমা ও অধমা এই তিনভাগে ভাগ করেছেন। 'অহিত করিলে পতি যেবা করে হিত' তিনি উত্তমা, 'হিত কৈলে হিত করে অহিতে অহিত' তিনি মধ্যমা, আর 'হিত কৈলে অহিত করয়ে সেই জন' তিনি অধমা। 'পতি প্রতি করে যেই অকারণ ক্রোধ' তিনি চণ্ডী। এ যুগে বাংলার মুসলমান মহিলাদের অবস্থা তুলনা-মূলকভাবে ভাল। পিতা ও স্বামীর সম্পত্তিতে তাদের অধিকার ছিল। বিধবা বিবাহের বাধা ছিল না। তবে অনেক সময় অতি তুচ্ছ কারণে বিবাহ বিচ্ছেদ ঘটত। পুরুষ জাতি মহিলাদের মর্যাদা ও সম্ভ্রম দিত না যদিও ইসলামের অনুশাসন এ বিষয়ে স্পষ্ট।

এ রকম মানসিকতা সত্ত্বেও, ডাও সাক্ষ্য দিচ্ছেন, 'ভারতীয়দের নারীজাতি সম্পর্কে একটা সম্ভ্রমবোধ ছিল যা অন্য কোনোভাবে ব্যাখ্যা করা যায় না। ভারতে হিন্দু মুসলমান উভয় সম্প্রদায়ের লোক নারীজাতিকে পবিত্র মনে করত। সৈনিকরা হত্যা ও ধ্বংসের মধ্যে মহিলাদের স্পর্শ করত না। বিজয়ী সেনাবাহিনী হারেম লুণ্ঠন করত না। স্বামীর রক্তে হস্তরঞ্জিত ঘাতকও স্ত্রীর সামনে ভয়ে জড়সড় হয়ে পড়ে।[২২] সমাজের অনুদার দৃষ্টিভঙ্গি ও ব্যবহার সত্ত্বেও এ যুগের বাংলায় কয়েকজন অসাধারণ মহিলার সাক্ষাৎ পাওয়া যায়। বিদ্যায়, বুদ্ধিতে, সাহসে ও ব্যক্তিত্বে এ'রা নিঃসন্দেহে অনন্যা। এরা হলেন মুর্শিদকুলীর বেগম, আলিবর্দীর বেগম, দ্বিতীয়

২০। স্ক্যাফটন, ঐ, পৃ: ১১।
২১। ভারতচন্দ্র, 'গ্রন্থাবলী' পৃঃ ২২২, ২২৯।
২২। ডাও, ঐ, দ্বিতীয়খণ্ড, পৃঃ ৭৫।

মুর্শিদকুলীর স্ত্রী দরদানা বেগম, সরফরাজ খাঁর মাতা জিন্নাতুন্নেসা বেগম, ভগিনী নাফিসা বেগম, সরফরাজ খাঁর প্রধান সেনাপতি গওস খাঁর বিধবা পত্নী, নাটোরের রানী ভবানী, রাজবল্লভের আত্মীয়া কবি ও বিদুষী আনন্দময়ী। 'রিয়াজের' লেখক আলিবর্দীর বেগমকে রাষ্ট্রের সুপ্রিম পলিটিকাল অফিসার বলে উল্লেখ করেছেন।[২৩] সে যুগের রাস্ট্রে ও সমাজে অবশ্য এদের প্রভাব তেমন গভীর বা ব্যাপক হয়নি। তবে সামান্য হলেও এদের অবদান সমগ্র সমাজের পক্ষে তাৎপর্যপূর্ণ ও মঙ্গলকর হয়েছিল।

২৩। রিয়াজ, পৃঃ ৩২৭-৩২৯।

একাদশ অধ্যায়

বাংলায় ইউরোপীয় বণিক—সামাজিক জীবন

১৭২৫ খ্রীষ্টাব্দে ফরাসি নৌ-সেনাপতি শেভ্যালিয়্যার দ্য আলবার্ট বাংলাদেশে এসেছিলেন। তিনি লিখেছেন ইউরোপীয় বণিকরা বাংলাদেশে গঙ্গাতীরে তিনটি সুন্দর শহর গড়ে তুলেছে। এ তিনটি শহর হল ইংরাজদের কলকাতা, ফরাসিদের চন্দননগর এবং ওলন্দাজদের চুঁচুড়া। দিনেমাররা এসময়ে বাংলাদেশে ছিল না, আর বেলজিয়ামের অস্টেণ্ড কোম্পানীর বাঁকিবাজার কুঠীর কথা তাঁর বর্ণনায় নেই। তাঁর মতে বয়সে কনিষ্ঠতম হলেও গঙ্গার পূর্ব তীরে অবস্থিত কলকাতা তিন নগরীর মধ্যে সবচেয়ে ঐশ্বর্যশালী।[১] এর দুটি কারণ হল কলকাতার সুবিধাজনক ভৌগলিক অবস্থিতি এবং বাংলাদেশে ইংরাজদের বিনাশুল্কে বাণিজ্যের অধিকার। বিনাশুল্কে বাণিজ্যের অধিকার ইংরাজ ইস্ট ইণ্ডিয়া কোম্পানী এবং কোম্পানীর কর্মচারীরা সমান ভাবে ভোগ করত। ফরাসি ও ওলন্দাজরা এজন্য এদের সঙ্গে প্রতিদ্বন্দ্বিতায় পেরে ওঠেনি। বাংলাদেশে ইউরোপীয় বাণিজ্যের প্রধান ঘাঁটি কাশিমবাজার, ঢাকা, জগদিয়াতে তিন কোম্পানীরই বাণিজ্যকুঠী ছিল। এ সময়ে বাংলাদেশে পর্তুগীজদের বাণিজ্য নেই বললেই চলে। এরা দেশী বিদেশী সৈন্যবাহিনীতে সৈনিকের কাজ করত; রাধুনী ও পরিচারকের কাজ পেত ইউরোপীয় উপনিবেশ গুলিতে। ইউরোপীয় কোম্পানীগুলিতে চাকরি এবং সামান্য ছোট খাট ব্যবসা অন্যদের জীবিকা অর্জনের উপায় হত। বাকীরা দস্যুবৃত্তি করে জীবন কাটাত। এ যুগে ইউরোপীয় উপনিবেশগুলির সমৃদ্ধির আর একটি ঐতিহাসিক কারণ হল বাংলাদেশে মারাঠা আক্রমণ, মারাঠা আক্রমণের ধাক্কায় কলকাতাতে অনেক ধনী পরিবার, কারিগর, তাঁতি এবং নানারকম বৃত্তিধারী ব্যক্তি আশ্রয় নিয়েছিল। চন্দননগর এবং চুঁচুড়ার ক্ষেত্রেও একই রকম পরিবর্তন

১। দ্য আলবার্ট, 'জার্নাল', এস. সি. হিল, 'থ্রি ফ্রেঞ্চ মেন ইন বেঙ্গল', পৃঃ ১-৩। এ যুগে (১৭০০-১৭৫৭) ইউরোপীয় বণিকদের মধ্যে দিনেমারদের ভূমিকা নগণ্য। ১৭১৪ খ্রিষ্টাব্দে দিনেমার ডাঙ্গায় (বর্তমান গোঁদলপাড়া, চন্দননগর) বাণিজ্যকুঠী ছেড়ে তারা তামিলনাড়ুর ট্রাংকুভারে চলে যায়। ১৭৫৫ খ্রীষ্টাব্দে শ্রীরামপুরে এসে নতুন করে বাণিজ্যিক উপনিবেশ স্থাপন করে। বেলজিয়ামের অস্টেণ্ড কোম্পানী ব্যারাকপুরের কাছে বাঁকিবাজার কুঠী স্থাপন করে প্রায় দশ বছর বাংলায় বাণিজ্য করেছিল (১৭২০-১৭৩৩)। সংখ্যায় এরা খুবই নগণ্য। অন্যান্য ইউরোপীয়দের সঙ্গে এদের সম্পর্ক খুব খারাপ ছিল। প্রায় বিচ্ছিন্ন অবস্থায় বাংলাদেশে তারা দিন কাটিয়েছিল।

লক্ষ্য করা যায়। মারাঠা আক্রমণে পর্যুদস্ত পশ্চিম বাংলার মানুষ ইউরোপীয় উপনিবেশগুলিকে নিরাপদ আশ্রয় মনে করেছিল।

ইউরোপে সপ্তবর্ষব্যাপী যুদ্ধ (১৭৫৬-১৭৬৩) শুরু হওয়ার আগে বাংলাদেশে ইউরোপীয় কোম্পানীগুলির মধ্যে প্রত্যক্ষ সংঘর্ষ দেখা দেয়নি। বাংলার নবাবরা ইউরোপীয়দের সম্পর্কে বরাবরই সজাগ ছিলেন। তাদের সামরিক শক্তিও নেহাত কম ছিল না। তাঁরা ইউরোপীয়দের স্পষ্ট করে জানিয়েছিলেন ইউরোপে শত্রুতার সূত্র ধরে বাংলাদেশে তাদের মধ্যে কোনোরকম সংঘর্ষ তাঁরা সহ্য করবেন না। ১৭৪৫ খ্রীষ্টাব্দে ইংরাজ রাজকীয় নৌবহর একখানি ফরাসি জাহাজ আটক করে-ছিল। নবাব আলিবর্দীর আদেশে ইংরাজরা এ জাহাজ ফেরত দিতে বাধ্য হয়। প্রাক্-পলাশী যুগে ইউরোপীয়রা বাংলার রাজশক্তিকে সমীহ করত। শতাব্দীর শুরুতে ইউরোপে স্পেনীয় উত্তরাধিকার যুদ্ধ শুরু হয় (১৭০২-১৭১৩)। ইউরোপে ইংরাজ ও ফরাসিরা এ যুদ্ধে জড়িয়ে পড়ে। বাংলাদেশে কিন্তু কোনো অঘটন ঘটেনি। ১৭৪৬ খ্রীষ্টাব্দ পর্যন্ত ইংরাজ, ফরাসি ও ওলন্দাজদের মধ্যে সম্পর্ক মন্দ ছিল না। বাণিজ্যিক প্রতিদ্বন্দ্বিতা ও ঈর্ষা ছিল ; মাঝে মাঝে পলাতকদের প্রশ্ন নিয়ে তিন কোম্পানীর মধ্যে সম্পর্ক তিক্ত হত। অস্টেণ্ড কোম্পানীর বিতাড়ন প্রচেষ্টায় ফরাসিরা ইংরাজ ও ওলন্দাজদের সঙ্গে যোগ দেয়নি। তবুও ইউরোপীয়-দের মধ্যে সহযোগিতার মনোভাব দেখা যায়। বাণিজ্যকুঠীগুলিতে একে অন্যের সাহায্য নিত। অসুখ বিসুখে ডাক্তার ও ওষুধ দিয়ে সাহায্য করা এবং টাকা ধার দেওয়া চলত। রাষ্ট্রবিপ্লবে এক কোম্পানী আর এক কোম্প্যানীকে রক্ষা করার চেষ্টা করত। ১৭৫৬ খ্রীষ্টাব্দে কলকাতা দখলের পর সিরাজুদ্দৌল্লা ঢাকাতে ইংরাজ বাণিজ্য কুঠী দখলের নির্দেশ দেন। ঐ সময় ফরাসিরা ইংরাজদের যথেষ্ট সাহায্য করেছিল। ইংরাজ ইস্ট ইণ্ডিয়া কোম্পানীর লোকেরা ওলন্দাজ ও ফরাসিদের মাধ্যমে দেশে টাকা পাঠাত। তাছাড়া অন্যান্য বাণিজ্যিক সহযোগিতার প্রশ্নও উঠত। সুতরাং দেখা যাচ্ছে বিভিন্ন কারণে এদের মধ্যে সম্পর্ক ছিল। ১৭৪৬ খ্রীষ্টাব্দ থেকে এ সম্পর্ক ক্ষুণ্ন হতে শুরু করে। ঐ বছর দাক্ষিণাত্যে ইংরাজ ও ফরাসিদের মধ্যে সংঘর্ষ শুরু হল। সমুদ্র বক্ষেও প্রসারিত হল এ সংঘর্ষ। বাংলায় অবশ্য ইংরাজ ও ফরাসিদের মধ্যে কোনো সংঘর্ষ হয়নি। এক অস্বস্তিকর নিরপেক্ষতা দুই জাতির মধ্যে বহাল ছিল। এ যুগে ফরাসিরা নয়—ইংরাজদের বড় বাণিজ্যিক প্রতিদ্বন্দ্বী হল ওলন্দাজরা। বিহারে সোরার ব্যবসা নিয়ে মাঝে মাঝে এদের মধ্যে তিক্ততার সৃষ্টি হত। এ তিক্ততা ও বিরোধ অবশ্য কখনো

সংঘর্ষের রূপ নেয়নি। সপ্তবর্ষব্যাপী যুদ্ধের শুরুতে ইংরাজ ও ফরাসিদের মধ্যে অস্বস্তিকর নিরপেক্ষতার শেষ হল, ১৭৫৭ খ্রীষ্টাব্দের ২৩শে মার্চ ক্লাইভ চন্দননগর অধিকার করলেন।

প্রাক্-পলাশী যুগেই তিন কোম্পানীর শহর, দুর্গ, হাসপাতাল, চার্চ সবই গড়ে উঠেছে। তিনটি দুর্গেরই নির্মাণ কাজ শেষ। এ তিনটি দুর্গ হল ফোর্ট উইলিয়ম, ফোর্ট অরলিও এবং ফোর্ট গুস্তাভাস। তিনটি শহরই এযুগে দ্রুত গড়ে উঠ্ছে। এদেশী বণিক, মহাজন, কারিগর, তাঁতি, মজুর ও নানারকম হাতের কাজ জানা লোক এ শহরগুলিতে ভিড় বাড়াচ্ছে। শতাব্দীর শুরুতে কলকাতার লোকসংখ্যা পনেরো থেকে কুড়ি হাজার, পলাশী যুদ্ধের আগে এক লাখ। চন্দননগরের লোক সংখ্যাও অনেক বেড়ে গেছে। ডুপ্লের সময়ে এ শহরের লোকসংখ্যা দাঁড়ায় প্রায় এক লাখের কাছাকাছি।[২] শুধু চুঁচুড়ার লোকসংখ্যা কিছুটা কম। এযুগের কলকাতা গড়ে উঠেছিল খানিকটা এলেমেলোভাবে। তার গড়ে ওঠায় পরিকল্পনার ছাপ মেলে না। কলকাতায় ভাল রাস্তা, জলসরবরাহের ব্যবস্থা বা নর্দমা ছিল না। বিলাতে কোম্পানীর কর্তৃপক্ষ এ সম্পর্কে সচেতন। রাস্তাঘাট নির্মাণের জন্য তারা কলকাতা কাউন্সিলকে লিখেছিলেন। এর উদ্দেশ্য হল বাংলার মানুষকে কলকাতার দিকে আকৃষ্ট করা। শুধু রাস্তাঘাট নয়, কলকাতার স্বাস্থ্য ও শান্তিশৃঙ্খলা রক্ষার জন্য কলকাতার কর্তৃপক্ষকে তারা নির্দেশ পাঠিয়েছিলেন। কলকাতার কলেক্টর মহল্লায় ঘুরে অধিবাসীদের অভিযোগ দূর করার নির্দেশ পান। এসমস্ত কিছুর পেছনে একটাই উদ্দেশ্য—কলকাতায় লোকসংখ্যা ও কাজকর্ম বাড়লে কেম্পানীর আয় বাড়বে। একই উদ্দেশ্য নিয়ে চন্দননগরে ডুপ্লে শহর সংস্কার করেছেন। রাস্তাঘাট তৈরি হল। পঞ্চাশ থেকে ষাটজন রোগী গ্রহণ করতে পারে এমন হাসপাতাল গড়ে ওঠল। সারা শহরে দু হাজার পাকা বাড়ি তৈরি হয়েছিল এ সময়ে। অনেকগুলি সুন্দর সুন্দর বাগান, মন্দির, ঘাটও গড়ে উঠল।[৩] কলকাতা ও চন্দননগরের মত চুঁচুড়ার উন্নতি হয়নি, তবে রাস্তাঘাট ও বাড়ি তৈরি হয়েছিল যথেষ্ট। হ্যামিলটন চুঁচুড়াতে ওলন্দাজ কোম্পানীর কর্মচারীদের গঙ্গাতীরে সুন্দর সুন্দর বাসভবন দেখেছিলেন। আর দেখেছিলেন ইষ্টক নির্মিত কোম্পানীর বিশাল গুদাম ও ফ্যাক্টরি। এ শহরগুলির এক সাধারণ বৈশিষ্ট্য হল বহু জাতি ও ধর্মের

২। কালীচরণ কর্মকার, 'চন্দননগর সেট ডুপ্লে', পৃঃ ১৮৮।
৩। ঐ, পৃঃ ১৮৮।

মিলনস্থল এগুলি—বিশ্বজনীন শহর। তিনটি শহরেই বসতি স্থাপন করল হিন্দু, মুসলমান, আর্মেনীয়, ইহুদি, খৃষ্টান প্রভৃতি ধর্মাবলম্বী মানুষ। বহু জাতি ও উপজাতির আবাসস্থল হল এগুলি। মাড়োয়ারি, পর্তুগীজ, বাঙালী, ইংরাজ, ফরাসি, ওলন্দাজ, আর্মেনীয়, পাঞ্জাবী, কাশ্মীরী, মোগল, পাঠান বিভিন্ন উদ্দেশ্য নিয়ে আধুনিক সভ্যতার সূত্রপাত করল এ শহরগুলিতে। বাংলা তথা ভারতবর্ষের আধুনিকীকরণের যজ্ঞবেদী রচিত হল।

ইউরোপীয় কোম্পানীগুলি তাদের বাণিজ্যিক কাজকর্মের জন্য স্বদেশ থেকে কর্মচারী নিয়ে আসত। এদেশের ভাষা রীতি-নীতির সঙ্গে পরিচয় না থাকার জন্য এদের অনেক রকম দেশীয় কর্মচারীর প্রয়োজন হত। এরা হল দোভাষী, মুন্সী, বেনিয়ান, সরকার, গোমস্তা প্রভৃতি। এরা এদেশী ও বিদেশীদের মধ্যে যোগসূত্র রক্ষা করত। এছাড়াও এদের সঙ্গে থাকত বহু ধরণের এদেশী কর্মচারী—সহিস, রাঁধুনি, চাকর, বেহারা, মালি, পিওন প্রভৃতি। ইউরোপীয় কোম্পানী-গুলি তাদের কর্মচারীদের যথেষ্ট বেতন দিত না। ইংরাজ ঈস্ট ইণ্ডিয়া কোম্পানীর একজন রাইটার সব মিলিয়ে বার্ষিক তিন শত টাকা বেতন পেত। কলকাতা কাউন্সিলের একজন সদস্যের বার্ষিক বেতন হত দু হাজার টাকা। তবে একথা ঠিক বেতন ছাড়াও কোম্পানীর কর্মচারীরা নানা রকম সুযোগ সুবিধা পেত। ইংরাজ, ফরাসী ও ওলন্দাজ কোম্পানীর ইউরোপীয় কর্মচারীরা সকলেই ব্যক্তিগত ব্যবসা করার সুযোগ পেত। শতাব্দীর তৃতীয় দশকে ফরাসী কোম্পানীর কর্ম-চারীরা এবং চতুর্থ দশকে ওলন্দাজরা ব্যক্তিগত ব্যবসা করার অধিকার পেয়েছিল। ইংরাজ কোম্পানীর সমস্ত ইউরোপীয় কর্মচারী—রাইটার থেকে গভর্ণর, সেনা-বাহিনীর লোক, যাজক ও ডাক্তাররা সকলেই ব্যক্তিগত ব্যবসা করার অধিকার পেয়েছিল। এছাড়া ব্যবসায়ের লাভের ওপর এরা কমিশন পেত। বাসস্থান, আহার, পরিচারক, ধোলাই, জলের জন্য নানা রকম ভাতা নির্দিষ্ট ছিল। ইংরাজ কোম্পানীর কর্মচারীরা ছমাস অন্তর বেতন পেত। তাদের অন্যান্য আয় এত বেশি হত নিয়মিত মাসিক বেতন না হলেও কোনো অসুবিধা হত না। সব মিলিয়ে ইউরোপীয়রা এদেশে কম রোজগার করত না।

ইংরাজ কোম্পানীর কর্মচারীরা এপ্রেণ্টিস্ বা রাইটাররূপে বাংলাদেশে আসত। অনেক গভর্ণর আসতেন সরাসরি ইংল্যাণ্ড থেকে নিয়োগপত্র নিয়ে। কোম্পানীর চাকরি পেতে হলে ন্যূনতম যোগ্যতা হল বয়স কমপক্ষে ষোলো বছর এবং গণিত ও বাণিজ্যিক হিসাবে কিছু জ্ঞান। উচ্চ কর্মচারীদের টাকার জামিন নিয়ে চুক্তি-

পত্র সই করিয়ে (covenant) চাকরি দেওয়ার ব্যবস্থা ছিল। কর্মচারীদের মধ্যে বিভিন্ন স্তর হল রাইটার, ফ্যাক্টর, জুনিয়র মার্চেণ্ট ও সিনিয়র মার্চেণ্ট। এরা সকলেই পদোন্নতির মাধ্যমে কাউন্সিলের সদস্য ও গভর্ণরও হতেন। একজন রাইটার পাঁচ বছর কাজ করার পর ফ্যাক্টর, আরো তিনবছর পর জুনিয়র মার্চেণ্ট এবং আরো তিন বছর জুনিয়র মার্চেণ্ট হিসাবে কাজ করার পর সিনিয়র মার্চেণ্ট হত। কোম্পানীর চাকরিতে পদোন্নতির একমাত্র মাপকাঠি সিনিয়ারিটি। কোম্পানীর কর্মচারী ছাড়া এযুগে বাংলাদেশে আরো দু ধরণের ইউরোপীয়দের সাক্ষাৎ পাওয়া যায়। এরা হল স্বাধীন বণিক ও বেআইনি বণিক (interloper)। স্বাধীন বণিকরা কোম্পানীর লাইসেন্স নিয়ে বাংলাদেশে ব্যবসা করতে আসত। এরা আন্তঃপ্রাদেশিক ও এশীয় বাণিজ্যে অংশ নিত। বেআইনি বণিকরা কোম্পানীর অনুমতি ছাড়াই এদেশে ব্যবসা করতে আসত। কোম্পানীর ইউরোপীয় বাণিজ্যে ভাগ বসাত। ইংরাজ ঈষ্ট ইণ্ডিয়া কোম্পানী এদের ওপর ছিল খড়্গহস্ত। ধরা পড়লে এদের বন্দী করে দেশে ফেরত পাঠানো হত।

কোম্পানীর কর্মচারীরা এযুগের বাংলার ইউরোপীয় সমাজে অভিজাত। এরা নিজেদের বণিক মনে করত। কোম্পানী ও নিজেদের ব্যক্তিগত ব্যবসা পরিচালনা করা এদের প্রধান কাজ। ধনী হয়ে দেশে ফিরে স্বচ্ছল ভদ্রলোকের জীবন-যাপনের আশাতে মাত্র পনেরো কুড়ি বছরের জন্য এরা ভারতে আসত। তবুও এদেশ প্রথমে তাদের ভাল লাগত না। স্বদেশ ও সমাজ ছেড়ে এত দূরে আসার জন্য স্বভাবতই তাদের মনের ওপর চাপ সৃষ্টি হত। এদেশের জলবায়ু, বিশেষত গ্রীষ্ম ও বর্ষা, ইউরোপীয়রা পছন্দ করত না। নানা রকম রোগের ভয়ে এরা সব সময় সন্ত্রস্ত থাকত। শীতের দেশের লোক বিদেশীরা, গরম পড়লে প্রচণ্ড কষ্ট পেত। অনেকে গরম পড়লে বারাসাত ও চুঁচুড়ায় পালিয়ে গিয়ে আত্মরক্ষা করার চেষ্টা করত। যারা সদ্য ইউরোপ থেকে আসত তাদের কাছে প্রথম বর্ষা অনেক সময় মারাত্মক হয়ে দেখা দিত। বর্ষাকালে ইউরোপীয়দের মধ্যে মৃত্যুর হার বেশি দেখা যেত।

ওলন্দাজ নাবিক স্ট্যাভোরিনাসের লেখা থেকে চুঁচুড়ার ওলন্দাজদের দৈনন্দিন জীবনের অনেকখানি পরিচয় পাওয়া যায়।[৪] সকাল পাঁচটায় শয্যা ত্যাগ তারপর প্রাতঃরাশ। দুপুর পর্যন্ত কাজ। তারপর মধ্যাহ্ন ভোজন এবং দিবানিদ্রা

৪। স্ট্যাভোরিনাস, ঐ পৃঃ ৫৯।

বিকাল চারটে পর্যন্ত। বিকাল চারটে থেকে ছটা আবার কাজ। ছটা থেকে রাত্রি নটা পর্ষন্ত বিশ্রাম। নটায় নৈশ ভোজ এবং রাত্রি এগারোটায় শয্যাগ্রহণ। দৈনন্দিন জীবনের এই ছকের সঙ্গে ইংরাজ ও ফরাসিদের অদ্ভুত মিল। সাধারণ বৈশিষ্ট্য হল দিবানিদ্রা। পার্থক্যটুকু সামান্য বলা চলে। কলকাতার ইংরাজদের দিন শুরু হত সকাল ছটায় প্রার্থনার মধ্য দিয়ে। তারপর প্রাতঃরাশ। সকালে কাজের সময় নটা থেকে বারোটা। দুপুরে মধ্যাহ্ন ভোজ ও দিবানিদ্রা। প্রয়োজন হলে বিকালে দু এক ঘণ্টা কাজ।[৫] সাধারণত জুনিয়ররা এসময় কাজ করত। রাত্রি আটটায় নৈশ ভোজ, প্রার্থনা এবং এগারোটার মধ্যে শয্যাগ্রহণ, দশটা থেকে এগারোটার মধ্যে দুর্গের দরজাও বন্ধ হয়ে যেত। ওপরের তথ্য থেকে দেখা যাচ্ছে ইউরোপীয়রা বাংলাদেশে সকাল বিকাল কাজ করত; দুপুর ও সন্ধ্যাবেলা বিশ্রামে কাটাত। সাধারণত ইউরোপ থেকে জাহাজ এলে এদের কাজের চাপ পড়ত আবার জাহাজ ফিরে যাবার সময় হলে কাজ থাকত। জাহাজগুলি জুন থেকে আগষ্ট মাসের মধ্যে বাংলায় আসত; আবার নভেম্বর থেকে জানুয়ারীর মধ্যে এদেশ ছেড়ে চলে যেত। ইউরোপীয় কর্মচারীদের বছরে ছমাস বেশি কাজ করতে হত। অন্য সময় তারা কোম্পানীর রুটিন কাজ—ক্রয় বিক্রয় নিয়ে থাকত। কোম্পানীগুলির রপ্তানিযোগ্য পণ্য কেনা এবং আমদানী করা পণ্য বিক্রি করাই ছিল তাদের প্রধান কাজ। অপর কাজ হল হিসাব রাখা। কোম্পানীর কর্মচারীরা পণ্য ক্রয় বিক্রয়ে অবৈধভাবে অর্থোপার্জন করত। পণ্য ক্রয়ের জন্য ইউরোপীয় কোম্পানীগুলি এদেশীয় বণিকদের সঙ্গে চুক্তিবদ্ধ হত (investment)। কর্মচারীরা নিজেদের বেনিয়ান ও গোমস্তাদের সঙ্গে এ চুক্তি করে কমিশন নিত। তাছাড়া এদেশীয় বণিকরা পণ্য সরবরাহ করার পর মূল্য নির্দ্ধারণে তাদের হাত থাকত। এসময়ও তারা বনিক, পাইকার ও দালালদের কাছ থেকে উৎকোচ গ্রহণ করত।

ইউরোপীয় বণিকরা বিকাল ও সন্ধ্যা বেলা নানারকম আমোদ-প্রমোদ ও সামাজিক মেলামেশায় কাটাত। তিন উপনিবেশের ইউরোপীয়দের কাছেই নৌকা নিয়ে গঙ্গাবক্ষে ভ্রমণ অত্যন্ত আকর্ষণীয় ছিল। অনেক সময় ছুটির দিনে কলকাতার ইংরাজদের বেশির ভাগই একসঙ্গে নৌকাবিহার করত। গভর্ণর ও কাউন্সিলের সদস্যরা এরকম নৌকাবিহারে অংশ নিত। শিকার ও মাছ ধরা এদের অবসর যাপনের অন্য দিক। কলকাতা শহরের আশে পাশেই শূয়োর

৫। কনসালটেশনস্ ২২শে আগষ্ট, ১৭৫৪, ডেসপ্যাচ টু দি কোর্ট, ৭ই ডিসেম্বর, ১৭৫৪।

ও লেপার্ড ঘুরে বেড়াত। শিকারীদের শিকারের জন্য বেশিদূর যেতে হত না। নানারকম পাখিশিকার এদের অবসর বিনোদনের সহায় হত। বিকালবেলা অনেকে পালকি ও 'চাইসে' নিয়ে বাগান ও মাঠে ঘুরে বেড়িয়ে সময় কাটাত। কলকাতা, চন্দননগর ও চুঁচুড়াতে ঘুরে বেড়ানোর মত অনেকগুলি মাঠ ছিল। কলকাতার উত্তরদিকে বাগবাজারে পেরিনের বাগান কোম্পানীর কর্মচারীদের আমোদ-প্রমোদ, খেলাধুলার জন্য ব্যবহৃত হত।[৬] কোম্পানীর পক্ষ থেকে এজন্য এখানে থাকার ঘর, সিঁড়ি ও অন্যান্য সুযোগ সুবিধা করে দেওয়া হয়েছিল। বহু ইউরোপীয় বণিক এসব কিছুই না করে মদের দোকানে গল্প গুজব করে আর জুয়া খেলে সময় কাটাত। মিসট্রেস ডমিংগো এ্যাশের 'পারলারে' অনেকের সান্ধ্য বিনোদন হত।

ইউরোপীয় বণিকরা তিনটি শহরেই চার্চ বানিয়েছিল। কলকাতার সেণ্ট অ্যান, চন্দননগরে সেণ্ট লুই এবং চুঁচুড়ায় পুরাতন ওলন্দাজ চার্চ। সকলেরই জানা ইংরাজ ও ওলন্দাজরা প্রটেস্টাণ্ট মতাবলম্বী আর পর্তুগীজ ও ফরাসিরা ক্যাথলিক মতের সমর্থক। কলকাতায় পর্তুগীজদের একটি রোমান ক্যাথলিক চার্চ ছিল। কোম্পানীগুলির ইউরোপীয় কর্তারা কর্মচারীদের নৈতিক ও ধর্মজীবনের ওপর নজর রাখতেন। প্রতি উপনিবেশ ও বাণিজ্য কুঠীতে ধর্মযাজক রাখার নির্দেশ ছিল। ইংরাজরা আবার শিক্ষক রাখার ওপর জোর দিত। ধর্মযাজকদের কাজ হল সকাল সন্ধ্যায় প্রার্থনা পরিচালনা করা, রবিবারের বিশেষ প্রার্থনা সংগঠিত করা, তরুণদের ধর্মোপদেশ দেওয়া, বাণিজ্য কুঠীতে ঘুরে ঘুরে ইউরোপীয়দের ধর্ম পথে রাখা। বিবাহ দেওয়া ও অন্ত্যেষ্টিক্রিয়া সম্পন্ন করা এদের অন্যান্য কাজ। এসময় প্রায়ই ধর্মযাজকের পদ শূন্য থাকত। সেক্ষেত্রে গভর্ণর বা তার মনোনীত প্রতিনিধি প্রার্থনা পরিচালনা করতেন। ইংরাজ কোম্পানীর কর্তৃপক্ষ প্রার্থনায় যোগদান করার ওপর খুব জোর দিতেন। রবিবারের প্রার্থনা অনেকটা রাস্ট্রীয় উৎসবের মত হত। চার্চের প্রার্থনা সামাজিক মেলামেশা এবং মহিলাদের সঙ্গে অন্তরঙ্গ হওয়ার সুযোগ এনে দিত। কলকাতার ধর্মযাজকরা রোমান ক্যাথলিক পর্তুগীজদের প্রটেস্টাণ্ট ধর্ম মতে দীক্ষিত করার চেষ্টা করতেন। মিশনারী কিয়েরনাণ্ডার 'সোসাইটি ফর দি প্রোমোশন অব ক্রিশ্চয়ান নলেজের' অর্থানুকূল্যে

৬। ১৭৪৬ খ্রীষ্টাব্দ থেকে এ বাগান খুব কমই ব্যবহৃত হত। ১৭৫২ নাগাদ এর ভগ্নদশা। ইংরাজ ঈস্ট ইন্ডিয়া কোম্পানী বাগান বিক্রির সিদ্ধান্ত নেয়। হলওয়েল ২৫০০ টাকায় বাগান কিনে নেন। ডাব্লিউ. এইচ. কেরী, 'গুড ওল্ড ডেজ অব অনারেবল জন কোম্পানী' ১ম খন্ড, পৃঃ ৪৬।

কলকাতায় এরকম চেষ্টা চালিয়েছিলেন। সাধারণভাবে ধর্মযাজকরা এযুগে বাংলাদেশে ইউরোপীয় সংস্কৃতির ধারক ও বাহক। জ্ঞানের দীপশিখাটুকু তারাই জ্বালিয়ে রেখেছিলেন।

এ সময়ে ভারতবর্ষের ইউরোপীয়দের ধর্ম জীবন সম্পর্কে চলতি রসিকতা হল ওরা আসার পথে উত্তমাশা অন্তরীপে ধর্ম রেখে আসে ; ফেরার পথে ওখান থেকে তুলে নেয়। তাদের ব্যক্তিগত ধর্মজীবন যাই হোক না কেন বিদেশী বণিকদের এ সময়কার ধর্মজীবনের এক উজ্জ্বল দিক হল পরধর্ম সহিষ্ণুতা। আলেকজাণ্ডার হ্যামিলটন কলকাতার ধর্মজীবনের পরিচয় দিতে গিয়ে একথা উল্লেখ করেছেন।[৭] তিনি লিখেছেন কলকাতার ইংরাজরা সকল ধর্মমতকে সহ্য করে। একমাত্র ব্যতিক্রম হল প্রেসবিটেরিয়ান ধর্মমত। রোমান ক্যাথলিকরা তাদের চার্চে পুতুল সাজিয়ে রাখে ; হিন্দুরা প্রতিমা নিয়ে শোভাযাত্রা বের করে। ইসলাম ধর্মাবলম্বীদেরও ধর্মাচরণে কোন বাধা নেই। চন্দননগরে দ্য আলবার্ট এরকম ধর্মীয় সহনশীলতা দেখেছিলেন। এখানে রোমান ক্যাথলিক ছাড়া ক্যাপুচিন ও জেসুইটদের চার্চ তিনি দেখেছিলেন। তাঁর লেখায় হিন্দুদের প্যাগোডা বা মন্দিরের উল্লেখ আছে, বহু জাতি ও ধর্মের মিলনস্থল এগুলি। তাঁর 'জার্ণালে' পর্তুগীজ, আর্মেনীয় ও মুরদের কথা উল্লেখ করতে ভোলেননি।[৮] এ যুগে ধর্মীয় অসহিষ্ণুতার একটি মাত্র নজির আছে। ১৭৫৭ খ্রীষ্টাব্দে ইউরোপীয় যুদ্ধের পট-ভূমিকায় কলকাতা কাউন্সিল তাদের উপনিবেশে পর্তুগীজ রোমান ক্যাথলিকদের ধর্মাচরণের ওপর কিছু কিছু বিধিনিষেধ আরোপ করেছিল। রোমান ক্যাথলিক যাজকদের কলকাতায় থাকতে দেওয়া হবে না বলে জানিয়ে দেওয়া হয়। সহধর্মী ফরাসী রোমান ক্যাথলিকদের পর্তুগীজরা সাহায্য করতে পারে এ আশঙ্কাতে কাউন্সিল উপরোক্ত ব্যবস্থা নিয়েছিল।

তিনটি বিদেশী উপনিবেশের আর এক সাধারণ বৈশিষ্ট্য হল এদের মধ্যে যোগাযোগ রক্ষাকারী ভাষা (lingua franca)। এ ভাষা হল খানিকটা বিকৃত পর্তুগীজ। পর্তুগীজ কলকাতার কথ্য ভাষা। ইংরাজ ইস্ট ইণ্ডিয়া কোম্পানীর চাকরি নিয়ে যারা কলকাতায় আসত তাদের সবাইকে বাধ্যতামূলকভাবে কিছুটা পর্তুগীজ ভাষা শিখতে হত। তিনটি উপনিবেশের মধ্যে যোগাযোগ ও ইউরোপীয় বণিকদের মধ্যে কথাবার্তায় পর্তুগীজ ব্যবহৃত হত। এ যুগের

৭। আলেকজাণ্ডার হ্যামিলটন, 'ভয়েজ টু দি ইস্ট ইণ্ডিজ', ২ খণ্ড, পৃঃ ১৩-১৪।
৮। এস. সি. হিল, ঐ, পৃঃ ১৪-১৫।

কলকাতায় ইংরাজ ও পরিচারকদের মধ্যে ব্যবহৃত ভাষা পর্তুগীজ। বিদেশী বণিকরা এদেশের ভাষা শেখার চেষ্টা করত। ইস্ট ইণ্ডিয়া কোম্পানীর কর্তৃপক্ষ নানারকম প্রলোভন দেখিয়ে তার কর্মচারীদের হিন্দুস্থানি ও ফারসী শেখার জন্য উৎসাহিত করত। এরা অনেকে হিন্দুস্তানি রপ্ত করত কিন্তু ফারসী শেখা সহজ হত না। কলকাতায় এ যুগে ফারসীর ভাল শিক্ষক ছিল না। ভাল শিক্ষকের অভাবে এ ভাষা আয়ত্ত করতে অনেক সময় লাগত।

এ যুগের কলকাতার রাস্তাঘাট, ঘর বাড়ি ইউরোপীয়দের মনঃপূত হত না। প্রায়ই রাস্তা ঘাটে মানুষ ও পশুর শব পড়ে থাকত। নর্দমা থাকত সব সময় আবর্জনাপূর্ণ। শহরগুলিতে পানীয় জল সরবরাহের ব্যবস্থা গড়ে ওঠেনি। গরমের দিনে পাখা ও খসখসের বাবস্থা তখনো হয়নি। ইংরাজ কোম্পানীর রাইটাররা দুর্গের মধ্যে লভ্ রোতে থাকত। প্রথম দিকে একসঙ্গে খাওয়া, থাকা, প্রার্থনা—অনেকটা অক্সফোর্ডের কলেজ জীবনের মত। লভ রো[৯] (এ যুগের রাইটার্স বিল্ডিংস্) ছিল অস্বাস্থ্যকর ও স্যাঁতসেতে। বাংলাদেশে ইউরোপীয় কোম্পানীর কর্মচারীরা প্রথম থেকেই বিলাস ও আড়ম্বরপূর্ণ জীবনের দিকে ঝুঁকত। ১৭১৩ খ্রীষ্টাব্দ থেকে ইংরাজ কোম্পানীর ব্যয় সঙ্কোচের জন্য সাধারণ খাবার টেবিল উঠে গেল। সবশ্রেণীর কর্মচারী ভদ্রলোকের জীবন যাপনে আগ্রহী হল। কর্মচারীরা বিশেষ করে বিবাহিতরা ভাড়া বাড়িতে থাকা শুরু করল। প্রত্যেকে পালকি, ঘোড়া, ক্রীতদাস, চাকর, পরিচারক রাখতে লাগল। এ সময় কলকাতা কাউন্সিলের গভর্নরের চাকরের সংখ্যা আশি। উচ্চপদস্থরা সঙ্গে তরবারি রাখত। অনেক সময় সামাজিক সম্মান ও মর্যাদার প্রশ্নে ডুয়েল লড়ত। এমন আড়ম্বরপূর্ণ জীবন যাপন করত যা তারা দেশে কল্পনাও করতে পারত না। এদের জীবনযাত্রার মান স্বদেশের সমসামাজিক মর্যাদাসম্পন্ন লোকদের তুলনায় নিঃসন্দেহে উঁচু ছিল বলে ধরে নেওয়া যায়। ইংরাজ কোম্পানীর কর্মচারীরা আবার নিজেদের পদমর্যাদা সম্পর্কে বড় বেশি সচেতন। এর বিন্দুমাত্র ক্ষুন্ন হবার সম্ভাবনা দেখা দিলে তারা ক্ষিপ্ত হয়ে উঠত। কোম্পানীর বহুস্তর বিশিষ্ট চাকরিতে ফ্যাক্টররা সার্জনদের ওপর মর্যাদা পেত। এ সময় একজন সার্জনের স্ত্রী ফ্যাক্টরের স্ত্রীর আগে চার্চে আসন নিয়েছিলেন বলে

৯। পুরাতন ফোর্ট উইলিয়মে—বর্তমান জেনারেল পোস্ট অফিস, রিজার্ভ ব্যাঙ্ক ও রেল অফিস—উত্তর ও দক্ষিণ ব্লকের মধ্যে সারি সারি ঘর লভ্ রো নামে পরিচিত ছিল। রাইটাররা এখানে থাকত।

ঐ ফ্যাক্টর কাউন্সিলের কাছে লিখিত অভিযোগ এনেছিলেন। এখানে মীমাংসা না হলে তিনি ব্যাপারটি বিলাতে কর্তৃপক্ষের কাছে নিয়ে যাবেন বলে শাসিয়েছিলেন। ইংরাজ কর্মচারীদের বিলাস আড়ম্বরপূর্ণ জীবন কর্তৃপক্ষ পছন্দ করতেন না। অনেক সময় এভাবে বিপুল পরিমাণে খরচ করার জন্য অনেক কর্মচারী ঋণগ্রস্থ হয়ে পড়ত। বিলাতের কর্তৃপক্ষ কর্মচারীদের সহজ, সরল সাধাসিধা জীবন যাপন করার জন্য নির্দেশ পাঠাতেন। এ নির্দেশে কর্মচারীদের পালকি চড়া বন্ধ হয়েছিল। কাউন্সিলের অনুরোধে শুধু গরম ও বর্ষার দিনগুলিতে পালকি ব্যবহার করার অনুমতি দেওয়া হয়েছিল। নানারকম সুখ সুবিধা ভোগ করা সত্ত্বেও কিন্তু কোম্পানীর কর্মচারীরা মন দিয়ে কাজ করত না। এ সময়কার ডাইরেক্টর সভার ডেসপ্যাচগুলি দেখলে কর্মচারীদের সম্পর্কে অনেক অভিযোগ চোখে পড়ে। সাধারণভাবে তিনটি অভিযোগ বারবার ঘুরে ফিরে আসে—হাতের লেখা খারাপ, কিছুই প্রায় পড়া যায় না, হিসাবে ভুল এবং বিল অব এক্সচেঞ্জে মারাত্মক ত্রুটি।

এ যুগের ইউরোপীয় উপনিবেশগুলিতে ইউরোপীয় মহিলাদের সংখ্যা খুবই কম। ইউরোপীয় পুরুষরা কোনমতে পনেরো কুড়ি বছর এ দেশে কাটিয়ে চল্লিশের আগে দেশে ফিরে বিয়ের পরিকল্পনা করত। এজন্য তারা বিয়েটা পিছিয়ে দিত। দ্বিতীয়ত, ইউরোপীয় মহিলারা বাংলাদেশে আসা এবং বসবাস করা পছন্দ করত না। প্রধান ভয় বাংলার অস্বাস্থ্যকর জলবায়ু ও গরম। এ ছাড়া, ইউরোপীয় মহিলাদের এদেশে এনে সংসার করতে খরচ হত অনেক বেশি। সমস্ত খরচ নিয়ে একজন ইউরোপীয় মহিলার বাংলাদেশে পৌঁছান পর্যন্ত খরচ হত পাঁচশো টাকা। উপনিবেশগুলিতে ইউরোপীয় কনের সরবরাহ তাই খুবই কম। এ যুগের ইংরাজ কর্মচারীদের ওপর তলায় বেশ কয়েকটি বৈবাহিক সম্পর্ক স্থাপিত হতে দেখা যায়। এ প্রসঙ্গে রাসেল, ফ্রাঙ্কল্যাণ্ড এবং আয়ারদের মধ্যে বৈবাহিক সম্পর্কের কথা উল্লেখ করা যেতে পারে। ইউরোপীয় কনে বিয়ে করা তদানীন্তন বাংলার বিদেশীদের কাছে এক সামাজিক মর্যাদার প্রশ্ন হয়ে দাঁড়িয়েছিল। এদের বিয়ে করার জন্য বিদেশীদের মধ্যে রীতিমত প্রতিযোগিতা চলত। যিনি ইউরোপীয় পত্নী যোগাড় করতে পারতেন না তিনি সামাজিক মর্যাদায় কিছুটা পিছিয়ে পড়তেন।

এযুগের ইউরোপীয় বণিকদের বাংলা দেশে অনেক অসুবিধা ভোগ করতে হত। শহর গুলিতে ভাল ঘোড়দৌড়ের মাঠ ছিল না। এসপ্লানেড, হোটেল,

টাউন হল এবং থিয়েটারও ছিল না। একজন অজ্ঞাতনামা বণিকের বিবরণীতে জানা যায় যে এ যুগের কলকাতায় দেশী ও বিদেশীদের মধ্যে গান বাজনার চলন ছিল। ড্রাম ও ভায়োলিন বাজিয়ে একদল বালক খাজা ইস্রায়েল সারহাদের বাড়িতে তাকে আপ্যায়িত করেছিল।[১০] তার প্রতিবেদন থেকে আরো জানা যায় কণ্ঠ ও যন্ত্র উভয় সঙ্গীতই উঁচু স্তরের হয়নি। এযুগে কলকাতায় সঙ্গীতের গুণগত মান বেশ নীচু ছিল বলে মনে হয়। কলকাতা চন্দননগর ও চুঁচুড়াতে অসংখ্য মদের দোকানে দেশী বিদেশী মদ খাওয়া, ইউরোপীয়দের পারিবারিক এবং সামাজিক কোন্দল ও বিরোধ নিয়ে মুখরোচক আলোচনা করা আর জাহাজের খবর নিয়ে গল্প করা এযুগের ইউরোপীয় সামাজিক জীবনের অন্য আর একদিক।[১১]

সমকালীন ব্যক্তিদের বিবরণী থেকে জানা যায় এ যুগে কলকাতার স্বাস্থ্য মোটেই ভাল ছিল না। বাংলা দেশে স্বাস্থ্যকর স্থান হিসাবে নদীয়া ও কাশিম-বাজারের সুনাম ছিল। গভর্ণর জন রাসেল স্বাস্থ্যোদ্ধার করার জন্য ডাক্তারের পরামর্শে নদীয়াতে গিয়েছিলেন। শতাব্দীর শুরুতে ইউরোপীয় উপনিবেশগুলিতে হাসপাতাল দেখা যায়। হ্যামিলটন কলকাতার হাসপাতাল সম্পর্কে গুরুত্বপুর্ণ মন্তব্য করেছেন। তিনি লিখেছেন 'ইংরাজ ইস্ট ইণ্ডিয়া কোম্পানীর কলকাতাতে একটি সুন্দর হাসপাতাল আছে। কিন্তু হাসপাতালে অপারেশনের জন্য যারা ভর্তি হয় ফিরে এসে হাসপাতালের গল্প করা তাদের ভাগ্যে ঘটে না।' প্রথম দিকে বাংলা দেশে ইউরোপীয়দের মৃত্যুর হার বেশী হত। হ্যামিলটন এক বছরে আগষ্ট থেকে জানুয়ারী মাসের মধ্যে বারোশ ইংরাজের মধ্যে চারশো ষাট জনের মৃত্যুর খবর দিয়েছেন। কলকাতার বিদেশী বণিকরা নানারকম অসুখে ভুগত। সেদিক থেকে চন্দননগর ও চুঁচুড়াতে অসুখ বিসুখ অনেক কম—স্বাস্থ্য অপেক্ষাকৃত ভাল। ১৭৫৭ খ্রীষ্টাব্দে ডাক্তার এডওয়ার্ড ইভস্ কলকাতার রোগীদের এক সমীক্ষা চালিয়েছিলেন। তিনি স্কারভি, যকৃৎ ও প্লীহার অসুখ, নানারকম পেটের অসুখ, বাত, সর্দি ও নানা যৌনরোগ লক্ষ্য করেছিলেন। তাছাড়া ছিল নানারকম জ্বর। ঐ বছর কলকাতায় ১১৪০ জন রোগীর মধ্যে ১৫৩ জন মারা যায়। এসময় ইউরোপীয়দের মধ্যে একটি সাধারণ রোগ হল পালসি। মদ্যপান করার পর ঠাণ্ডা লাগলে এ রোগ হত। দেশ থেকে সদ্য আগত

১০। উইলসন, ২য় খণ্ড, (প্রথম অংশ) পৃঃ ৩৮৩।

১১। বিদেশী মদ-মদেরা, সাইডার, কারলেট এবং পোর্ট আর দেশী মদ হল এ্যারাক।

বণিক ও নাবিকদের মধ্যে মৃত্যুহার বেশি হত। শতাব্দীর শুরু থেকে পলাশী পর্যন্ত যে সমস্ত ইংরাজ বাংলাদেশে এসেছিলেন তাদের মধ্যে ৫০ থেকে ৭৫ শতাংশ এদেশেই মারা গেছেন। বিলাতের ডাইরেক্টর সভা কলকাতার হাসপাতাল সম্পর্কে যথেষ্ট আগ্রহ দেখাতেন।[১২] রোগীদের নিয়মিত ওষুধ ও পথ্য দেওয়া, হাসপাতাল পরিষ্কার রাখা এবং ডাক্তারদের নিয়মিত রোগী দেখার ওপর তারা জোর দিয়েছিলেন। কলকাতার কাউন্সিলকে তারা নির্দেশ পাঠিয়েছিলেন যেন একজন সদস্যকে প্রতিসপ্তাহে হাসপাতাল পরিদর্শনের জন্য নিযুক্ত করা হয়। এ সময়ে কলকাতার অধিবাসীদের চিকিৎসার জন্য ইউরোপীয় ডাক্তার পাওয়া যেত। খরচ খুব বেশি পড়ত। ডাক্তাররা ফিস্ হিসাবে মোহর চাইতেন, পালকি চড়ে রোগী দেখতে যেতেন। এ যুগে ওষুধের দামও খুব বেশি। ইংরাজ ডাক্তাররা ডাক্তারির চেয়ে কোম্পানী চাকরি বেশি পছন্দ করত। ওতেই আয় হত বেশি। ডাক্তার হলওয়েল ডাক্তারি ছেড়ে কোম্পানীর চাকরি নিয়েছিলেন। তাঁর চেনা ওয়েস্টন জানিয়েছেন হলওয়েলের মত একজন ভাল সার্জন তিনমাস চিকিৎসা করে ও ওষুধ দিয়ে মাত্র পঞ্চাশ টাকা রোজগার করতে পেরেছিলেন। ডাক্তারিতে ভবিষ্যৎ নেই দেখে ওয়েস্টনও কোম্পানীর চাকরি নিয়েছিলেন।[১৩]

ইওরোপীয় উপনিবেশগুলির আর এক সাধারণ বৈশিষ্ট্য হল ইউরোপীয়দের জন্য আলাদা বিচার ও আইনের ব্যবস্থা। চন্দননগরে কোম্পানীর ইজারাদার ইন্দ্রনারায়ণ চৌধুরী কোম্পানীর পক্ষে এদেশীয়দের কাছ থেকে রাজস্ব আদায় করতেন। তাছাড়া, বাজার পরিদর্শন, শান্তিরক্ষা এবং এদেশীয়দের বিচারের অনেকখানি তার হাতে ছিল। ইউরোপীয়দের অপরাধের বিচার হত ইউরোপীয় আইনে। গভর্ণর ও কাউন্সিল বিচারালয় হিসাবে কাজ করত। চুঁচুড়া ও কলকাতাতে বিচার ও আইন অনেকটা একই ধাঁচের। ১৭২৭ খ্রীষ্টাব্দে কলকাতায় করপোরেশন প্রতিষ্ঠিত হয়। একজন মেয়র ও ৯ জন অল্ডারম্যান নিয়ে এ প্রতিষ্ঠান গড়ে ওঠে। ঠিক একই সময়ে এখানে মেয়রের আদালত প্রতিষ্ঠিত হল। রাজবিদ্রোহ ছাড়া অন্য সকল প্রকার অপরাধের বিচার করার ব্যবস্থা এখানে ছিল। এই নতুন আদালতের ব্যবস্থার জন্য একটি কারাগার ও

১২। কোর্টের চিঠি, ৮ই জানুয়ারী, ১৭৫২, ৩রা মার্চ, ১৭৫৮; জে. লঙ্, ঐ, পৃঃ ১৬৪-১৬৫।
১৩। এযুগে কলকাতার ডাক্তারদের মধ্যে ওয়ারেন, হ্যামিলটন, ফুলারটন, জর্জ গ্রে, এডওয়ার্ড ইভস্ প্রভৃতি নাম পাওয়া যায়। ফরাসি ডাক্তার হলেন দ্যুবো ও লা পাজ।

টাউন হল নির্মাণ করা হয়। ১৭৩৩ খ্রীষ্টাব্দে জেলের অপর দিকে কলকাতার কলেকটরের গৃহ নির্মিত হয়।[১৪]

এসময়ে কলকাতার প্রশাসনিক দায়িত্ব কলকাতার জমিদার বা কলেকটরের উপর ; কলেকটরের কাজ ছিল চার রকমের। (১) কর ধার্য্য ও সংগ্রহ করা। এর অধীনে কর সংগ্রাহকগণ ও কেরাণীরা থাকতেন। তারা কর সংগ্রহ করে হিসাব প্রস্তুত করতেন। কলেকটর এ হিসাব কাউন্সিলে পেশ করতেন। (২) কলেকটর কলকাতার শাসন কর্তা, তার অধীনে ছিল পুলিশ বাহিনী। কর্তৃপক্ষ ইউরোপীয়দের মধ্যে দস্যু প্রকৃতির লোক ধরা পড়লে দেশে পাঠিয়ে দিতেন। ইউরোপীয় উপনিবেশগুলির আশে পাশে অনেক ইউরোপীয় দস্যুবৃত্তি করত। এরা উপনিবেশগুলির শান্তি নষ্ট করত। এদেশীয় দস্যু, চোর, ডাকাত ধরা পড়লে তপ্ত লৌহ শলাকা দিয়ে দাগ দিয়ে (branding) গঙ্গার অপর পারে চালান করার নিয়ম ছিল। অথবা কয়েদ করে রাখা হত। এদেশের ইউরোপীয়দের মধ্যে মাঝে মাঝে মারামারি লেগে যেত। কলকাতায় এ ঘটনা প্রায়ই ঘটত। ১৭১৩ খ্রীষ্টাব্দের আগস্ট ও ডিসেম্বর মাসে এরকম ঘটনা ঘটে পরপর দুটি। তাতে দুজন নিহত হয়। কলকাতায় অপরাধের সংখ্যা খুব বেশি। উপনিবেশের বিভিন্ন স্থানে দস্যু ও ঘাতকের সংখ্যা নেহাত কম ছিল না। এদেশীয়দের জন্য প্রশাসন শান্তি ও নিরাপত্তার তেমন ব্যবস্থা করতে পারেনি। তবে তুলনামূলকভাবে ইউরোপীয়দের জীবন ও সম্পত্তি অপেক্ষাকৃত নিরাপদ ছিল। (৩) কলেকটরের অপর কাজ হল ছোট খাট বিচার। সাধারণত তিনি এদেশীয়দের বিচার করতেন। কাছারিতে অপরাধীদের ধরে এনে বা নিজেই পুলিশ বাহিনী নিয়ে ঘটনাস্থলে হাজির হয়ে বিরোধের নিষ্পত্তি করতেন। (৪) কলেকটরের সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ কাজ হল বাজার পরিদর্শন। বাজারে মাপ ও ওজন পরীক্ষা করা, বিক্রয়যোগ্য পণ্যের গুণগতমান বজায় রাখা এবং বাজারের ওপর সবসময় নজর রাখা তার কর্তব্য বলে বিবেচিত হত। ১৭২৬ খ্রীষ্টাব্দের চার্টার এ্যাক্টে গভর্ণর ও কাউন্সিল কলকাতার সর্বোচ্চ বিচারালয়।[১৫] তাছাড়া ছিল ১৭৫৩ খ্রীষ্টাব্দে প্রতিষ্ঠিত কোর্ট অব রিকোয়েষ্ট। এরা ছোট খাট বিরোধের বিচার করত।

১৪। যোগীন্দ্রনাথ সমাদ্দার, 'ইংরাজদের কথা', পৃঃ ৯৪। বর্তমান লালবাজারে তখনকরা জেলখানা ছিল।

১৫। গভর্ণর ও কাউন্সিল কোর্ট অব রেকর্ড, কোয়াটার সেসনস্ কোর্ট এবং কোর্ট অব ওইয়ার ও টার্মিনার হিসাবে কাজ করত। কেরী, ঐ, পৃঃ ২৭২।

বাংলার বিদেশী বণিকদের সামাজিক জীবনের আর এক উল্লেখযোগ্য দিক হল মানবিক, দাতব্য ও সেবামূলক অনেকগুলি প্রচেষ্টার সূত্রপাত। ধর্মযাজকরা কলকাতার ভবঘুরে ও অনাথদের জন্য চ্যারিটি স্কুল খুলেছিলেন। এটাই সম্ভবত কলকাতায় এদেশীয়দের জন্য ইংরাজী শিক্ষার প্রথম প্রতিষ্ঠান। রেভারেণ্ড রবার্ট ম্যাপলটফ্‌ট কলকাতা কাউন্সিলের কাছ থেকে কাপড় ও অন্যান্য সামগ্রী দান হিসাবে নিয়ে অনাথ ও দরিদ্রদের মধ্যে বিতরণ করতেন। কলকাতা কাউন্সিল কলকাতার দরিদ্র ব্রাহ্মণদেরও আর্থিক সাহায্য দিত। ১৭৫৫ খ্রীষ্টাব্দে ৪০ জন ব্রাহ্মণ মোট ১০১৩ টাকা সাহায্য পেয়েছিল।[১৬] কোম্পানীর কোন কর্মচারী অকস্মাৎ মারা গেলে তার পরিবার বর্গকে সাহায্য দেওয়ার ব্যবস্থা ছিল। তাছাড়া সাধারণভাবে কোন দুস্থ মহিলা কোম্পানীর সাহায্যপ্রার্থী হলে তাকেও বিমুখ করা হত না। দাতব্য ও সেবামূলক কাজগুলি ধর্মযাজকরা পরিচালনা করতেন। ঝড়ে, দুর্ভিক্ষে বা অন্য কোনো প্রাকৃতিক বিপর্যয়ে এরা গরীবদের মধ্যে খাদ্য ও বস্ত্র বিতরণ করতেন।

বণিক হ্যামিলটন ও যাজক বেঞ্জামিন এ্যাডামস্ অষ্টাদশ শতাব্দীর প্রথম দিককার কলকাতা জীবনের যে আলেখ্য উপস্থাপন করেছেন তা তেমন উজ্জ্বল নয়। এ্যাডামস্ ধর্মপ্রাণ মানুষ। এ যুগের বিদেশী বণিকদের নৈতিক অধঃপতন ও অধার্মিকতা তাঁকে পীড়া দিয়েছিল। হ্যামিলটন লিখেছেন কলকাতার ইংরাজরা জাঁকজমকের সঙ্গে খুশীতে দিন কাটায়। সামাজিক মেলামেশায় দাম্ভিকতা ও বাদানুবাদ কম। সকলেই সামাজিক সম্পর্ক বজায় রাখায় আগ্রহী। স্কটল্যাণ্ডবাসীদের মধ্যে এ আগ্রহ আরো বেশি। ইউরোপীয়দের মধ্যে বেশির ভাগ এ দেশীয় মহিলা ও পর্তুগীজ উপপত্নী বা পত্নী গ্রহণ করত। হ্যামিলটন বরানগর কুঠীতে ওলন্দাজদের নৈতিক জীবনের চরম অবক্ষয় লক্ষ্য করেছিলেন। এ যুগে ইউরোপীয় বণিকদের নৈতিক মান উঁচু স্তরের নয়। উচ্চতম গভর্ণর থেকে কনিষ্ঠতম কেরানী পর্যন্ত সকলের বিরুদ্ধে উৎকোচ গ্রহণ এবং অবৈধ অর্থোপার্জনের অভিযোগ দেখা যায়। গর্ণভর ওয়েন্টডেন তাঁর পত্নী ও কন্যার মাধ্যমে উৎকোচ গ্রহণ করতেন বলে অভিযোগ আছে। ডুপ্লে চন্দননগরে বিপুল ব্যক্তিগত ব্যবসা গড়ে তুলেছিলেন। ভারতবর্ষে তিনি মোট পঁচিশ লক্ষ টাকা উপার্জন করেছিলেন। কলকাতার কলেক্টর এবং পে মাষ্টার অফিসে নানা-প্রকার দুর্নীতিমূলক কাজকর্ম হত। ১৭১০ খ্রীষ্টাব্দে পে মাষ্টার জোসিয়া চিট্টি এবং

১৬। কনসালটেশনস্ ২৭শে অক্টোবর, ১৭৫৫, লণ্ড্, ঐ, পৃঃ ৭৪।

তার সহযোগী গণেশরামকে দুর্নীতির অভিযোগে শাস্তি দেওয়া হয়।[১৭] এ যুগে মদ্যপান এবং চারিত্রিক স্খলন কোম্পানীর কর্মচারীদের মধ্যে ব্যাপকভাবে দেখা দিয়েছিল। কোম্পানীর ডাইরেক্টর সভা এ নিয়ে রীতিমত দুশ্চিন্তা প্রকাশ করত।

ইংরাজ ঈস্ট ইণ্ডিয়া কোম্পানীর উচ্চপদস্থ কর্মচারীদের দুর্নীতির নজির কম নয়। কাশিমবাজার কুঠীর প্রধান স্টিফেনসন কোম্পানীর দালাল কান্তুর কাছ-থেকে অবৈধভাবে অনেক টাকা আত্মসাৎ করেছিলেন। রাসেলও ঐ একই কাজ করেছিলেন। এ যুগে গভর্ণর হেনরি ফ্রাঙ্কল্যাণ্ড এবং ডীন অবৈধভাবে প্রচুর টাকা রোজগার করেছিলেন বলে প্রমাণ আছে। ক্লাইভ কর্তৃক উমিচাঁদকে ঠকানোর কাহিনী সকলের জানা। অথচ এই উমিচাঁদ নবাব সিরাজুদ্দৌলার কাছে ইংরাজদের সত্যবাদিতা সম্পর্কে অনেক কথা বলেছিলেন। ভাগ্যের নিষ্ঠুর পরিহাসে সেই সত্যপ্রিয়তার পরিচয় পাওয়ার পর পাগল হয়ে তিনি মারা গেলেন।[১৮] এরূপ অসংখ্য দৃষ্টান্ত দেওয়া কঠিন নয়। এ সব সত্ত্বেও বিদেশীরা সকলেই নৈতিক দিক দিয়ে অধঃপতিত ছিলেন এরূপ সিদ্ধান্ত করা ঠিক হবে না। সমকালীন ব্যক্তিদের অনেকে ইংরাজ, ফরাসি ও ওলন্দাজদের মধ্যে অনেক সদ্‌গুণের পরিচয় পেয়েছিলেন। অনেকে এদেরকে শান্ত, আন্তরিক, পরিশ্রমী, দয়ালু ও বিশ্বস্ত বলেছেন। রিয়াজের লেখক ইংরাজদের প্রগতিশীল, বিশ্বস্ত, সহনশীল ও মর্যাদাপূর্ণ বলে উল্লেখ করেছেন।[১৯]

এ সময়কার ইংরাজ, ফরাসি ও ওলন্দাজদের সৈন্যবাহিনী বহু জাতির মিশ্রনে গঠিত। এদের বাহিনীতে ছিল ইংরাজ, ফরাসী, ওলন্দাজ পর্তুগীজ, ইতালীয়, জার্মান, সুইজারল্যাণ্ডের অধিবাসী ও স্ক্যাণ্ডিনেভিয়ার লোকেরা। এদের মধ্যে সবচেয়ে উল্লেখযোগ্য সাধারণ বৈশিষ্ট্য হল আনুগত্যের অভাব। এদের অনেকেই সামান্য কিছু ঘটলে চাকরি ছেড়ে দিয়ে অন্য বাহিনীতে যোগ দিত। ক্লাইভ চন্দননগরের গভর্নর মঁশিয়ে রেনোর কাছে ফরাসি বাহিনীতে ব্রিটিশ সৈনিক নেওয়ার বিরুদ্ধে প্রতিবাদ জানিয়েছিলেন। এ যুগে বাংলাদেশে ইউরোপীয় সৈনিকদের জীবন খুব সুখের হত না। জলবায়ু ও রাস্তাঘাট তেমন ভাল না।

১৭। উইলসন, দ্বিতীয় খণ্ড, প্রথম অংশ, পৃঃ ৬৫।

১৮। সিলেক্ট কমিটি প্রসিডিংস, ২৫শে ফেব্রুয়ারী, ১৭৫৭। জালিয়াতির অভিযোগে নন্দকুমারের ফাঁসি হয়েছিল ; উমিচাঁদের সঙ্গে জালিয়াতি করে ক্লাইভ লর্ড উপাধি পেলেন।

১৯। 'রিয়াজ', পৃঃ ৪১৪।

খাদ্য সরবরাহ এবং বেতন প্রায়ই অনিশ্চিত হয়ে উঠত। প্রভুরা প্রতিশ্রুতি দিয়ে ভঙ্গ করতেন। আর সৈনিকরা সহজেই চাকরি ছাড়ত এবং আদেশ অমান্য করত। মাঝে মাঝে ইউরোপীয় সৈনিক ও অফিসাররা বিদ্রোহ করে বসত। ইংরাজ ও ফরাসি সেনাবাহিনীতে এ ঘটনা হামেশাই ঘটত। লুণ্ঠনের আশা এ যুগে সৈনিকের কাজের একমাত্র পুরস্কার। এরকম নৈতিক অবক্ষয়ের যুগে সৈনিকদের একটি উজ্জ্বল মানবিক আচরণের ঘটনা উল্লেখ করা যেতে পারে। ক্লাইভ যেদিন চন্দননগর দখল করেন সেদিন ইংরাজ বাহিনীর হাতে মঁশিয়ে নিকোলাস নামে একজন ধর্মপ্রাণ নিরীহ ফরাসি ভদ্রলোকের সর্বস্ব লুঠ হয়ে যায়। এ ঘটনা জানার পর ক্লাইভের বাহিনীর অফিসার ও সৈনিকরা ১২০০ পাউণ্ড চাঁদা তুলে ঐ ভদ্রলোককে পৌঁছে দেন। ইউরোপীয় সেনাবাহিনীর এ মানবিক আচরণ এ যুগের ইতিহাসে একটি উজ্জ্বল দৃষ্টান্ত হিসাবে চিহ্নিত হয়ে আছে।

স্বদেশ থেকে দূরত্ব এবং ইউরোপীয় বণিকদের সংখ্যাল্পতা বিদেশীদের এদেশীয় জীবনের দিকে আকর্ষণ করেছিল। শতাব্দীর শুরুতে কলকাতায় ইউরোপীয়দের সংখ্যা বারো'শ, চন্দননগরে পাঁচ'শ এবং চুঁচুড়ায় পাঁচ'শর কিছু বেশি। সুদূর ইউরোপে যখন খুশী ফিরে যাওয়ার উপায় ছিল না। সে যুগে যাতায়াতের এমন সুবিধা হয় নি। যাতায়াতে খরচও হত খুব বেশি। তাই আস্তে আস্তে নানা কর্মোপলক্ষ্যে এদেশীয়দের সঙ্গে তারা মিশেছেন। এদেশীয়দের বেশভূষা, আহার পানাভ্যাস, রীতিনীতির কিছু কিছু অনুকরণ শুরু হয়। বেনিয়ানদের অনুকরণে কোর্তা ও ইজের পরা এবং এ দেশের খাদ্যদ্রব্য গ্রহণ শুরু হল। পান খাওয়া, হুকা টানা এবং গান বাজনা শোনা অভ্যাস হয়ে যেত। স্ট্যাভোরিনাস চুঁচুড়াতে ওলন্দাজ গভর্ণরের ভোজ সভায় প্রত্যেকের সামনে তিনি হুকা দেখেছিলেন। সমসাময়িক সাক্ষ্যে দেখা যায় ডুপ্লের মত গম্ভীর ও বিচক্ষণ ব্যক্তি খালি গা, মাথায় ছাতা এবং বেহালা হাতে নিয়ে অল্প বয়স্ক বন্ধুদের সঙ্গে রাস্তায় তামাশা ও রঙ্গ কৌতুকে যোগ দিচ্ছেন। বহু বাড়ির দরজায় তাঁকে রঙ্গ তামাশা করতে দেখা যেত।[২০]

এ দেশের শাকসব্জি, মাছ, পশু পাখির মাংস ও নানা রকম খাদ্য শস্য ইউরোপীয়দের ভোজ্য তালিকায় স্থান পেয়েছিল। ১৬৬৬ খ্রীষ্টাব্দে তাভার্নিয়ের চুঁচুড়াতে ওলন্দাজদের সঙ্গে এক ভোজ সভায় মিলিত হয়েছিলেন। তাঁকে এ দেশের অনেক খাদ্য পরিবেশন করা হয়েছিল। ওলন্দাজদের বাগানে

২০। জে. লঙ্, 'ব্যাঙ্কস্ অব দি ভাগীরথী'।

তিনি নানা রকম সব্জি ও ডালের চাষ দেখেছিলেন। কলকাতায় ইংরাজদের বাগানে নানারকম সব্জি ও পুকুরে (লালদিঘীতে) মাছের চাষ হত। এগুলির বেশির ভাগ গভর্ণরের খাবার টেবিলে স্থান পেত। বাঙালী জীবনের বহিরাবরণের সঙ্গে ইউরোপীয়দের পরিচয় ঘটেছিল। অন্তর্নিহিত ধর্ম, জীবনবোধ, জীবনদর্শন, সামাজিক ব্যবস্থা তাদের অজানা থেকে যায়। এরা হিন্দুদের ভীরু, কুসংস্কারাচ্ছন্ন পৌত্তলিক এবং মুসলমানদের নিষ্ঠুর, সাহসী, অসচ্চরিত্র বিধর্মী বলে মনে করত। সাধারণভাবে ভারতীয়দের এরা 'ব্ল্যাকি', 'ব্ল্যাক ফেলো' এবং 'ব্ল্যাক স্কাউন্ড্রেল' বলে উল্লেখ করত। ভারতীয়দের সম্পর্কে ধারণা অস্বচ্ছ। বেশির ভাগটাই অজ্ঞতা ও ইউরোপীয় ধ্যান ধারণার বাধা-নিষেধ প্রসূত মানসিকতা। অপেক্ষাকৃত অনুন্নত জাতি সম্পর্কে বিদ্বেষ এবং জাতিগত শ্রেষ্ঠত্বের অভিমান এ যুগে স্পষ্ট হয়নি। শ্বেতবর্ণের শ্রেষ্ঠত্ব সম্পর্কে অতি সচেতনতা বা অতি মাত্রায় স্পর্শ-কাতরতা নেই।[২১] ইউরোপের যুক্তিবাদ, বৈজ্ঞানিক দৃষ্টি, বুদ্ধি বিভাজন, ধর্ম নিরপেক্ষ জীবনের আদর্শ এ যুগের ইউরোপীয়দের মধ্যে প্রতিফলিত হয়নি। সমস্ত রকম কর্তৃত্বও বন্ধন থেকে মুক্তি, মানব ও প্রকৃতি সম্পর্কে নব নব অনুসন্ধিৎসা বণিক মনোবৃত্তিধারী ইউরোপীয়দের মধ্যে খুঁজে পাওয়া যায় না।

২১। স্পীয়ার, পার্সিভাল, 'দি নাবোবস্', পৃঃ ১২৯।

তালিকা ১

ইংরাজ ঈস্ট ইন্ডিয়া কোম্পানীর এদেশীয় কর্মচারীদের বেতন

১৭০৩—১৭০৪

সংখ্যা	পদ	মাসিক বেতন	টাকা	আনা	মাথাপিছু	টাকা	আনা
১	কোতয়াল	,,	৪		,,	৪	
৪	কেরাণী	,,	১৮	৮	,,	৪	১০
১৫	পিওন	,,	৩১		,,	২	১
১০	পাইক	,,	১৫	৮	,,	১	৯
৪	করসংগ্রাহক	,,	৬	৪	,,		৯
১	ড্রামার এবং পাইপার	,,	১	১২	,,	১	১২
১	হালালখোর	,,		১২	,,		১২
১	শিকদার	,,	৩	৪	,,	৩	৪
৩	মণ্ডল	,,	৬		,,	২	
১	পাটওয়ারি	,,	২		,,	২	
১	ভাঁকিল	,,	৫		,,	৫	
৮	কাহার	,,	৮		,,	১	
১৭১০			সমুদ্রে			নদীতে	
১	সারেঙ্গ	,,	১০		,,	৬	+চাউল
১	টানডেল (জাহাজের ছোট অফিসার)	,,	৮		,,	৫	,,
১	লস্কর (নাবিক)	,	৫		,,	৩	,,

১৭২৭ কলকাতার মেয়র কোর্টের কর্মচারীদের বেতন

		মাসিক বেতন	টাকা	আনা
১	দোভাষী	,,	২০	
১	দেশী কোর্ট সার্জেণ্ট	,,	২	৪
১	অল্ডারম্যান	,,	১৫	
১	ইউরোপীয় কোর্ট সার্জেণ্ট	,,	১০	
১	ব্রাহ্মণ	,,	৩	৪
১	মেথর	,,	১	
১	ক্যাশিয়ার .	,,	৫	

সূত্র ঃ ডায়েরি এণ্ড কনসালটেশন বুক, ফোর্ট উইলিয়ম, ডিসেম্বর ১৭০৩, নভেম্বর ১৭০৪ ১২ই ডিসেম্বর, ১৭১০, উইলসন, ঐ, প্রথম খণ্ড, পৃঃ ২১৯-২২৫, দ্বিতীয় খণ্ড (প্রথম অংশ), পৃঃ ১, রেঃ জে, লঙ্‌, 'আনপাবলিশড্ রেকর্ডস্‌...', পৃঃ ৪২, ৫৪,৬২।

তালিকা ২

ইংরাজ ঈস্ট ইণ্ডিয়া কোম্পানীর ইউরোপীয় কর্মচারীদের বেতন

১৭১৮-১৭১৯

পদ	বার্ষিক বেতন	পাউণ্ড	ভাতা/পাউণ্ড
গভর্ণর	,,	৪০	২০০
কাউন্সিলর	,,	৪০	
চ্যাপলেন	,,	৫০	
সিনিয়র মার্চেণ্ট	,,	৪০	
জুনিয়র মার্চেণ্ট	,,	৩০	১ পাউণ্ড = ৮ সিক্কা টাকা + ১২½% বাট্টাসহ = ৯ চালানি টাকা।
সাব-একাউন্ট্যাণ্ট	,,	৪০	
ডাক্তার	,,	৩৬	
ফ্যাক্টর	,,	১৬	
রাইটার	,,	৫	

১৭১৮-১৭১৯ কোম্পানীর সৈন্যবাহিনীর বেতন তালিকা

পদ	মাসিক বেতন	টাকা
মেজর	,,	৬৫
লেফটেন্যাণ্ট	,,	৩৫
এনসাইন	,,	২৪
সেলস্ম্যান ছোট আর্মস	,,	২০
সার্জেণ্ট মেজর	,,	২০
মার্শাল	,,	২০
সার্জেণ্ট	,,	২০
কবপোরাল	,,	১৩
ড্রাম মেজর	,,	২০
ড্রামার	,,	১৩
ইউরোপীয় সৈনিক	,,	১০
রাউণ্ডার	,,	৬
পর্তুগীজ	,,	৫

১৭০০ খ্রীষ্টাব্দ থেকে ১৭১৩ খ্রীঃ মে মাস পর্যন্ত কোম্পানীর সেনাবাহিনী ছয় মাস পরপর বেতন পেত। ১৭১৩ খ্রীঃ মে মাস থেকে তাদের মাসিক বেতন দেওয়ার ব্যবস্থা হয়। ১৭৫৭ খ্রীষ্টাব্দ পর্যন্ত কোম্পানীর ইউরোপীয় কর্মচারীরা ছয় মাস অন্তর বেতন পেত। ১৭০০-১৭৫৭ পর্যন্ত কোম্পানীর কর্মচারীদের মূল বেতন একই ছিল। ভাতা বেড়েছিল অনেক বেশি। আহার, বাসস্থান, চাকর, জল প্রভৃতির জন্য এরা নানারকম ভাতা ভোগ করত।

সূত্র : উইলসন, ঐ, তৃতীয়খণ্ড, পৃঃ ২২, ২৩, প্রসিডিংস, ৩রা অক্টোবর, ১৭৫৭, রেঃ জে. লঙ্, ঐ, পৃঃ ১২৭-১৩০ ; মাষ্টার রোল, জানুয়ারী ১৭১৮, জুন, ১৭১৯, উইলসন, ঐ তৃতীয়খণ্ড, পৃঃ ৯।

দ্বাদশ অধ্যায়

উপসংহার

বাংলাদেশে বসবাসকারী সমকালীন অনেক ব্যক্তি ঐ যুগের সামাজিক ও আর্থিক জীবনের অনেক তথ্য আমাদের উপহার দিয়েছেন। ইংরাজ. ফরাসি ও ওলন্দাজদের মধ্যে অনেকে পরবর্তী প্রজন্মের জন্য ডায়েরি, স্মৃতিকথা, জার্ণাল, বিবরণী ইত্যাদি রেখে গেছেন। এদের অনেকের লেখা উদ্দেশ্য প্রণোদিত। ইউরোপের পাঠক সামনে রেখে বা তাদের কথা ভেবে এরা লেখনী চালিয়েছেন। তবে এদের মধ্যে অনেকে (যেমন আলেকজাণ্ডার ডাও) বাংলার সমাজ ও অর্থনীতির সহানুভূতিশীল পর্যবেক্ষক। অনেকে বিশেষ রাজনৈতিক উদ্দেশ্য নিয়ে লিখেছেন। এ দেশের রাস্ট্র ব্যবস্থা হেয় প্রতিপন্ন করা এদের উদ্দেশ্য। হলওয়েল, কর্ণেল স্কট প্রমুখরা বার বার প্রমাণ করার চেষ্টা করেছেন এ দেশের হিন্দুরা মুসলিম শাসনে বিরক্ত হয়ে মুক্তির পথ সন্ধান করছিল। মুসলিম শাসনের প্রতি তাদের বিন্দুমাত্র আনুগত্য বা আন্তরিক টান ছিল না। পলাশীর যুদ্ধ শুধু হিন্দু নয় এ দেশের সমস্ত শ্রেণীর মানুষের কাছে আশীর্বাদস্বরূপ। যদুনাথ সরকার মহাশয়ও এ রকম মত ব্যক্ত করেছেন। পলাশীর যুদ্ধে বাংলাদেশে মধ্য যুগের অবসান এবং নতুন যুগের সূর্যোদয়ের সূচনা।[১] পলাশীর পর থেকে বিভিন্ন ঐতিহাসিক, রাজনৈতিক, আর্থিক ও সামাজিক কারণে নবযুগের সূচনা হয়েছে এ কথা সত্য। এ বিষয়ে দ্বিমতের অবকাশ নেই।

যেজন্য এ ভূমিকার অবতারণা সেটা হল সমসাময়িক ইংরাজ লেখকদের মধ্যে রবার্ট ওরমে, হলওয়েক, ওয়াটস্ স্ক্র্যাফটন প্রমুখ ইংরাজরা উদ্দেশ্যমূলকভাবে একটি 'মিথ' তৈরি করার চেষ্টা করেছেন। এ মিথের সারমর্ম হল প্রাক্-পলাশী যুগে—মুর্শিদকুলী খাঁ থেকে সিরাজুদ্দৌলা পর্যন্ত—(১) বাংলাদেশে ভাল শাসন ছিল না। অত্যাচার হত। (২) নবাবরা জোরজবরদস্তি করে টাকা আদায় করতেন এবং (৩) হিন্দুদের ওপর নির্যাতন হত। প্রথম অভিযোগ এ যুগে বাংলাদেশে ভাল শাসন ছিল না। সমসাময়িকদের সাক্ষ্য-এর সঙ্গে মেলে না। সলিমুল্লাহ্, গোলাম হোসেন, করমআলি, গোলাম হোসেন সলিমও ইউসুফ আলি সকলেই সাক্ষ্য দিচ্ছেন মুর্শিদকুলী দেশের মধ্যে চোর ডাকাতের

১। যদুনাথ সরকার সম্পাঃ 'হিস্টি অব বেঙ্গল', দ্বিতীয় খণ্ড, অধ্যায় ছাব্বিশ, চতুর্থ অংশ।

উপদ্রব বন্ধ করেছিলেন। উপদ্রুত এলাকায় থানা বসিয়ে তাঁর বিশ্বস্ত কর্মচারী মুহম্মদ জানের হাতে চোর ডাকাত শায়েস্তা করার ভার দিয়েছিলেন। বাংলার জমিদাররা রাস্তাঘাট ও নদীপথে যাতায়াত ও পণ্য চলাচল নিরাপদ রাখতে সমর্থ হয়েছিলেন। ১৭৫৩ খ্রীষ্টাব্দে একজন ইংরাজ ভদ্রলোক লিখছেন বাংলার বণিকরা এক, দুই বা তিনজন পিওনের হাতে এক প্রান্ত থেকে অপর প্রান্তে সোনা রূপো পাঠাতেন।[২] সুজাউদ্দিনের শাসন কাল সম্পর্কে সমসাময়িক সকলেই উচ্ছ্বসিত। জন শোর তাঁর শাসন কালের প্রশংসায় পঞ্চমুখ। শোরের মতে, 'জনগণের মঙ্গলের জন্য তাঁর প্রশাসন কাজ করে যেত।'[৩] গোলাম হোসেন লিখেছেন 'দরিদ্রতম বিচারপ্রার্থী তাঁর সম্মুখে নিজেকে নবাব পুত্রের সমকক্ষ মনে করত। বাজপায়ী তাড়িত ভীত, সন্ত্রস্ত চড়ুই অগাধ বিশ্বাসে তাঁর বুকে আশ্রয়ের আশায় ছুটে যেত। ইতিহাসের সঙ্গে পরিচয় আছে এমন লোকেরা মনে করত তারা নওশেরওয়ার রাজত্বে বাস করছেন।'[৪] এর মধ্যে অতিরঞ্জন আছে, তবে এ ধারণা সর্বাংশে মিথ্যা বলে মনে করার কোনো যুক্তিসঙ্গত কারণ নেই। মারাঠা আক্রমণের সময় বাংলাদেশে শান্তি ছিল না। তবে মারাঠা আক্রমণের শেষে জীবনের শেষ পর্বে (১৭৫১-১৭৫৬) আলিবর্দী বাংলার জনগণের সুখ ও শান্তি রক্ষার জন্য আপ্রাণ চেষ্টা করেছিলেন বলে সমকালীন ব্যক্তিরা সাক্ষ্য দিচ্ছেন।

দ্বিতীয় প্রধান অভিযোগ হল এ যুগে বাংলার নবাবরা অত্যাচারী। ব্যক্তিগত স্বার্থে জোর জবরদস্তি করে জনসাধারণের কাছ থেকে টাকা আদায় করতেন। বাংলা রাজ্যের আর্থিক কাঠামোর যে বিশ্লেষণ এ গ্রন্থে করা হয়েছে তাতে এ অভিযোগ ভিত্তিহীন বলে প্রমাণ করা মোটেই কঠিন নয়। মুর্শিদকুলী রাজস্ব আদায়েয় ব্যাপারে খুব কঠোর ছিলেন। সম্রাটের আর্থিক দুরাবস্থা লাঘব করার জন্য তাঁকে কঠোর হতে হয়েছিল। বাংলা রাজ্যের আর্থিক জীবনে বিশৃঙ্খলা এসেছিল বলে সমকালীন সাক্ষ্য প্রমাণ আছে। বিশৃঙ্খলা থেকে শৃঙ্খলায় যেতে হলে একটু বাড়াবাড়ি সরাদেশে সব যুগে ঘটে থাকে। মুর্শিদকুলীর অপরাধ এটুকু, আদৌ যদি একে অপরাধ বলে গণ্য করা হয়। মুর্শিদকুলীর সারা জীবনের সঞ্চয়, আগেকার সুবাদারদের তুলনায় অনেক কম।[৫] তিনি নির্ধারিত রাজস্বের বেশি এক কপর্দকও আদায় করেননি। অন্য সব রকম বেআইনি কর রহিত

২। মার্শাল, ঐ, পৃঃ ৩১।
৩। যদুনাথ সরকার, ঐ, অধ্যায় বাইশ।
৪। গোলাম হোসেন, 'সিয়ার', প্রথম খণ্ড, পৃঃ ৩২৫।
৫। এ ব্যাপারে সলিমুল্লাহ্‌র বর্ণনা অনেকখানি অতিরঞ্জিত।

করেছিলেন। ব্যয় সঙ্কোচ করে রাষ্ট্রের কোষাগারে উদ্বৃত্ত দেখিয়েছিলেন। আলিবর্দী মারাঠা আক্রমণের ফলে আর্থিক দিক দিয়ে পর্যুদস্ত হয়ে পড়েছিলেন এ সময় তিনি বাংলার ধনী জমিদার এবং বিদেশীদের কাছ থেকে আর্থিক সাহায্য নিয়েছিলেন। একজন সমসাময়িক ইংরাজ ভদ্রলোক হিসাব করে দেখিয়েছেন বাংলার নবাবরা বিভিন্ন সময়ে নানা কৌশল অবলম্বন করে ইংরাজদের কাছ থেকে যে টাকা আদায় করেছিলেন তা তাদের বাংলা বাণিজ্যের দু শতাংশের বেশি নয়। মনে রাখতে হবে ইংরাজ কোম্পানী মাত্র তিন হাজার টাকার বিনিময়ে এ সময়ে বাংলাদেশে বিনাশুল্কে বাণিজ্য করত। তাদের কর্মচারীরা ব্যক্তিগত ব্যবসার জন্য রাষ্ট্রীয় কোষাগারে এক পয়সা দিত না। উপরন্তু এদেশীয় বণিকদের কাছে অবৈধভাবে কোম্পানীর দস্তক বিক্রি করে নবাবের রাজস্ব ফাঁকি দিত। ফরাসি ও ওলন্দাজরা ২½ শতাংশ হারে বাণিজ্যশুল্ক দিত। সুজাউদ্দিন ও আলিবর্দী অবৈধভাবে জবরদস্তি করে জনগণের কাছ থেকে রাজস্ব আদায় করেছিলেন বলে প্রমাণ নেই। তাঁরা জমির ওপর অতিরিক্ত সুবাদারি আবওয়াব বসিয়েছিলেন। এ ক্ষেত্রে মনে রাখা দরকার ১৭২২ খ্রীষ্টাব্দে মুর্শিদকুলীর বন্দোবস্তের পর বাংলার ভূমি রাজস্ব আর বাড়ানো হয়নি। অন্তর্বর্তীকালে বাংলার চাষবাস ও লোকসংখ্যা বেড়েছিল। সে কারণে ভূমি রাজস্ব বৃদ্ধি মোটেই অসঙ্গত নয়। এ যুগের বাড়তি ভূমি রাজস্ব আবওয়াব সম্পর্কে শোরের মন্তব্য স্মরণ করা যেতে পারে। বাড়তি বাণিজ্য ও বিদেশী টাকার যোগান থাকায় 'the resources of the country were, at that period, adequate to the measure of exaction'. এ-যুগের পরিচয় দিতে গিয়ে ভেরেলস্ট লিখছেন: 'কৃষক স্বচ্ছন্দ, কারিগর উৎসাহিত, বণিক ধনশালী ও শাসক সন্তুষ্ট।' এ বর্ণনায় খানিকটা অতিরঞ্জন আছে ঠিকই, তবে এর বেশির ভাগ সত্য।

তৃতীয় অভিযোগ হল হিন্দুদের ওপর নির্যাতন। মুর্শিদকুলির বিরুদ্ধে হিন্দু-নির্যাতনের দুটি অভিযোগ আছে। তিনি বাংলার হিন্দু-জমিদারদের অনেককে সময়মত খাজনা দিতে না পারায় ইসলাম-ধর্ম গ্রহণে বাধ্য করেছিলেন। এ অভিযোগ দেখা যায় সলিমুল্লাহ্‌'র 'তারিখ-ই-বাঙ্গালা' গ্রন্থে।[৬]

সলিমুল্লাহ্‌ তাঁর বক্তব্যের সমর্থনে একটিও উদাহরণ দেন নি। অন্য কোনো সমকালীন গ্রন্থে মুর্শিদকুলীর এ মনোভাবের উল্লেখ নেই। মুর্শিদকুলীর স্বপক্ষে

৬। সলিমুল্লাহ, ঐ, হিস্ট্রি অব বেঙ্গল, ২য় খন্ড অধ্যায় একুশ।

বক্তব্য হল চুণাখালির হিন্দু জমিদার বৃন্দাবন সামান্য অপরাধে প্রধান কাজী সরফ কর্তৃক মৃত্যুদণ্ডে দণ্ডিত হন। মুর্শিদকুলী এই হিন্দু জমিদারের প্রাণ রক্ষার জন্য সম্রাট আরঙ্গজেবের কাছে আবেদন করেছিলেন।[৭] তাঁর বিরুদ্ধে দ্বিতীয় অভিযোগ তিনি মুর্শিদাবাদের আশেপাশের হিন্দুমন্দির ভেঙ্গে কাটরায় নিজের সমাধি ও মসজিদ বানিয়েছিলেন। এ অভিযোগও সম্পূর্ণ সত্য নয়। এ ব্যাপারে ভারপ্রাপ্ত অফিসার মুরাদ ফরাস কিছু বাড়াবাড়ি করেছিলেন বলে মনে হয়। তবে মুর্শিদাবাদের কাছাকাছি প্রখ্যাত হিন্দুমন্দিরগুলি অক্ষত ছিল। মুর্শিদাবাদের দু মাইলের মধ্যে কিরীটেশ্বরী মন্দিরের অক্ষত অবস্থিতি এর প্রমাণ। আলিবর্দীর বিরুদ্ধে ভুবনেশ্বরে হিন্দুমন্দির লুণ্ঠনের অভিযোগ আছে। ভারতচন্দ্র 'অন্নদামঙ্গলে' এ অভিযোগ এনেছেন। ভারতচন্দ্র ব্রাহ্মণ জমিদার কৃষ্ণচন্দ্রের সভাকবি। আলিবর্দী কৃষ্ণচন্দ্রকে বাকি খাজনার দায়ে কয়েদ করেছিলেন। সেজন্য ভারতচন্দ্রের রুষ্ট হওয়ার যথেষ্ট কারণ ছিল। গঙ্গারাম 'মহারাষ্ট্র পুরাণে' মুস্‌লিম শাসনের বিরুদ্ধে বাংলার হিন্দুদের ক্ষোভের কথা উল্লেখ করেছেন। হিন্দুদের উদ্ধার করার জন্য মারাঠাদের বাংলায় আগমনের কথাও আছে। গঙ্গারাম 'ত্রাণকর্তাদের' নির্বিচার হত্যা, লুণ্ঠন ও অগ্নিকাণ্ডের কথা জানিয়ে লিখেছেন 'বাংলার হিন্দুরা বিপন্ন মুসলিম শাসনের পেছনে দাঁড়িয়ে মারাঠাদের এদেশ থেকে তাড়ানোর জন্য লড়াই করেছিল'। সুতরাং দেখা যাচ্ছে সমকালীন ইংরাজদের আনীত অভিযোগগুলির মধ্যে সত্য সামান্য, মিথ্যার ভাগ বেশি।

মুর্শিদকুলী থেকে সিরাজুদ্দৌলা পর্যন্ত বাংলার নবাবরা রাষ্ট্রীয় প্রশাসনে নিয়োগের ক্ষেত্রে যে নীতি অনুসরণ করেছিলেন তা তাদের পরমতসহিষ্ণুতা ও উচ্চ রাষ্ট্রীয় আদর্শকে তুলে ধরে। মুর্শিদকুলী এ নীতির স্রষ্টা। সলিমুল্লাহ লিখেছেন মুর্শিদকুলী বাঙালী হিন্দু ছাড়া আর কাউকে রাজস্ব বিভাগে চাকরি দিতেন না। সলিমুল্লাহ এর দুটি কারণ দেখিয়েছেন। হিন্দুরা ভীতু, সরল ও নিরীহ। রাজস্ব-বিভাগে এরা টাকা তছরূপ করলে বা উৎকোচ গ্রহণ করলে সহজেই সে টাকা বার করা যাবে। দ্বিতীয়ত, এদের কাছ থেকে তাঁর কর্তৃত্বের ওপর আঘাত আসার সম্ভাবনা নেই। আধুনিক ইতিহাসবিদরা বলছেন উত্তর ও

৭। বৃন্দাবন তাঁর বাড়ির সম্মুখে এক উন্মাদ ফকিরের খেলনা মস্‌জিদ ভেঙ্গে ছিলেন। ঐ এ অপরাধে তাঁর প্রাণদণ্ড হয়। প্রধান কাজী সরফ নিজেই বৃন্দাবনের প্রাণদণ্ড কার্যকরী করেছিলেন। বৃন্দাবনের প্রাণদণ্ড নিয়ে সম্ভবত মুর্শিদকুলীর সঙ্গে প্রধান কাজীর মনোমালিন্য দেখা দেয়েছিল। এ ঘটনার পরেই কাজী সরফ বাংলার প্রধান বিচারকের পদ ত্যাগ করেন।

পশ্চিম ভারত থেকে বাংলা প্রশাসনে লোক নেওয়া এ সময় কার্যত বন্ধ হয়ে যায়। উত্তর ও দক্ষিণ ভারতে নতুন নতুন রাজবংশের প্রতিষ্ঠা এর একটা কারণ। বিভিন্ন কারণে পারস্য, পশ্চিম এশিয়া ও আফগানিস্তান থেকে বিদেশীদের বাংলাদেশে আগমন অনেক কমে যায়। সেজন্য মুর্শিদকুলী বাংলার প্রশাসনে বাঙালী হিন্দুদের নিয়োগ করতে বাধ্য হয়েছিলেন। এ যুক্তি সর্বাংশে সত্য মনে হয় না। এটা আংশিক কারণ হতে পারে। আসল কারণ হল বাংলায় প্রায় স্বাধীন নবাবী প্রতিষ্ঠার পর স্থানীয় প্রতিভাকে অস্বীকার করা তিনি রাষ্ট্রের পক্ষে মঙ্গলজনক মনে করেন নি। সুজাউদ্দিন বাংলার হিন্দু-মুসলমান উভয় সম্প্রদায়কে সমান চোখে দেখেছিলেন। তাঁর বিরুদ্ধে সমসাময়িক কোনো ব্যক্তি বা লেখক কোনো রকম পক্ষপাতিত্বের অভিযোগ আনেননি। হিন্দু উৎপীড়নের কোনো অভিযোগ তাঁর বিরুদ্ধে নেই। গোলাম হোসেন লিখেছেন আলিবর্দী ছিলেন বাংলাদেশের হিন্দু-মুসলমান যৌথপরিবারের প্রধান। হিন্দুদের প্রতি তাঁর পক্ষপাতিত্ব একটু বেশি। বেসামরিক ও সামরিক উভয় বিভাগেই তিনি হিন্দুদের নিয়োগ করেছিলেন। মুর্শিদকুলীরও কয়েকজন হিন্দু সেনাপতি ছিল। লাহোরি মল্ল ও দলীপ সিংহকে তিনি বিদ্রোহী হিন্দু জমিদারদের দমন করতে পাঠিয়েছিলেন। আলিবর্দীর হিন্দু সেনাপতিদের মধ্যে নন্দলাল, রাজা জানকী-রাম, দুর্লভরাম, রামনারায়ণ প্রভৃতি উল্লেখযোগ্য নাম। বাংলার নবাবরা হিন্দুদের শুধু বেসামরিক প্রশাসনে নিযুক্ত করতেন এ ধারণা ঠিক নয়। এযুগে উচ্চপদস্থ রাজকর্মচারীদের সামরিক ও বেসামরিক উভয়বিধ কাজই করতে হত। উচ্চ-পদস্থ হিন্দুরা অনেকেই যুদ্ধ করেছেন। মানিকচাঁদ, দুর্লভরাম, মোহনলাল, শ্যামসুন্দর লালা এরূপ অনেক হিন্দু সেনাপতির নাম পাওয়া যায়।

আলিবর্দীর হিন্দুদের প্রতি পক্ষপাতিত্ব অনেকে অন্যভাবে ব্যাখ্যা করেছেন। প্রভুপুত্র সরফরাজ খাঁকে পরাজিত ও নিহত করে তিনি বাংলার সিংহাসন দখল করেছিলেন। সেজন্য সরফরাজ খাঁয়ের পক্ষপাতীরা প্রশাসনে থাকলে তাঁর ক্ষমতাচ্যুত হওয়ার সম্ভাবনা থাকে। এ সম্ভাবনা দূর করার জন্য তিনি বাংলার হিন্দুদের ওপর নির্ভরশীল হয়ে পড়েছিলেন। এ যুক্তির সবচেয়ে দুর্বল দিক হল আলিবর্দী নিজে ব্যক্তিগতভাবে সরফরাজ খাঁয়ের চেয়ে অনেক বেশি যোগ্য ছিলেন। তিনি সরফরাজের সেনাবাহিনীর ওপর নির্ভর করেন নি। তাঁর নিজস্ব সেনাবাহিনী ও যোগ্যতা তাঁর শাসনকে নিশ্চয়তা দিয়েছিল। কূটনৈতিক ভাবে তিনি সরফরাজ পক্ষীয়দের মোকাবিলা করেছিলেন। সুতরাং এ দুটোকে মেলানো

ঠিক নয়। সংখ্যাগুরু হিন্দুদের দূরে রেখে তিনি বাংলায় তাঁর এবং তাঁর বংশের শাসনের স্থায়িত্ব দেখেন নি।

প্রাক্-পলাশী যুগে বাংলায় মারাঠা আক্রমণ এ দেশের কৃষি ও শিল্পের ক্ষতি করেছিল। এ আক্রমণ পশ্চিম ও মধ্য বাংলায় সীমাবদ্ধ ছিল। পূর্ব ও উত্তর বঙ্গে আঘাত আসেনি। এর ফলাফলকে লঘু করে দেখা ঠিক হবে না। আবার মধ্য অষ্টাদশ শতাব্দীর সমস্ত আর্থিক ও সামাজিক দুর্গতির জন্য একে দায়ী করা আধুনিক বিজ্ঞানসম্মত ইতিহাস বিরোধী কাজ হবে। মারাঠারা পুরো দশ বছর ধরে বাংলাদেশে তাণ্ডব চালিয়েছিল। তাদের আসা যাওয়ার পথের দুধারে আগুন জ্বালিয়ে গ্রামবাসীদের ঘর-বাড়ি, শস্য গোলা এবং ক্ষেতের শস্য নষ্ট করে দিত। টাকা পয়সা, সোনা রূপো লুঠ করত। মারাঠাদের মুখে 'রূপেয়া' সর্বদাই লেগে থাকত. গঙ্গারাম লিখেছেন 'সোনা রূপা লুটে নেত্র আর সব ছাড়া'। নির্বিচারে নারী, বৃদ্ধ, শিশু হত্যা করত। বাংলার বহু হতভাগিনী নারী মারাঠাদের লালসার শিকার হল। শিবাজীর আদর্শচ্যুত মারাঠা দস্যুরা বাংলার সামাজিক জীবনে অভিশাপ বয়ে নিয়ে এল। ব্রাহ্মণ ভারতচন্দ্র এবং গ্রাম্য হিন্দু কবি গঙ্গারাম মারাঠাদের নারী নির্যাতনের কথা উল্লেখ করেছেন। ভারতচন্দ্র লিখেছেন ঃ 'লুটিয়া লইল ধন ঝিউড়ী বহুড়ী।' গঙ্গারামের মন্তব্য হল 'ভাল ভাল স্ত্রীলোক জত ধইরা লইয়া জাত্র'।[৮]

মারাঠা আক্রমণ বাংলাদেশে এমন ত্রাসের সৃষ্টি করেছিল যে মারাঠারা আসছে শুনেই বাংলার হিন্দু মুসলমান সকল শ্রেণীর লোক তাদের অস্থাবর সম্পত্তি নিয়ে নিরাপদ স্থানের উদ্দেশ্যে বেরিয়ে পড়ত। গঙ্গারাম তাঁর গ্রন্থে এ যুগের ভয় সন্ত্রস্ত, ভীত বিহ্বল মানুষের এক নিখুঁত চিত্র উপহার দিয়েছেন। অনেক সময় দেখা যেত জনরব ভিত্তিহীন ; মারাঠারা সে অঞ্চলে আদৌ হানা দেয়নি, তবুও জনসাধারণ মারাঠাদের সম্পর্কে কিছু একটা শুনলেই ভীত চঞ্চল হয়ে পড়ত। পালানোর চেষ্টা করত ('লোকের পলান দেখিয়া আমরা পলাই')। স্বয়ং আলিবর্দী ও তাঁর পরিবার পদ্মার পূর্বতীরে রাজশাহীর কাছে রামপুর বোয়ালিয়াতে অস্থাবর সম্পত্তি স্থানান্তরিত করেছিলেন। জগৎশেঠরা ধনরত্ন নিয়ে ঢাকাতে আশ্রয় নিয়েছিলেন। পশ্চিম বাংলার অন্যান্য ধনীব্যক্তিরা গঙ্গার পূর্ব তীরে তাদের ধনসম্পদ স্থানান্তরিত করেছিলেন বলে জানা যায়।

৮। ভারতচন্দ্র, 'গ্রন্থাবলী', পৃঃ ৫। গঙ্গারাম, ঐ, পৃঃ ২৪-২৫।

মারাঠা আক্রমণে বাংলার পশ্চিমাঞ্চলে কৃষি নিদারুণ ক্ষতিগ্রস্থ হয়েছিল চাষ হল না বেশ কয়েক বছর। ফলে খাদ্য শস্যের দাম বাড়ল। এ অঞ্চলের বিপন্ন মানুষ নিরাপদ স্থানে আশ্রয় লাভের উদ্দেশ্য পশ্চিম বাংলা ছেড়ে দলে দলে পূর্ব ও উত্তরবঙ্গে পাড়ি জমাল। এতে বাংলার পশ্চিম ও মধ্য-ভাগে লোকসংখ্যা কিছুটা কমে এল। অপরদিকে পূর্ব ও উত্তরদিকে লোক-সংখ্যা বাড়ল। কিছু মারাঠা পরিবার বাংলার বীরভূম, মেদিনীপুর ও বাঁকুড়া অঞ্চলে স্থায়ী বাসিন্দা হয়ে রয়ে গেল। এককালের আক্রমণকারী ও আক্রান্ত পরবর্তী প্রজন্মে পরস্পরের প্রতিবেশী হল। বাংলার শিল্পোৎপাদনের ওপর মারাঠা আক্রমণের প্রভাব হল অনেক বেশি ও গভীর। এ সময় বাংলার পশ্চিমাঞ্চলে যোগাযোগ বিচ্ছিন্ন হয়ে যায়। মারাঠারা কাঁচামাল ও বাণিজ্য পণ্য লুঠ করত। শিল্পে কাঁচামালের সরবরাহ ব্যাহত হল। অনেক সময় বিদেশী কোম্পানীর বাণিজ্য পণ্য তারা লুঠ করত। ১৭৪৮ খ্রীষ্টাব্দে মারাঠারা ইংরাজ কোম্পানীর পণ্যতরী আটক করে ৩০০ বেল কাঁচা সিল্ক লুঠ করেছিল।[১] এ যুগে বাংলার সূতী ও রেশমী বস্ত্রের উৎপাদন অনেক কমে যায়। ভাল কাঁচা-মালের অভাবে উৎপন্ন পণ্যের গুণগত মানের অবনতিও দেখা যায়। প্রতি বছর জুন থেকে অক্টোবর মাস পর্যন্ত মারাঠারা শিবিরে আশ্রয় নিত বা দেশে ফিরে যেত। এই অবসরে অল্প সময়ের মধ্যে তাঁতি ও কারিগরদের কাজ করতে হত। তাড়াতাড়ি করার ফলে উৎপন্ন পণ্য আগের মত উৎকৃষ্ট হত না। এ সময়ে ইউরোপের বাজারে এবং পশ্চিম এশিয়ার জেদ্দা, মোখা ও বসরাতে বাংলার বস্ত্র শিল্পের দুর্ণাম হয়েছিল। বাংলার সূতী ও রেশমী বস্ত্র আগের মত উন্নত মানের হলনা বা দামেও সস্তা রইল না। আড়ঙ্গুলি পরিত্যক্ত হল। মারাঠারা গঞ্জ, বাজার ও হাটগুলি লুঠ করার চেষ্টা করত। বাংলার আভ্যন্তরীণ ও বহির্বাণিজ্য ক্ষতিগ্রস্থ হয়েছিল। বিদেশে সরবরাহ অনেক কমে যায়। ইস্ট ইণ্ডিয়া কোম্পানীর কাগজপত্রে বাংলার শিল্প বাণিজ্যের ক্ষয়ক্ষতি সম্পর্কে অনেক তথ্য পাওয়া যায়। মারাঠা আক্রমণে বাংলায় মজুরের যোগান ও পুঁজি সরবরাহ ব্যাহত হয়েছিল বলে জানা যায়।

বাংলাদেশে ওলন্দাজ কোম্পানীর অধ্যক্ষ কাঁসিবুম, তাঁর স্মৃতিকথায় (১৪ই ফেব্রুয়ারী, ১৭৫৫) লিখছেন: 'মারাঠা আক্রমণে বাংলার মোট চার লক্ষ লোক

১। রবার্ট ওরমে, ঐ, দ্বিতীয় খণ্ড, পৃঃ ৪৬।

প্রাণ হারিয়েছিল। এদের বেশির ভাগ শিল্পী, কারিগর, ব্যবসায়ী ও অন্যান্য কর্মজীবী মানুষ।

এসময় থেকে বাংলাদেশে দ্রব্যমূল্য ক্রমাগত বাড়তে থাকে। এযুগে মূল্যস্তর সর্বোচ্চ সীমায় পৌঁছায় ১৭৫৩ খ্রীষ্টাব্দে। তারপর মূল্যস্তর আবার একটু নামতে শুরু করে। এযুগে মূল্যবৃদ্ধির জন্য শুধু মারাঠা আক্রমণকে দায়ী করা ঠিক হবে না। একাধিক কারণ এজন্য দায়ী। রাজনৈতিক, সামাজিক, আর্থিক ও প্রাকৃতিক কারণে দ্রব্যমূল্য বাড়তে থাকে। (১) মারাঠা আক্রমণ, বন্যা, ঝড় —উৎপাদন হ্রাস। (২) অভ্যন্তরীণ চাহিদা বৃদ্ধি মূল্যস্তরের ঊর্ধ্বগতির কারণ। এযুগে বাংলার সূতী ও রেশমী বস্ত্র, সূতো ও রেশমের চাহিদা খুব বেশি। অন্যান্য রপ্তানিযোগ্য পণ্যের জন্যও বিদেশীদের মধ্যে প্রতিযোগিতা। প্রতিযোগিতামূলক বাজারে জিনিসের দাম বাড়ে। (৩) আলিবর্দীর সময় থেকে দিল্লীতে সম্রাটের প্রাপ্য রাজস্ব পাঠানো বন্ধ হয়। আর বাংলার পণ্য কেনার জন্য বিদেশীরা প্রচুর পরিমাণে সোনা রূপো বাংলায় নিয়ে আসে। এককথায় বাংলার বাজারে টাকার যোগান অনেকখানি বেড়ে যায়। বিদেশীরা নগদ টাকায় বাংলার পণ্য কিনতে থাকে। বাংলার কৃষক, তাঁতি, কারিগরের হাতে টাকা আসে। এর সঙ্গে অভ্যন্তরীণ বাজারে খাদ্যশস্য ও ভোগ্যপণ্যের চাহিদা বাড়ে। সুতরাং ১৭৪০ খ্রীষ্টাব্দ থেকে বাংলার বাজারে জিনিস পত্রের দাম বাড়া অত্যন্ত সঙ্গতিপূর্ণ আর্থিক ঘটনা।[১০]

এযুগে বাংলার যে আর্থিক চিত্র পাওয়া যায় তাতে এদেশকে দরিদ্র মনে করার কোনো সঙ্গত কারণ নেই। এখান থেকে প্রচুর পরিমাণে সূতীবস্ত্র, রেশম চিনি ও চাল রপ্তানি করা হত। আলেকজাণ্ডার ডাও লিখেছেন 'এদেশের মানুষের খাদ্যদ্রব্যের অভাবনেই, যদিও এখাদ্য যথেষ্ট পুষ্টিকর নয়।' অর্থনীতির যে কোনো মাপ কাঠিতে প্রাক্-পলাশী বাংলাকে স্বচ্ছল বলা যায়। তবুও দরিদ্র মানুষদের একটা অংশ দুর্ভিক্ষের সময় বা আর্থিক সঙ্কটে আত্মবিক্রয় করত। স্ত্রী, পুত্র কন্যা বিক্রয়ের ঘটনাও বিরল নয়। এর একটাই কারণ—ধনবণ্টনে বৈষম্য। যারা ধনী তারা অতিমাত্রায় ধনী, যারা গরীব তারা অতি গরীব। ধনের অসম বণ্টন সমাজের নীচু তলায় অতিদারিদ্র সৃষ্টি করেছিল। দুর্ভিক্ষে, বন্যায়, ঝড়ে বা অন্য কোনো প্রাকৃতিক দুর্যোগে এরা দলে দলে মৃত্যুর সম্মুখীন হত।

১০। কে. এন. চৌধুরী, ঐ, পৃ: ১০০-১০৮।

প্রাক্-পলাশী বাংলার সঙ্গে পলাশী পরবর্তী বাংলার তুলনামূলক আলোচনা হতে পারে। পলাশী পরবর্তী কালে বাংলার প্রশাসনে উন্নতি দেখা গিয়েছিল বলে প্রমাণ নেই। বরং অবস্থার আরো অবনতি ঘটেছিল। সন্ন্যাসী ও ফকির দস্যুদের উৎপাত, চুরি, ডাকাতি আরো বেড়েছিল বলে জানা যায়। কর্ণওয়ালিশের সময় পর্যন্ত কলকাতার উপকণ্ঠে চুরি ডাকাতি লেগে থাকত। সূর্যাস্তের পর কলকাতার রাস্তায় বার হওয়া মুস্কিল হত। পলাশী পরবর্তী যুগে (১৭৫৭-১৭৭২) বাংলার অবস্থা আরো অনেক কারণে খারাপ হয়েছিল। এসময়ে ইংরাজ বণিকরা জেলার ফৌজদারকে মারধোর করে আটক করেছে এমন নজির আছে। ইংরাজ কোম্পানীর কর্মচারী রিচার্ড বীচারের সর্বজনবিদিত উক্তিটি এ প্রসঙ্গে স্মরণ করা যেতে পারেঃ 'এই সুন্দর দেশটি চরম স্বেচ্ছাচারী সরকারের অধীনেও উন্নতি করেছে; এখন সে ধ্বংসের কিনারায়।' ১৭৬২ খ্রীষ্টাব্দের ২রা মে বাংলার নবাব মীরকাশিম ইংরাজ গভর্ণর ভ্যান্সিটার্টকে যে ঐতিহাসিক চিঠিটি লিখেছিলেন তা থেকে খানিকটা উদ্ধৃতি দিলে পলাশী পরবর্তী যুগে প্রশাসনিক ব্যর্থতা ও লুণ্ঠনের স্বরূপ কিছুটা জানা যাবে। মীরকাশিম গভর্ণরকে লিখছেনঃ 'এই হল আপনার ভদ্র লোকদের ব্যবহার। আমার দেশের সর্বত্র তারা উপদ্রব করে, জনগণকে লুণ্ঠন করে আর আমার কর্মচারীদের অপমান ও জখম করে।...প্রত্যেক পরগণা, গ্রাম ও ফ্যাক্টরিতে তারা লবণ, সুপারি, ঘি, চাল, খড়, বাঁশ, মাছ, চট, আদা, চিনি, তামাক, আফিম এবং অন্যান্য অনেক জিনিস কেনা বেচা করে। আমি আরো অনেক বস্তুর নাম করতে পারি, অপ্রয়োজনবোধে বিরত হলাম। তারা বল প্রয়োগে কৃষক ও বণিকদের কাছ থেকে বিভিন্ন প্রকারের পণ্য এক চতুর্থাংশ দামে ছিনিয়ে নেয়; আবার বলপ্রয়োগ ও অত্যাচারের মাধ্যমে একটাকার জিনিসের জন্য কৃষকদের পাঁচ টাকা দিতে বাধ্য করে। আবার পাঁচটি টাকার জন্য তারা এমন একজন লোককে অপমান ও আটক করে যে এক'শ টাকা ভূমিরাজস্ব দেয়। তারা আমার কর্মচারীদের কোনো রকম কর্তৃত্ব করতে দেয় না।... প্রতি জেলাতে আমার কর্মচারীরা সমস্তরকম কাজকর্ম থেকে বিরত আছে এবং সমস্ত শুল্ক থেকে বঞ্চিত হওয়ার ফলে আমার মোট বার্ষিক রাজস্ব ক্ষতির পরিমাণ দাঁড়াচ্ছে প্রায় পঁচিশ লক্ষ টাকা।'[১১] এ হল পলাশী যুদ্ধের পাঁচ বছর পরে বাংলার অবস্থা। বাংলার

১১। অনুবাদ লেখকের।

নবাবদের 'অত্যাচারী শাসনের' চেয়ে এ শাসন ভাল নির্দ্বিধায় বলা যায় না। ১৭৬৫ খ্রীষ্টাব্দ থেকে বাংলার আর্থিক অবস্থার আরো অবনতি ঘটল। কোম্পানী দেশ থেকে সোনা রূপো আনা বন্ধ করে দিল। দেওয়ানী পাওয়ার পর বাংলার উদ্বৃত্ত রাজস্ব ঈস্ট ইণ্ডিয়া কোম্পানীর বাণিজ্য মূলধন হল। বাংলা থেকে শুরু হল আর্থিক নিষ্কাশন (economic drain)। ১৭৬৭ থেকে ১৭৭২ পর্যন্ত কোম্পানীর কর্মচারী ও সুপারভাইজররা গ্রাম বাংলায় 'নয়া জমিদার' হয়ে বসল। এদের ব্যক্তিগত ব্যবসা, উৎকোচ গ্রহণ এবং দুর্নীতি বাংলাদেশে 'ছিয়াত্তরের মন্বন্তরের' (১৭৭০) জন্য অনেকখানি দায়ী। কোম্পানীর একচেটিয়া ব্যবসা এবং কর্মচারীদের ব্যক্তিগত ব্যবসা নিত্য প্রয়োজনীয় জিনিসের দাম বাড়িয়ে দিল। লবণ, সুপারি ও তামাকের দাম অনেকখানি বেড়ে গিয়েছিল। কোম্পানী ও তার কর্মচারীদের জবরদস্তি ব্যবসায় ঢাকার তাঁতিদের ১৭৭০ দশকের পারিশ্রমিক ১৭৪০ ও ১৭৫০ দশকের পারিশ্রমিক অপেক্ষা কম হয়ে গেল। বিহারে আফিম চাষীদেরও এ দশা হয়েছিল।[১২] যে মহা দুর্ভিক্ষে বাংলার এক তৃতীয়াংশ মানুষ মারা গেল, এক তৃতীয়াংশ আবাদী জমি অনাবাদী ও জঙ্গলে পরিণত হল, বাংলার সমাজ জীবন বিধ্বস্ত হয়ে গেল, সেই দুর্ভিক্ষের বছরেও কোম্পানীর রাজস্বের পরিমাণ কিছু বাড়ল। মুর্শিদকুলীর কঠোরতা এর কাছে ম্লান হয়ে যায়। সুজাউদ্দিন ও আলিবর্দ্দীর বাড়তি ভূমি রাজস্ব অকিঞ্চিৎকর বলে মনে হয়। বাংলার রাজনৈতিক ও আর্থিক পতন পলাশী পরবর্তী যুগে শুরু হয়েছিল বলে সমকালীন বিদেশী পর্যবেক্ষকরাও মনে করেন।[১৩]

প্রাক্-পলাশী যুগে বাঙালীর মানসিক শক্তি, বুদ্ধি ও মননশীলতা সম্পর্কে দুএকটি কথা বলা প্রয়োজন। এযুগে বাঙালীর আত্মবিশ্বাস, পৌরুষ ও সাহস, দুঃসাহসিক কোনো কাজকর্মে অংশ গ্রহণের ইচ্ছা কম। সামাজিক ও আর্থিক সংস্কার, সামাজিক পরিবর্তন, নতুন কিছু উদ্ভাবন এযুগের বাংলায় দেখা যায় না। ইউরোপীয়দের কাছাকাছি থাকা সত্ত্বেও ওদের বৈজ্ঞানিক বুদ্ধি, মানবিকতা, যুক্তিবাদ, প্রগতিশীল রাষ্ট্রচিন্তা বাঙালী জীবনে প্রভাব বিস্তার করেনি। সামাজিক উন্নতির অনুকূল কোনো নতুন মূল্যবোধ বা নতুন সামাজিক ব্যবহার নীতির সাক্ষাৎ পাওয়া যায় না। ইউরোপে এসময় নতুন নতুন বৈজ্ঞানিক আবিষ্কার হচ্ছিল। নিউটন, বেকন ও লাইবনিৎস্‌কে অতিক্রম করে ইউরোপের মানুষ

১২। এন. কে. সিংহ 'দি ইকনমিক হিস্ট্রি অব বেঙ্গল,' প্রথম খন্ড, পৃঃ ১৬৭-১৬৮।
১৩। আঃ ডাও, ঐ, প্রথমখন্ড, পঃ ১০৭-১১৩।

বৃহত্তর বৈজ্ঞানিক আবিষ্কার এবং মহত্তর বুদ্ধি বিভাসার দিকে এগিয়ে যাচ্ছিল। প্রতিবেশী এশীয় দেশ চীনে উন্নত ধরনের মুদ্রণ প্রযুক্তি, আগ্নেয়াস্ত্র এবং ম্যাগনেটিক কম্পাসের ব্যবহার শুরু হয়েছিল। ঠিক একই সময়ে বাংলার মানুষ অজ্ঞতার অন্ধকারে নিমজ্জিত। চারপাশে কি ঘটেছে তার খবর রাখে না। বাংলার সংস্কৃত পণ্ডিতরা নব্যন্যায় ও অলংকারের সূক্ষ্ম বিষয় নিয়ে দীর্ঘ ও অনাবশ্যক যুক্তিজাল বিস্তার করে চলেছেন। হিন্দু বুদ্ধিজীবীরা ঈশ্বর, ইহলোক-পরলোক জীবাত্মা ও পরমাত্মার মধ্যে সম্পর্ক নিয়ে সীমাহীন, অন্তহীন বিতর্কে প্রবৃত্ত। বাংলার বৈষ্ণব পণ্ডিতরা পরকীয়া ও স্বকীয়া প্রেমের মধ্যে আপেক্ষিক শ্রেষ্ঠত্ব নিরূপণে নিয়োজিত। বাংলার মুসলিম বুদ্ধিজীবী ও বিদ্বান ব্যক্তিরা কোরাণ ও হাদিসের সমস্তরকম ব্যাখ্যা, শরিয়ত ও সুন্নার টীকা টিপ্পনী, শিয়া-সুন্নীর ধর্মাচরণে পার্থক্য, মোহাম্মদী ও হানাফিদের মধ্যে শ্রেষ্ঠত্ব নির্ণয়ে ব্যস্ত। বাইরের জগৎ যুগান্তকারী বৈপ্লবিক পরিবর্তনের অপেক্ষায়। ভাগ্যনির্ভর বাঙালীর মনোজগৎ জড়ত্বে, গতানুগতিকতায় পঙ্গুপ্রায়।

সংযোজন—১

বাংলার সুবাদারদের নামের তালিকা ১৭০০-১৭৫৭

১। আজিমুশ্‌শান, ১৬৯৭—১৭১২।
২। খান-ই-জাহান, ১৭১২—১৭১৩।
৩। ফারখুন্দা সিয়ার (সম্রাট ফারুখসিয়ারের শিশুপুত্র), ১৭১৩।
৪। মীরজুমলা (অনুপস্থিত), ১৭১৩—১৭১৬।
৫। মুর্শিদকুলী খাঁ, ১৭১৭—১৭২৭।
৬। সরফারাজ খাঁ, জুলাই-আগষ্ট, ১৭২৭।
৭। সুজাউদ্দিন খাঁ, সেপ্টেম্বর ১৭২৭—মার্চ, ১৭৩৯।
৮। সরফারাজ খাঁ, মার্চ ১৭৩৯—এপ্রিল ১৭৪০।
৯। আলিবর্দী খাঁ, এপ্রিল ১৭৪০—এপ্রিল ১৭৫৬।
১০। সিরাজুদ্দৌলা, এপ্রিল ১৭৫৬—জুন ১৭৫৭।

ফোর্ট উইলিয়মের প্রেসিডেণ্ট ও গভর্ণরদের নামের তালিকা ঃ ১৭০০-১৭৫৭।

১। স্যার চার্লস্ আয়ার — ২৬শে মে, ১৭০০—৭ই জানুয়ারী, ১৭০১।
২। জন বিয়ার্ড — ৭ই জানুয়ারী, ১৭০১—৭ই জুলাই, ১৭০৫।

(বিয়ার্ডের পর প্রেসিডেন্টের পদে প্রতি সপ্তাহে একজন বসতেন। দুই কোম্পানীর ৮ সদস্য নিয়ে সভা। দুই প্রেসিডেণ্ট। ১৭০৪ থেকে—১৭০৯ পর্যন্ত এই রোটেশনে গভর্ণমেণ্ট চালু ছিল।)

৩। এণ্টনি ওয়েণ্টডেন — ২০শে জুলাই, ১৭১০।
৪। জন রাসেল — ৪ঠা মার্চ, ১৭১১।
৫। রবার্ট হেজেস — ৩রা ডিসেম্বর, ১৭১৪—২৮শে ডিসেম্বর, ১৭১৭।
৬। স্যামুয়েল ফীক্ — ১২ই জানুয়ারী, ১৭১৮।
৭। জন ডীন, — ১৭ই জানুয়ারী, ১৭২৩।
৮। হেনরি ফ্রাঙ্কল্যাণ্ড — ৩০শে জানুয়ারী, ১৭২৩।
৯। এডওয়ার্ড স্টিফেনসন — ১৭ই সেপ্টেম্বর, ১৭২৮।
১০। জন ডীন — ১৮ই সেপ্টেম্বর, ১৭২৮।
১১। জন স্ট্যাকহাউস — ২৫শে ফেব্রুয়ারী ১৭৩২—২৯শে জানুয়ারী, ১৭৩৯।
১২। টমাস ব্রাডিল — ২৯শে জানুয়ারী, ১৭৩৯—৪ঠা ফেব্রুয়ারী, ১৭৪৬।
১৩। উইলিয়ম বারওয়েল — ১৮ই এপ্রিল—১৭ই জুলাই, ১৭৪৯।
১৪। এ্যাডাম ডাওসন — ১৭ই জুলাই, ১৭৪৯—৫ই জুলাই, ১৭৫২।
১৫। উইলিয়ম ফিটকে — ৫ই জুলাই—৮ই আগষ্ট, ১৭৫২।
১৬। রজার ড্রেক (জুনিয়র) — ৮ই আগষ্ট, ১৭৫২—২২শে জুন, ১৭৫৮।

সংযোজন—২

সম্রাট আকবরের সময় বাংলাদেশের সরকারগুলির পরিচয়। বাংলার নবাবী আমলে এ নামগুলির বেশির ভাগ প্রচলিত ছিল।

১।	লক্ষ্মণাবতী অথবা জান্নাতাবাদ	—	মালদহ
২।	পূর্ণিয়া	—	বর্তমান বিহার রাজ্যের পূর্ণিয়া জেলা।
৩।	তাজপুর	—	পূর্ব পূর্ণিয়া এবং পশ্চিম দিনাজপুর।
৪।	পান্‌জারাহ্‌	—	দিনাজপুর।
৫।	ঘোড়াঘাট	—	দিনাজপুর, রঙ্গপুর এবং বগুড়া।
৬।	বরবকাবাদ	—	মালদহ, রাজশাহী এবং বগুড়া।
৭।	বাজুহা	—	রাজশাহী, বগুড়া, পাবনা, ঢাকা।
৮।	শ্রীহট্ট	—	শ্রীহট্ট।
৯।	সোনার গাঁ	—	পশ্চিম ত্রিপুরা এবং নোয়াখালি।
১০।	চট্টগ্রাম	—	চট্টগ্রাম।
১১।	সাতগাঁ	—	২৪ পরগণা, পশ্চিম নদীয়া, এবং দক্ষিণ-পশ্চিম মুর্শিদাবাদ।
১২।	মাহমুদাবাদ	—	উত্তর নদীয়া, উত্তর যশোহর, এবং পশ্চিম ফরিদপুর।
১৩।	খলিফতাবাদ	—	দক্ষিণ যশোহর এবং পশ্চিম বাখরগঞ্জ।
১৪।	ফতাবাদ	—	ফরিদপুর, দক্ষিণ বাখরগঞ্জ এবং মেঘনার মোহনায় দ্বীপগুলি।
১৫।	বাকলা	—	বাখরগঞ্জ এবং ঢাকা।
১৬।	টাণ্ডা	—	মুর্শিদাবাদ।
১৭।	শরিফাবাদ	—	বর্ধমান।
১৮।	সোলেমানাবাদ	—	উত্তর হুগলী এবং নদীয়া ও বর্ধমানের কিছু অংশ।
১৯।	মান্দারণ	—	পশ্চিম বীরভূম, বর্ধমান এবং পশ্চিম হুগলী।

সূত্র: ব্লকম্যান, জার্নাল অব দি এশিয়াটিক সোসাইটি অব বেঙ্গল, ১৮৭৩, প্রথম অংশ, পৃঃ ২০৯

সংযোজন—৩

রাজা রাজবল্লভ বৈশ্বদের যজ্ঞোপবীত ধারণ উপলক্ষ্যে রাজনগরে এক অনুষ্ঠান করেন। এই অনুষ্ঠানে বাংলার বিভিন্ন অঞ্চল থেকে তিনি পণ্ডিতদের আনিয়েছিলেন। তাঁর সভায় আগত পণ্ডিতদের নামের তালিকা।

রাজনগর (ঢাকা)

১। নীলকণ্ঠ সার্ব্বভৌম
২। কৃষ্ণদেব বিদ্যাবাগীশ
৩। কৃষ্ণকান্ত সিদ্ধান্ত

নবদ্বীপ

৪। গোপাল ন্যায়ালঙ্কার
৫। তিতুরাম তর্কপঞ্চানন
৬। হরদেব তর্কসিদ্ধান্ত
৭। রামকৃষ্ণ ন্যায়ালঙ্কার
৮। শিবরাম বাচস্পতি
৯। কৃষ্ণকান্ত বিদ্যালঙ্কার
১০। রাম ন্যায়বাগীশ
১১। স্মরণ তর্কালঙ্কার
১২। রামহরি বিদ্যালঙ্কার
১৩। বিশ্বনাথ ন্যায়ালঙ্কার
১৪। সদাশিব ন্যায়ালঙ্কার
১৫। কৃপারাম তর্কভূষণ
১৬। বিশ্বেশ্বর তর্কপঞ্চানন
১৭। রামকান্ত ন্যায়ালঙ্কার
১৮। রামচন্দ্র বিদ্যাবাগীশ
১৯। শঙ্কর তর্কবাগীশ

পুটিয়া

২০। রতিনাথ ন্যায়বাচস্পতি

বাঁশবেড়িয়া

২১। রামভদ্র সিদ্ধান্ত
২২। রমানাথ বাচস্পতি
২৩। আত্মারাম ন্যায়ালঙ্কার

মাটিয়ারি

২৪। জগন্নাথ তর্কপঞ্চানন
২৫। গঙ্গাধর তর্কালঙ্কার
২৬। মুরাহর বিদ্যালঙ্কার
২৭। বামকান্ত বিদ্যালঙ্কার

কোরাকাদি

২৮। শিবচরণ বাচস্পতি

অম্বিকা

২৯। অযোধ্যারাম বিদ্যাবাগীশ
৩০। কৃষ্ণরাম বিদ্যালঙ্কার

পাটুলিগ্রাম

৩১। বাসুদেব বিদ্যাবাগীশ
৩২। প্রাণকৃষ্ণ পঞ্চানন

বাক্‌লা

৩৩। কৃপারাম তর্কসিদ্ধান্ত

সৈকুল

৩৪। বলরাম ভট্টাচার্য্য
৩৫। শঙ্কর বাচস্পতি
৩৬। হরগোবিন্দ বিদ্যাবাগীশ

লোহাজঙ্গ

৩৭। উদয়রাম বিদ্যাভূষণ

চাকগ্রাম

৩৮। রমাপতি তর্কপঞ্চানন

দমদমা

৩৯। দুলাল বিদ্যালঙ্কার

৪০। পঞ্চানন ন্যায়ালঙ্কার

বর্ধমান

৪১। জগন্নাথ পঞ্চানন

৪২। শম্ভুরাম বিদ্যালঙ্কার

৪৩। মধুসূদন বাচস্পতি

৪৪। রুদ্রনারায়ণ বিদ্যাবাগীশ

৪৫। রাধাকান্ত ন্যায়ালঙ্কার

বীরভূম

৪৬। শ্রীকান্ত তর্কবাগীশ

৪৭। রামগোবিন্দ ন্যায়ালঙ্কার

সেনভূম

৪৮। হরিহর তর্কভূষণ

লেংটাখালি

৪৯। আনন্দ চন্দ্র ন্যায়বাগীশ

৫০। ত্রিলোচন ন্যায়বাগীশ

রাজবাটী

৫১। নরসিংহ বিদ্যালঙ্কার

৫২। রাজেন্দ্র বিদ্যাবাগীশ

ভূষণা

৫৩। হরিনাথ শিরোমণি

সৈয়েদাবাদ

৫৪। চিরঞ্জীব পঞ্চানন

৫৫। হলায়ুধ তর্কপঞ্চানন

৫৬। গোবিন্দরাম ন্যায়ালঙ্কার

৫৭। পীতাম্বর ন্যায়বাগীশ

ত্রিবেণী

৫৮। জগন্নাথ তর্কপঞ্চানন

৫৯। রামানন্দ ন্যায়ালঙ্কার

৬০। রামশঙ্কর বাচস্পতি।

৬১। কৃষ্ণচন্দ্র তর্কসিদ্ধান্ত

কমলপুর

৬২। বলরাম তর্কভূষণ।

মানকর—গোবরা

৬৩। রঘুরাম ন্যায়ালঙ্কার

চরগ্রাম

৬৪। রামকিশোর ন্যায়ালঙ্কার

৬৫। রাধাকান্ত ন্যায়বাগীশ

মামুদপুর

৬৬। ঘনশ্যাম তর্কালঙ্কার

৬৭। গোবিন্দরাম সার্বভৌম

৬৮। দুর্গাপ্রসাদ তর্কসিদ্ধান্ত

৬৯। রাধাকান্ত তর্কসিদ্ধান্ত

৭০। শিবপ্রসাদ তর্কপঞ্চানন

৭১। রঘুনন্দন বাচস্পতি

বাকলা

৭২। কান্ত বিদ্যালঙ্কার

৭৩। রামরত্ন বিদ্যাবাগীশ

৭৪। কালীপ্রসাদ তর্কসিদ্ধান্ত

৭৫। কালীশঙ্কর বিদ্যাবাগীশ

৭৬। লক্ষ্মীনারায়ণ সিদ্ধান্ত

৭৭। কমলাকান্ত বিদ্যাভূষণ

৭৮। জগন্নাথ পঞ্চানন
৭৯। হরিপ্রসাদ ন্যায়ালঙ্কার
৮০। পুরুষোত্তম ন্যায়ালঙ্কার
৮১। চন্দ্রশেখর তর্কসিদ্ধান্ত
৮২। মাধব সিদ্ধান্ত

বিক্রমপুর—নাওহাটি

৮৩। রামদাস সিদ্ধান্তপঞ্চানন

ধরগ্রাম

৮৪ রামকিশোর ন্যায়বাগীশ

সেনহাটি—ভগিলহাটি

৮৫। রূপরাম ভট্টাচার্য্য
৮৬। বিষ্ণুরাম ভট্টাচার্য্য
৮৭। কামদেব ভট্টাচার্য্য
৮৮। রাধাকান্ত ভট্টাচার্য্য
৮৯। রামমোহন ভট্টাচার্য্য
৯০। গঙ্গাপ্রসাদ ভট্টাচার্য্য
৯১। রাজবল্লভ ভট্টাচার্য্য
৯২। নন্দরাম ভট্টাচার্য্য
৯৩। জয়রাম ভট্টাচার্য্য
৯৪। রামকিশোর ভট্টাচার্য্য
৯৫। বীরেশ্বর ভট্টাচার্য্য
৯৬। রামশঙ্কর ভট্টাচার্য্য
৯৭। কৃষ্ণদেব ভট্টাচার্য্য
৯৮। রুক্মিণীকান্ত ভট্টাচার্য্য
৯৯। রাজারাম ভট্টাচার্য্য
১০০। বাণেশ্বর ভট্টাচার্য্য
১০১। ভবানীপ্রসাদ ভট্টাচার্য্য
১০২। রামপ্রসাদ ভট্টাচার্য্য
১০৩। রামেশ্বর ভট্টাচার্য্য
১০৪। প্রাণবল্লভ ভট্টাচার্য্য
১০৫। দেবীপ্রসাদ ভট্টাচার্য্য
১০৬। মৃত্যুঞ্জয় ভট্টাচার্য্য
১০৭। গঙ্গাপ্রসাদ ভট্টাচার্য্য

কাচাদিয়া

১০৮। রামচন্দ্র সিদ্ধান্ত পঞ্চানন
১০৯। রূপরাম ন্যায়বাগীশ

সোমকট

১১০। কৃষ্ণদাস সার্ব্বভৌম
১১১। কৃষ্ণনাথ তর্কভূষণ

থাস্তিয়া

১১২। শ্রীরাম বাচস্পতি
১১৩। কৃষ্ণদাস ন্যায়ালঙ্কার

পুরুলিয়া

১১৪। রতিরাম বাচস্পতি

সূত্র: রসিকলাল গুপ্ত, 'মহারাজা রাজবল্লভ সেন', পৃঃ ৯৯-১০৪।

সংযোজন—৪

রাজা রাজবল্লভের যজ্ঞোপবীত গ্রহণ অনুষ্ঠানে আগত ভারতবর্ষের বিভিন্ন অঞ্চলের পণ্ডিতদের নামের তালিকা।

শ্রীক্ষেত্র

১। বিন্দুহরণ মিশ্র
২। কালিকাপ্রসাদ মিশ্র
৩। দামোদর মিশ্র
৪। প্রভাকর মিশ্র
৫। দুরাদাস মিশ্র

মহারাষ্ট্র

৬। ভাস্কর পণ্ডিত

দ্রাবিড়

৭। হলায়ুধ ব্রহ্মচারী

কাশী

৮। মণিরাম দীক্ষিত
৯। শ্রীকৃষ্ণ দীক্ষিত
১০। গোবিন্দরাম দীক্ষিত
১১। গৌর দীক্ষিত

কনৌজ

১২। রসাল শুক্লা

মিথিলা

১৩। জীবনতারা ত্রিবেদী
১৪। কৃষ্ণদাস উপাধ্যায়
১৫। গিরিজা নাথ পাঠক

কাঞ্চী

১৬। কালীপ্রসাদ দোবেদী (দ্বিবেদী)
১৭। প্রভাকর চৌবেদি (চতুর্বেদী)

সূত্র : রসিকলাল গুপ্ত, 'মহারাজা রাজবল্লভ সেন', পৃঃ ৯৯-১০৪ ।

সংযোজন—৫

অষ্টাদশ শতাব্দীর প্রথম ভাগের বাংলা গদ্যের নমুনা

(১) 'জ্ঞানাদি সাধনা' একখানি সহজিয়া সম্প্রদায়ের গ্রন্থ। ১৭৫০ সনে লিখিত ইহার একখানি পুঁথির ভাষার নমুনাঃ 'পরে সেই সাধু কৃপা করিয়া সেই অজ্ঞান জনকে চৈতন্য করিয়া তাহার শরীরের মধ্যে জীবাত্মাকে প্রত্যক্ষ দেখাইয়া পরে তাহার বাম কর্ণেতে শ্রীচৈতন্য মন্ত্র কহিয়া পরে সেই চৈতন্য মন্ত্রের অর্থ জানাইয়া পরে সেই জীব দ্বারা এ দশ ইন্দ্রিয় আদি যুক্ত নিত্য শরীর দেখাইয়া পরে সাধক অভিমানে শ্রীকৃষ্ণাদির রূপ আরোপ চিন্তাতে দেখাইয়া পরে সিদ্ধি অভিমান শ্রীকৃষ্ণাদির মুক্তি পৃথক দেখাইয়া প্রেম লক্ষণার সমাধি ভক্তিতে সংস্থাপন করিলেন।'

দীনেশ চন্দ্র সেন, 'বঙ্গ সাহিত্য পরিচয়', দ্বিতীয় খন্ড, পৃঃ ১৬৩০-১৬৩৭

(২) অষ্টাদশ শতাব্দীর মধ্যভাগে কোচবিহারের রাজমুন্সী জয়নাথ ঘোষের 'রাজোপাখ্যান' গ্রন্থের ভাষার নমুনাঃ

'শ্রীশ্রী মহারাজা ভূপ বাহাদুরের বাল্যকাল অতীত হইয়া কিশোর কাল হইবাই পার্শী বাঙ্গলাতে স্বচ্ছন্দ আর খোশখত অক্ষর হইল সকলেই দেখিয়া ব্যাখ্যা করেন বরং পার্শীতে এমত খোষনবিশ লিখক সন্নিকট নাহি চিত্রেতে অদ্বিতীয় লোক সকলের এবং পশু পক্ষী বৃক্ষ লতা পুষ্প তৎস্বরূপ চিত্র করিতেন অশ্বারোহণে ও গজচালানে অদ্বিতীয়।'

দীনেশ চন্দ্র সেন, ঐ, পৃঃ ১৬৭৮

(৩) ১৭৩৪ খ্রীষ্টাব্দে পর্তুগীজ পাদরি মানওয়েল দা আসুমচাম লিখিত 'কৃপার শাস্ত্রের অর্থভেদ' গ্রন্থের বাংলার নমুনা। এ গ্রন্থ রোমান হরফে লেখা।

'লুসিয়া এত দুঃখের মধ্যে একলা হইয়া রোদন করিয়া ঠাকুরাণীর অনুগ্রহ চাহিলঃ কহিলঃ ও করুণাময়ী মাতা, আমার ভরসা তুমি কেবল; মুনিষ্যের অলক্ষ্য আছি আমি; অথচ আশা রাখি যে তুমি আমারে উপায় দিবা। আমার কেহ নাহি, কেবল তুমি আমার, এবং আমি তোমার; আমি তোমার দাসী; তুমি আমার সহায়, আমার লক্ষ্য আমার ভরসা।'

(৪) দোম এন্তোনিও নামে একজন ধর্মান্তরিত খ্রীষ্টান ১৭৪৩ খৃষ্টাব্দে লেখেন 'ব্রাহ্মণ রোমান ক্যাথলিক সংবাদ'। এ গ্রন্থের ভাষার নমুনাঃ

'রামের এক স্ত্রী তাহান নাম সীতা, আর দুই পুত্রো লব আর কুশ তাহান ভাই লক্ষোন। রাজা অযোধ্যা বাপের সত্যো পালিতে বোনবাসী হইয়াছিলেন, তাহাতে তাহান স্ত্রীরে রাবোণে ধরিয়া লিয়াছিলেন, তাহান নাম সীতা, সেই স্ত্রীরে লঙ্কাত থাক্যা আনিতে বিস্তর যুদ্দো করিলেন।'

সংযোজন—৬

প্রাক্-পলাশী যুগে বাংলার সংস্কৃত কবি ও জমিদারদের সংস্কৃত রচনার নমুনা

(১) কৃষ্ণচন্দ্রের সভাকবি গুপ্তিপাড়ার বাণেশ্বর বিদ্যালঙ্কার প্রণীত সংস্কৃত কবিতা।

(১)

সাগর সন্তুতি সন্তরণেচ্ছয়া প্রচলিতাতিজবেন হিমালয়াৎ।
ইহ হি মন্দমুপৈতি সরস্বতী-যমুনায়া বিরহাদিব জাহ্নবী ॥

(২)

শিবস্য নিন্দয়া তু যত্যেজদ্ বপুঃ স্বকীয়ম।
তদঙ্ঘ্রি পঙ্কজদ্বয়ং শবে শিবে কিমদ্ভুতম্ ॥

(২) কৃষ্ণচন্দ্রের পুত্র শিবচন্দ্রের জন্মদিনে পিতৃবন্দনা মূলক শ্লোক।

প্রজানামীশত্বাৎ সলিলনিধি কন্যাদৃতত্বয়া
বিভূত্যা যুক্তত্বাদিধিহরিমহেশৈশ্চ সমতা।
তবাস্তে ভূপৌঘার্চ্চিতচরণ তেষাং পুনরহো
ন চ ত্রিত্বং কস্মিন্ ত্বয়ি জনক নিত্যং ত্রিতয়তাং ॥

(৩) রাজা কৃষ্ণচন্দ্রের আশীর্বাদ শ্লোক।

ভক্ত্যা নির্মলয়া তথা কবিতয়া পূজোপচারাদিনা
প্রীতোহহং ভবতাং সতাং প্রতিদিনং প্রাণাধিকানাং তথা।
প্রীতির্মিত্র কলত্রসন্তুতি গনৈঃ পুত্রৈশ্চিরং জীবিভি—
স্তেষামপ্যনুবাসরং ভবতু সা যুষ্মাসু ভক্তিঃ স্থিরা ॥

(৪) মধ্যম রাজকুমারের সংস্কৃত কবিতা।

ভূদেবেন্দ্রং মহীন্দ্রং গুণগণনিলয়ং রাজরাজেন্দ্র সংজ্ঞং
নানাশাস্ত্রাভিরামং নিখিলজনহিতং ধীর ধীরং সুসেব্যম।
শ্রীমন্তং ধর্মরূপং হরিহর চরণাম্ভোজযুগ্মৈকচিত্তং
ধ্যাত্বা স্তুত্বা শরণ্যং নৃপমুকুটমণিং তাতমগ্র্যং নমামি।

(৫) কনিষ্ঠ রাজকুমারের কবিতা।

প্রেষিতং ভক্তিতঃ স্তোকং পূজোপকরণং পিতঃ।
গৃহাণ কৃপয়া ভূপ ভূপালভালভূষণ ॥
নৃপতিগণ কিরীটস্থায়ি রত্নাংশুজালৈ—
দিন করকর বিম্বৈঃ শোভিতং লোভিতঞ্চ।
প্রণতজন সমূহস্বান্ত মাধবীকপানাং
জনকপদ সরোজং সাদরোহহং নমামি ॥

সূত্রঃ কার্তিকেয় চন্দ্র রায়, ক্ষিতীশ বংশাবলী চরিত.
পৃঃ ১৪৭-১৪৮, সংযোজন, পৃঃ ২২৮-২২৯।

সংযোজন—৭

দাসখতের প্রতিলিপি

৭ শ্রীশ্রীরাম

সন ১৭৩৫

ইয়াদী কির্দ্দসকল মঙ্গলালয় শ্রীগাছপার কোরর্ণের ফিরিঙ্গি শুচরিতেষু লিখীতং শ্রীআত্মারাম বাগদীকস্য ছোকরা বিক্রয় পত্রমিদং কার্য্যঞ্চাণ আগে আমার বেটা নাম শ্রী স্যামা বাগদী ছোকরা বএশ আট বৎসর বর্ণ কালা ইহার কিম্মত মান্দরাজী ৭ সাততঙ্কা পাইয়া আমি সেংছাপূর্বক তোমার স্থানে বিক্রয় করিলাম তুমি ইহারে বাত্তিজর কিস্তাঙ করিয়া খোরাক পোষাক দিয়া আপন খেদমতে রাখহ এই ছোকরার দান বিক্রয়ের সত্তাধিকার তোমার আমার সহিত এবং আমার ওয়ারীসের সহিত এই ছোকরার কোন এলাকা নাই এই করারে ছোকরা বিক্রয় করিলাম ইতি সন ১১৪২ এগার সত ব্যাল্লিষ শাল তারিখ ১৭ সতরএী জ্যৈষ্ঠ মাহ ২৮ মাই সন ১৭৩৫ সাল।

সূত্রঃ সুধীর কুমার মিত্র, 'হুগলী জেলার ইতিহাস ও বঙ্গ সমাজ,' প্রথম খণ্ড, পৃঃ ২৮৮।

১১০১ (১৬৯৫) সনের ১১ই কার্ত্তিক তারিখের একখানি আত্মবিক্রয় পত্রের প্রতিলিপি।

আত্মবিক্রয় পত্র

রূপেয়া ওজন

দশ মাষ।

নিশান সহী।

মহামহিম শ্রীযুক্ত রামেশ্বর মিত্র মহাশয় বরাবরেবু লিখিত শ্রীসনাতন দত্ত ওলদ গোপীবল্লভ দত্ত সাকিন মৌজে বানিয়াজঙ্গ মামুলে পরগণে ময়মনসিংহ সরকার বাজুহায় কস্য আত্মবিক্রয় পত্রমিদং কার্য্যঞ্চ আগে আমি আর আমার স্ত্রী শ্রীমতী বিবানাম্নি দাসী এই দুইজন কহত সালিতে অন্নোপহতী ও কর্জ্জোপহতি ক্রমে নগদ পণ ৯ নয় রূপেয়া পাইয়া তোমার স্থানে স্বেচ্ছাপূর্বক আত্মবিক্রয় হইলাম— ইতি তাং ১১ কার্ত্তিক সন ১১০১ বাঙ্গলা মোতাবেক ১৫ সহর রবিনৌয়ন সন ৩৯ জলুষ।

শ্রীমতী বিবানাম্নি দাসী

কস্যাঃ সম্মতি ঃ

শ্রীসনাতন দত্ত কস্য নিসান সহী।

সূত্রঃ সুধীর কুমার মিত্র, 'হুগলী জেলার ইতিহাস ও বঙ্গসমাজ', প্রথম খণ্ড, পৃঃ ২৮৬-২৮৭।